প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অষ্টম বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০১৮

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
January-March Issue, 2018; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৬

সমাজ

মূল্যবোধের রূপান্তর : জনযুক্তিচর্চার আকাল ও পুনরুজ্জীবন ৯
রেহমান সোবহান

রাজনীতি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা ২৭
ড্যানিয়েল এস লেন, দাম হি কিম, গি এস লি
ব্রায়ান ই উইকস, এবং নজিন কোয়াক

সমাজ

সমাজে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব ৬৩
জ্যাকব আমেদি

রাজনৈতিক অর্থনীতি

একটি রাখাইন প্রবাদ ৭৩
বরিশাল বিভাগের আদিবাসী রাখাইনদের ভূমিসংকট পর্যালোচনা
পাভেল পার্থ

আঞ্চলিক রাজনীতি

বার্মা পাঠসূত্র ১২৩
আলতাফ পারভেজ

সাক্ষাৎকার

বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ : দীপেশ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার ১৫৭
ইফতেখার মাহমুদ

বই আলোচনা

বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থনীতি ১৬৫
খলিলউল্লাহ্

লেখক পরিচিতি ১৭৪



মানবসভ্যতা একটি বড় ধরনের সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি—কোনো কিছুই এই সংকটের বাইরে নয়। এই সংকটের বহুমুখী কারণ রয়েছে। বিশ্ব প্রবেশ করেছে এমন এক যুগে, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ধারণ করছে যাবতীয় মানবিক কর্মকাণ্ড। সবকিছুই আগের চেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন। তাই সংকটও ঘনীভূত হয় আগের চেয়ে বেশি দ্রুত। আদর্শিক দ্বন্দ্বগুলো আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি ভাগে বিভক্ত ও জটিল। তাই সমাধানের কোনো শর্টকাট পদ্ধতি কাজ করছে না। প্রযুক্তি যত দ্রুত মানবসমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে তার জাল দিয়ে বাঁধতে পারছে, মানুষ তত দ্রুত তার প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিতে পারছে না। ফলে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সংকট।

সবচেয়ে গুরুতর সংকট দেখা দিচ্ছে মূল্যবোধের প্রশ্নে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে সব ক্ষেত্রে। সামাজিক এসব মূল্যবোধ গঠনে রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের রয়েছে অপরিসীম ভূমিকা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী রাষ্ট্র গঠনে কয়েকটি মৌলিক মূল্যবোধকে পথপ্রদর্শকের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছিল। এই মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে গঠিত হয়েছিল সব মানুষের অংশগ্রহণে জনযুক্তিচর্চার মাধ্যমে। বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদসহ অন্য প্রাজ্ঞ নেতারা সে সময়ে জনযুক্তিচর্চায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর পাশাপাশি বিশেষভাবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ অর্থনীতিবিদেরা এই প্রক্রিয়াকে জ্ঞানভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে এই জনযুক্তিচর্চার ভূমিকাকে অনেক প্রথিতযশা রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ও দার্শনিক স্বীকার করেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রশ্নে পুরোনো মূল্যবোধগুলোর আকাল দিনের পর দিন বাড়ছে। তাই সেই মূল্যবোধগুলোর পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটানো সম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে বিশিষ্ট

অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহানের 'মূল্যবোধের রূপান্তর : জনযুক্তিচর্চার আকাল ও পুনরুজ্জীবন' প্রবন্ধটি আমরা ছাপছি। লেখাটি সারওয়ার মুরশিদ ও নূর জাহান মুরশিদ স্মারক বক্তৃতা উপলক্ষ করে তৈরি করা হয়েছে। উক্ত দুজন ব্যক্তিই আমাদের সমাজে বিশেষ সময়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন প্রতীক বর্ধন।

সংকটের আরেক উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হলো ফেসবুক। এসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ফলে মানুষ এখন পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ ও তথ্য ভাগাভাগির এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ফলে অনেকে আবার স্বীয় স্বার্থে এই মাধ্যমকে অনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই মাধ্যম ব্যবহার করে রাজনীতি প্রভাবিত করাও সাধারণ প্রবণতা হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে শুরু করে যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়া, কিংবা রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে জাতিগত নির্মূল অভিযান জায়েজ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফেসবুকের অপব্যবহার হয়েছে বলে সমালোচনার ঝড় বইছে। অভিযোগ রয়েছে, ফেসবুকের মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসা এবং ব্রেক্সিটের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফেসবুক ব্যবহারকারীকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তাদের প্রভাবিত করা হয়েছে। যার প্রতিফলন ঘটেছে ভোটের ক্ষেত্রে। বিশাল আকারের তথ্যভান্ডারকে হীন স্বার্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা নামের প্রতিষ্ঠানটি। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে রয়েছে ফেসবুকের ভূমিকা। ফেসবুকের প্রধান মার্ক জাকারবার্গ এসব অভিযোগ স্বীকারও করেছেন।

রোহিঙ্গা ইস্যুটি বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন বা ব্রেক্সিটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরাসরি যুক্ততা না থাকলেও এগুলোর প্রভাব আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিতেও রয়েছে। ফলে এসব ঘটনায় নিষ্ক্রিয় থাকার কোনো সুযোগ নেই। তা ছাড়া বাংলাদেশের নির্বাচন ও রাজনীতিতেও ফেসবুকের প্রভাব পড়তে পারে। *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যায় তাই ফেসবুক নিয়ে দুটি লেখা ছাপা হলো। একটি লেখায় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে রাজনৈতিক সক্রিয়তার কোনো যোগসূত্র আছে কি না। যারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তারা কি শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ভার্চুয়াল জগতেই সীমাবদ্ধ রাখে, নাকি বাস্তব জীবনে তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হয়? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে *সেজ* জার্নালে প্রকাশিত ড্যানিয়েল লেন এবং আরও চারজন গবেষকের যৌথ একটি নিবন্ধে। লেখকদের তিনজন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক। বাকি দুজন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। লেখাটি অনুবাদ করেছেন খলিলউল্লাহ্।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ে অপর লেখাটিতে সমাজে, সাধারণত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যে প্রভাব রয়েছে, তার একটি বিশ্লেষণ রয়েছে। এখানে মানসিক স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে অপরাধপ্রবণতায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভূমিকা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটি করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার অংশ হিসেবে। জ্যাকব আমেদির 'সমাজে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব' নামে নিবন্ধটি অনুবাদ করেছেন মো. ফাহাদ হোসেন।

রোহিঙ্গা ইস্যুটি চলমান রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বরিশাল বিভাগের রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর ভূমি সংকট নিয়ে পাভেল পার্থর একটি নিবন্ধ ছাপছি। এখানে ভূমি বেদখলের ঘটনাকে ভূমি সংকটের কেন্দ্রীয় উপাদান ধরে আলোচনা করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জাতিগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা না করে পরিচালিত হলে এই সমস্যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে একই রকম হয়ে থাকে। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, বর্তমানে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিগত সমস্যার পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সহিংসতার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়েছে। রাখাইনদের নিজস্ব কিছু প্রবাদবাক্যের মধ্যেই ভূমি সংকটের সূত্র আছে। সেগুলোই লেখক রাখাইন প্রবীণ ও নবীনদের বয়ানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এ ছাড়া রাখাইন ও রোহিঙ্গা ইস্যু বোঝার জন্য আমরা 'বার্মা পাঠসূত্র' নামে আলতাফ পারভেজের একটি লেখা ছাপছি। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রাজনৈতিক শব্দকোষ আকারে ছাপা হলো। বিভিন্ন সময়ে খবরে বা লেখাজোখায় এসব বিষয়ের উল্লেখ থাকে। কিন্তু বিস্তারিত না জানার কারণে ঘটনাগুলোর সংযোগ ঘটাতে সমস্যা হয়। এই পাঠসূত্র সেদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

আত্মপরিচয়ের জায়গা থেকেও আমরা এক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এই বিষয়ে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে দিপেশ চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি *প্রথম আলো*র সাংবাদিক ইফতেখার মাহমুদের সঙ্গে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ নিয়ে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারধর্মী এই লেখাটিতে জাতীয়তাবাদ ছাড়াও বর্তমানের সবচেয়ে আলোচিত বৈশ্বিক সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েও দিপেশ কথা বলেছেন।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অনেক আলোচনার মধ্যে এখন উল্লেখযোগ্য হলো জলবায়ু অর্থনীতি। এই সংকট মোকাবিলায় এমন কিছু বৈশ্বিক সমাধান বিবেচিত হয়ে আসছে, যেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা যাবে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে জলবায়ু অর্থনীতির। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন পিটার নুয়েল ও ম্যাথু প্যাটারসন। *ক্লাইমেট ক্যাপিটালিজম* নামক এই বইটি নিয়ে আলোচনা করেছেন খলিলউল্লাহ্।



মূল্যবোধের রূপান্তর : জনযুক্তিচর্চার আকাল ও পুনরুজ্জীবন

রেহমান সোবহান

আমার স্মৃতিতে সারওয়ার মুরশিদ সবচেয়ে ভদ্রলোকদের একজন, যিনি ছিলেন অসহিষ্ণু ও বিভাজিত সমাজে আটকা পড়া এক মানুষের মতো। তাঁর মৃদুভাষণ, সংস্কৃতি, শব্দ ব্যবহার, পরিহাসবোধ, পোশাক-পরিচ্ছদের অপরিবর্তনীয় মার্জিতভাব—এসব দেখে মনে হতো, তিনি যেন অন্য যুগের বা ভিনগ্রহের মানুষ। কেউ যদি এর উৎস খুঁজতে যান, সেই অনুসন্ধান সম্ভবত তাঁকে আলোকায়নের যুগে নিয়ে যাবে। মনে হয়, আলোকায়নের দর্শন তাঁর মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করেছে।

মুরশিদ প্রকাশিত *নিউ ভ্যালুস* (নতুন মূল্যবোধ) শীর্ষক সাময়িকীটি শুধু তাঁর বিশ্বাসের প্রতিফলন নয়, এটি তাঁর ব্যক্তিত্বেরও প্রতিফলন। এটি ১৯৪৭-পরবর্তী পাকিস্তানে নির্বোধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ ছিল। যেটাকে বিশ্বাসভিত্তিক সমাজ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সেই সমাজভিত্তিক রাষ্ট্রের জন্মের এক বছর পর উদীয়মান শাসক শ্রেণির মাত্রাছাড়া লোভ আড়াল করতে বেখাপ্পাভাবে ধর্মের ব্যবহার, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে হতাশা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মের সাংস্কৃতিক পরিচয়—এ সবকিছু পুরো জাতির সংবেদনশীলতাকে আঘাত করেছিল। ফলে ভণ্ডামি যে মানুষের মূল বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল, তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

মুরশিদ যে শোভন সমাজের প্রতি এরূপ মারাত্মক আঘাতের জবাবে এভাবে রুখে দাঁড়াবেন সেটার কারণ হচ্ছে, তাঁর সেই আলোকায়ন প্রভাবিত ব্যক্তিত্ব। প্রতিবাদ করতে তিনি মুষ্টি পাকাতেন না বা গলা চড়াতেন না। তিনি নতুন

● অনুবাদ : **প্রতীক বর্ধন**

মূল্যবোধকে উদার রাজনীতির কণ্ঠস্বর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, উদার মূল্যবোধ তাঁর কাছে ছিল মানবিক অর্থনীতি ও মানবিক আইনের ন্যায্য দর্শন এবং সর্বোপরি জনযুক্তিচর্চার (পাবলিক রিজনিং) এক রূপ। বিষয়বস্তুর দিক থেকে যা ছিল সভ্য, প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে শোভন। এর লক্ষ্য ছিল ভিন্নমতাবলম্বীদের বুঝিয়ে নিজের পথে নিয়ে আসা, তাঁদের মুণ্ডরপেটা করে স্তব্ধ করে দেওয়া নয়। মুরশিদের কাছে ইংরেজি লিবারেলিজম (উদারতা) শব্দের ছোট হাতের এল অক্ষরটির মূল্যবোধ ছিল খুবই তীব্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রে এই উদারতার একান্ত অভাবের কারণে তিনি মৃদু চ্যালেঞ্জের পথ বেছে নেন। *নিউ ভ্যালুস*-এর প্রতিটি ছত্রে যুক্তি শাণিত করে তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন কাঠামো যুক্তির ভাষায় কর্ণপাত করেনি। ফলে মুরশিদের মতো ভদ্র, সভ্য ও যুক্তিশীল বিদ্যায়তনিক মানুষও ক্রমে রাজনৈতিক কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কালক্রমে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপদেষ্টা হন। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। যে সংগ্রাম একসময় জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে রূপ নেয়।

আজ আমার এই বক্তৃতার লক্ষ্য হচ্ছে, দুজন গণব্যক্তিত্বের বীরোচিত জীবনের স্মৃতিচারণা করা। তাঁরা হলেন নূর জাহান ও সারওয়ার মুরশিদ, যাঁরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। আর অঙ্গীকার ছিল, এই রাষ্ট্র হবে গণতান্ত্রিক, ন্যায্য, ধর্মনিরপেক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল। নূর জাহান রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এতে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের এবং ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। অথচ ওই যুগে খুব কম নারীই রাজনীতি করতেন। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন একজন অগ্রপথিক।

অন্যদিকে সারওয়ার মৃদুকণ্ঠ ও ঝরনার মতো সাবলীল লেখনী দিয়েই তাঁর আকাঙ্ক্ষিত শোভন, সহিষ্ণু, অহিংস সমাজ নির্মাণের সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন; যে সমাজে ক্ষমতার হাতবদল হবে শান্তিপূর্ণ, সভ্য ও রাজনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়ে। সারওয়ার মনে করতেন, পরিবর্তনের সংগ্রামের পথ লক্ষ্যের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অমর্ত্য সেনের *আইডিয়া অব জাস্টিস* গ্রন্থে তাঁর মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। সেন বলেছেন, শোভন সমাজ নির্মাণ করতে হবে জনযুক্তিচর্চার মধ্য দিয়ে। তাঁর মত হলো, জনযুক্তিচর্চার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের প্রথাগত ধারণার সম্প্রসারণ ঘটে; এতে গণতন্ত্র ব্যালট বাক্সের মধ্য দিয়ে মুক্তবাক্, তথ্যপ্রাপ্তির পূর্ণ অধিকার ও ভিন্নমত প্রকাশের ধারণায় ব্যাপ্ত হয়।

তবে আমার মনে হয়, মুরশিদ সরল বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর একসময়ের নতুন মূল্যবোধ অনায়াসে উদীয়মান সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুপ্রেরণা দেবে। কিন্তু যে সমাজ সহিংসতার মধ্যে জন্ম নিয়েছে, প্রতিষ্ঠাতা

পিতাদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, দীর্ঘকাল সেনাশাসনে থেকেছে এবং যে সেনাশাসকেরা পাকিস্তানের মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে, সেই সমাজে এই চিন্তা করা সরলতাই বটে। কিন্তু মুরশিদ দম্পতি সারা জীবন এই মূল্যবোধ ধারণ করেছেন। যে মূল্যবোধের আলো এই সমাজকে মুরশিদের আলোকায়নের মূল্যবোধের কাছাকাছি নিয়ে যাবে বলে তাঁরা ভেবেছিলেন, সেই আলো নিভে যেতে দেখে তাঁরা সব সময় নীরবে চোখের জল ফেলেছেন।

এই বক্তৃতায় আমি মুরশিদ কথিত নতুন মূল্যবোধ থেকে সরে আসা এবং জনযুক্তিচর্চার পরিসর ধীরে ধীরে বদ্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অনুসন্ধান করেছি। এই অনুসন্ধানের জন্য আমাকে এই রাষ্ট্রের মৌলভিত্তিগুলো আবার ঝালিয়ে নিতে হয়েছে। যে সমাজ সব সময় অস্থির, সেই সমাজে এই ভিত্তিগুলো কতটা টেকসই, তা বোঝার জন্য এটি জরুরি। এই প্রক্রিয়ায় জনযুক্তিচর্চা হারিয়ে যাওয়ার কারণটি উদ্‌ঘাটন করার আশা করি। আমরা যে রাষ্ট্রের মৌলভিত্তি থেকে সরে গেছি, তার পরিণতি হিসেবেই এটা ঘটেছে। যে সমাজে অনেকেই মনে করেন, উন্নয়ন ও পরিবর্তন সমাজের চালিকাশক্তি, সেই সমাজে 'নতুন মূল্যবোধ' পুরোনো হয়ে যায়—এ নিয়ে তর্ক করা যায়। বক্তৃতার শেষাংশে আমি পুরোনো কিন্তু মুরশিদের নতুন মূল্যবোধে নতুন করে আস্থা স্থাপনের চেষ্টা করব। আমার যুক্তি হচ্ছে, এককালের এই মহৎ চিন্তা আমাদের গণতান্ত্রিক, ন্যায্য ও অধিকতর সহিষ্ণু সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষার জন্য এখনো প্রাসঙ্গিক। অর্থনৈতিকভাব পরিবর্তনশীল সমাজের জন্যও তা প্রযোজ্য। আর সেই সমাজ নির্মিত হবে জনযুক্তিচর্চার মধ্য দিয়ে।

গণতন্ত্র ও তার অসন্তোষ

পাকিস্তানি শাসকেরা সব সময় আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার করার কারণেই আমরা এক পৃথক জাতি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠি। অবিভক্ত পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে কেন্দ্রীয় সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার চর্চা করেছে, এমনটা কখনোই হয়নি। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানে প্রথম সে রকম কোনো নির্বাচন হয়, অর্থাৎ উদ্ভবের ২৩ বছর পর। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়। নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা গণহত্যার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক রায় অগ্রাহ্য করলে মানুষ স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শেষ স্তর ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কখনোই বাস্তবায়িত হবে না—এই বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েই মানুষ যুদ্ধে অংশ নেয়।

বাংলাদেশের দুঃখগাথা বা বিয়োগান্ত ব্যাপার হলো, গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই রাষ্ট্রের জন্ম হলেও জাতীয় জীবনের অধিকাংশ সময় গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯০ সালে গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এরশাদের পতন হলে জাতি গণতন্ত্রের পুনর্জন্ম দেখে। গণতন্ত্রের এই পুনর্জন্মের সঙ্গে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, সেগুলো এখন বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। ১৯৯১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত চারটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দ জানান দিতে পেরেছে। বিজিত পক্ষ ব্যতিক্রমহীনভাবে কারচুপির অভিযোগ তুলেছে। কিন্তু এই নির্বাচনগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা পরিমাপ করা যায় এই সত্য দিয়ে যে প্রতিটি নির্বাচনেই সরকারি দল হেরেছে এবং বিরোধী দল নির্বাচিত হয়েছে।

আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ইতিবাচক ফল ১৯৯১ সালে প্রণীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে স্থায়িত্ব পায়নি। স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচন তত্ত্বাবধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে এই সাময়িক কিন্তু কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দেওয়া হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের এক বৃহৎ জোটের তীব্র আন্দোলনের ফলে এই সুদূরপ্রসারী সাংবিধানিক বন্দোবস্ত আইনে রূপান্তরিত হয়। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার খুঁত ছিল, তার পথও ছিল বন্ধুর; কিন্তু এর মধ্য দিয়ে এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে, যার হাত ধরে নির্দিষ্ট সময় পরপর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়। এই ব্যবস্থার কারণেই আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে। এরপর ২০০৮ সালের নির্বাচনে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই সে একচেটিয়া বিজয় লাভ করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আবারও দুই বছরের জন্য সেনাশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ঝামেলামুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রণয়নে মানুষের মধ্যে নতুন করে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য গঠিত নবম সংসদের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বিশিষ্ট আইনজীবী ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদে আলোচনার পর সর্বসম্মতক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে এই ব্যবস্থার যতই খুঁত থাক না কেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হবে।

সংসদীয় কমিটি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষে মত দিলেও যে নেতৃত্ব এই ব্যবস্থা প্রণয়নের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই নেতৃত্বই তা প্রত্যাখ্যান করে। সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া হয়। এর জবাবে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট রাজপথে ব্যাপক সহিংস আন্দোলন শুরু করে, যা মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। ২০১৪ সালের নির্বাচন বিএনপি বয়কট

করে। পরিণতিতে সংসদের অর্ধেকের বেশি আসনের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এসব আসনের ভোটাররাও ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হন। আজ স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও আমরা সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনী ব্যবস্থার খোঁজ করছি, যে নির্বাচনের ফলাফল বিশ্বাসযোগ্য হবে।

চারটি নির্বাচিত সংসদের মধ্য দিয়ে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি যে গণতন্ত্রের জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন জরুরি হলেও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের জন্য এটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের গণতন্ত্রচর্চার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অসহিষ্ণুতা ও সংঘাত, যার কারণে আমাদের রাজনৈতিক সমাজ কার্যত গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। আর জনযুক্তিচর্চা কার্যত রাজনৈতিক চর্চা থেকে উধাও হয়ে গেছে।

ক্ষমতায় যাঁরা থাকেন, তাঁরা বিরোধী দলকে চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করে সরকার পরিচালনা করেন। জবাবে বিরোধী দলগুলো ঘন ঘন সংসদ বয়কট ও প্রায়ই সহিংসতার আশ্রয় নিয়ে থাকে। ফলে চারটি সংসদের সিংহভাগ সময়কালে কার্যকর বিরোধী দল ছিল না। আর সংসদও নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহির আওতায় আনার মূল কাজটি করতে না পারায় তা একরকম অকার্যকর ছিল। বর্তমান সংসদ যেমন নির্বাচনে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি, তেমনি সংসদের ভেতরে ও দেশের অন্যান্য স্থানেও তার চ্যালেঞ্জ নেই। ফলে আইন বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের প্রাধান্য এবং সরকারের সর্বক্ষেত্রে বিজয়ীদের সবকিছু করতলগত করার সংস্কৃতি চিরস্থায়ী রূপ পেয়েছে।

দেশের মূল রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতন্ত্রচর্চার দুর্বলতা থাকার কারণে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতা আরও জটিল হয়েছে। ফলে রাজনৈতিক দল ও শৃঙ্খলা ক্ষয়ে গেছে। নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব যে তৈরি হবে, তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। সাংগঠনিকভাবে দুর্বল রাজনৈতিক দলগুলোতে আমরা টাকা ও পেশিশক্তির জয়জয়কার দেখেছি—এ দুটোই এখন রাজনৈতিক দলের মূল চালিকাশক্তি। তাই রাজনৈতিক দলগুলো ধনী মানুষের খেলায় পরিণত হয়েছে। এই দলগুলোতে আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষ ও নারীদের কার্যকরভাবে ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়েছে। টাকার প্রভুত্বের মধ্য দিয়ে এটা নিশ্চিত হয়েছে যে নীতি, জনসেবা এসব এখন রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার মূল চালিকাশক্তি নয়; বরং রাজনীতি এখন ব্যবসার সম্প্রসারিত রূপ এবং ভোটে জেতার পন্থা হয়ে গেছে।

শাসনব্যবস্থার সংকট

তিন দশক ধরে গড়ে ওঠা এমন অকার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমাদের শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যূনতম জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা গড়ে ওঠেনি। এতে প্রশাসনযন্ত্র দুর্বল হয়ে গেছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও

পদোন্নতি রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, কর্মকুশলতার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। ফলে সরকারি চাকরিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং টাকার খেলা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে জনসেবার হাতিয়ার হিসেবে সরকারি যন্ত্রের দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা অনেকটাই কমে গেছে। তবে লেনদেনের ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্কে এ কথা বলা যাবে না। আমাদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অকার্যকারিতার কারণে সরকারি চাকরি ও ক্রয়ে কমিশন দেওয়া-নেওয়া সহজ হয়েছে। নজরদারি ও জবাবদিহির দুর্বলতার কারণে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে এবং তাতে এসবের খরচও বেড়ে গেছে।

বিচার বিভাগও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথক্করণে দীর্ঘসূত্রতার কারণে নিম্ন আদালতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং উচ্চ আদালতও বিতর্কের মুখে পড়েছে। আইনের প্রয়োগে বাছবিচার করা হলে তা আইনের শাসনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি হুমকি তৈরি করে। আইনের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মূল শর্ত হলো, বিচারের দেবতাকে অন্ধ হয়ে আইন প্রয়োগ করতে হবে। বিরোধীদের শাস্তি দিতে আইনের অপব্যবহার এবং নিজের সমর্থকদের দায়মুক্তি দেওয়া হলে তাতে এটাই নিশ্চিত হয় যে সবার জন্য আইন সমান নয়। এতে আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে যায় এবং আইন ভঙ্গকারীরা আইনের আশ্রয়ে না থেকে তার বিরুদ্ধে যায়।

রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত সমাজে নির্বাচন কমিশনের নিয়োগও বিতর্কিত হয়েছে। সে কারণে যে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে রাজনৈতিক নিয়োগ ও পদায়নের কারণে নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, এমনকি তা যদি সৎ উদ্দেশ্যেও গঠিত হয়। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের ফল প্রভাবিত করতে টাকা ও সহিংসতার রাশ টেনে ধরার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। আর যে ব্যবস্থায় নির্বাচনে পরাজয়—কেবল প্রার্থীরা রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের অধ্যায়ই নয়, তাতে তাঁর জীবন ও জীবিকা আক্রান্ত হতে পারে—সেখানে যেকোনো উপায়ে জেতার তাড়না রোধ করা কঠিন।

অন্যদিকে নাগরিক সমাজ নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহির বিকল্প কেন্দ্র হতে পারত। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে নাগরিক সমাজ দুর্বল হয়েছে। এ ছাড়া সব সরকারের আমলে প্রবল চাপে থাকার কারণে তাদের কাজ করার সক্ষমতা কমেছে। নাগরিক আন্দোলনের সব সময়ই প্রাসঙ্গিকতা আছে। রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রতিবাদে নাগরিক সমাজ যে আন্দোলন করেছে, মানুষের ওপর তার ব্যাপক প্রভাব আছে। কিন্তু এ ধরনের আন্দোলনের প্রতি নাগরিক ও রাজনৈতিক সমাজের বৃহত্তর সমর্থন না থাকলে তা টেকসই হয় না, ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা দরকার যে শাসনব্যবস্থা নিয়ে আমরা যে সংকটের মুখে পড়েছি, তা নতুন ব্যাপার নয়, বিগত চার দশকে প্রতিটি সরকারই এই সংকটকে চিরস্থায়ী রূপ দিয়েছে। প্রতিটি সরকারই যুক্তি দিয়েছে, শাসনব্যবস্থায় আগের সরকারের প্রভাব নাকচ করতে হবে। আগের সরকারের ভুল না শুধরে প্রতিটি সরকারই অপশাসন আরও জটিল করার চেষ্টা করেছে। তাদের যুক্তি হলো, প্রথমে তাদের বদলা নিতে হবে এবং আগের সরকারের আমলে তাদের সমর্থকেরা যে বঞ্চনা ও অন্যায্যতার শিকার হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। আর বাস্তবে ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে আগের সরকারের প্রতি অনুগত এবং দায়িত্ব পালনরত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বদলে নিজেদের অনুগত লোক বসানো। এই পালাবদল শুধু প্রশাসন বা মাঠপর্যায়ের সরকারি সংস্থাগুলোতেই ঘটে না, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ঘটে। এসব প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতি যতটা না চারিত্রিক সাধুতা ও কর্মকুশলতার ওপর নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে রাজনৈতিক আনুগত্যের ওপর। বলা যায়, আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবেই পদোন্নতি দেওয়া হয়।

সরকারি কর্মকর্তারা যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য দেখান তা নয়, বরং ক্যারিয়ারের উন্নতি ও বস্তুগত প্রাপ্তির স্বার্থেই তাঁদের এই আনুগত্য। আইনশৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সরকারের প্রতি অনুগত মানুষদের আইন ভঙ্গ করার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তাঁদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর ক্ষমতার পরিবর্তন হলে যেসব অপরাধের জন্য তাঁদের এত দিন দায়মুক্তি দেওয়া হতো, সেই অপরাধের জন্যই তাঁদের অপরাধী আখ্যা দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে অপরাধের জন্য কার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করা হবে এবং কার বিরুদ্ধে করা হবে না, সে ব্যাপারে পুলিশের কাছে ফোন আসতে থাকে এবং তা হয়ে যায় পুলিশের অপরিহার্য অস্ত্র।

ফলে শাসনব্যবস্থায় একধরনের পথনির্ভরতা তৈরি হয়েছে, যেখানে প্রতিটি সরকার নিজেকে আরেক সরকারের বন্দী বানিয়ে ফেলেছে। আর এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন বজায় থাকলে প্রতিটি সরকারের পক্ষে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা আরও কঠিন হয়ে যায়, যে ব্যবস্থা অপশাসনের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্য অসাধারণ গুণসম্পন্ন নেতৃত্ব দরকার, যে নেতৃত্ব শুধু ক্রমবর্ধমান নয়, পদ্ধতিগত পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে। আর এর শুরু হতে হবে পথনির্ভর ঐতিহ্য পরিত্যাগ করার মধ্য দিয়ে।

বর্জনমূলক থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ

বাংলাদেশে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত করতে হবে। সামরিক বা বেসামরিক সরকারের কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনের মধ্যে তা সম্ভব

নয়। এর জন্য যা করতে হবে তা হলো, রাষ্ট্রের মৌলনীতিতে ফেরত গিয়ে বিগত বছরগুলোতে যে বর্জনমূলক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রের মৌলনীতির ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক ন্যায্যতা ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের প্রতি শ্রদ্ধা।

সেই তিতুমীর ও নুরলদীনের কৃষক বিদ্রোহ থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন পর্যন্ত সব আন্দোলনের মূল কথা ছিল সামাজিক ন্যায্যতা। সেই কৃষক শ্রেণিই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সামনের সারিতে ছিল, যার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বিকাশমান শ্রমিক শ্রেণি ও ছাত্ররা। আর সেই নিম্নবর্গের মানুষেরাই মুক্তিযুদ্ধের মূল সেনানী ছিলেন। গণহত্যার সিংহভাগ শিকারও তাঁরা হয়েছেন। অন্তর্ভুক্তমূলক সমাজ গঠন করা মানে সেই অধিকাংশ বঞ্চিত মানুষের রক্তের ঋণের স্বীকৃতি দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা সামঞ্জস্যহীনভাবে সবচেয়ে বেশি প্রাণ দিয়েছেন, অন্য শ্রেণির তুলনায়। আশা ছিল, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এই বঞ্চিত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাড়বে এবং তাঁদের উদ্বেগ অগ্রাধিকার পাবে ও বৈষম্য কমবে।

বিগত বছরগুলোতে, বিশেষ করে একুশ শতকের পর বাংলাদেশের অর্থনীতির তাৎপর্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে যে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, আমরা সেই বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। অর্থনৈতিক অর্জন ও মানব উন্নয়নে অগ্রগতি অর্জন করলেও বাংলাদেশের সমাজ এখনো খুবই অসম ও অন্যায্য। পাকিস্তান আমলের দ্বৈত অর্থনীতি থেকে আমরা দ্বৈত সমাজের যুগে প্রবেশ করেছি। এই দ্বৈত সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে ক্রমে একটি বর্জনমূলক অভিজাত গোষ্ঠী গড়ে উঠছে, যারা বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এই আত্মবিস্তারী অভিজাত শ্রেণি শুধু স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনারই নিকুচি করছে না, তারা এই অঞ্চলের মানুষের শতাব্দীপ্রাচীন গণতান্ত্রিক সংগ্রামের চেতনাও ছুড়ে ফেলেছে।

সামাজিক শৃঙ্খলা কতটা টেকসই হবে, তা নির্ভর করে সমাজের চোখে তার গ্রহণযোগ্যতার ওপর। যাঁরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার চর্চা করেন, তাঁদের সেটাই নিশ্চিত করার কথা। অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের রায় এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য উদ্যোগ, দক্ষতা ও প্রতিযোগিতা—এসবের মধ্য দিয়েই তাদের সেটা করার কথা। যে সমাজের সামাজিক ক্ষমতা অন্যায্যভাবে কিছু মানুষ ভোগ করে, সেই সমাজ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। কারণ, সেখানকার সামাজিক স্তরবিন্যাস সব সময় চ্যালেঞ্জের মুখে থাকে। আর সেই চ্যালেঞ্জ সামাল দিতে পারে কেবল অভিজাতদের হাতে থাকা একচেটিয়া শক্তি, টাকা ও সহিংসতা। এই ধরনের দুর্বল বৈধতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ অপরাধ, সহিংসতা ও সামাজিক পতনপ্রবণ হয়ে থাকে।

আমাদের শাসনব্যবস্থায় যে অন্যায্যতা আছে, তার মূলটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অন্যায্যতার মধ্যে নিহিত। বিভিন্ন সরকারের গৃহীত নীতির কারণে তা আরও গভীর হয়েছে। অন্যায্য শাসনব্যবস্থা অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও তীব্র করে তোলে। আমরা যদি বাজারের বণ্টন সক্ষমতার ওপর নির্বিচারে আস্থা রেখে নীতি প্রণয়ন করি এবং অর্থনীতির কাঠামো, বাজারের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও মানুষের সম্পদ প্রাপ্তির দিকে নজর না দিই, তাহলে সেই বাজার ঠিকঠাক কাজ করবে না এবং দেশের সামাজিক ন্যায্যতার ওপর গুরুতর প্রভাব পড়বে।

যে সামাজিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাবান ও সম্পদশালীদের কারণে বাজার ত্রুটিপূর্ণ বা ঠিকঠাক কাজ করে না, সেখানে ন্যায়বিচার ও দক্ষতা বলি হয়। বর্তমান সামাজিক কাঠামোতে পুরস্কারপ্রাপ্তি নির্ভর করে ক্ষমতা ও প্রভাবের ওপর। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিলে মানুষ কতটা সিদ্ধহস্ত এবং বাজার, আইন ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহির দায় থেকে মুক্ত হলে পরেই পুরস্কারটা মেলে। যেখানে ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় ও আইনের দায়মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে মারাত্মক অসমতা বিরাজ করে, সেই সমাজে অসমতা ও অন্যায্যতাকে বাজারব্যবস্থা আরও তীব্র করে তোলে।

যাঁদের উৎপাদনশীল সম্পদ নেই, পর্যাপ্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নেই; তাঁদের পক্ষে উন্মুক্ত বাজারের সুবিধা নেওয়া সম্ভব নয়। যে সমাজে কাজ পাওয়াটা নির্ভর করে জ্ঞানবান ও সম্পদশালীদের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর, সেখানে ব্যবস্থাটা নিজেই খেয়ালি হয়ে যায়। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও অর্থনৈতিক সুযোগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিযোগিতার বালাই নেই, সেখানে এমনটাই ঘটে। এই পরিস্থিতিতে যাঁরা পণ্য ও সেবা উৎপাদন করেন, তাঁদের একধরনের অনিশ্চিত ও অরক্ষিত পরিবেশে যুদ্ধ করতে হয়। আর সেই পরিবেশে মূল্যের ওঠা-নামা ও বিদেশি প্রতিযোগিতার কারণে এই অনিশ্চয়তা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এই ব্যবস্থায় পুঁজিপ্রাপ্তি বাজারের নীতির ওপর নির্ভরশীল নয়, সেটা বরং ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। সবার ক্ষেত্রে এই সুযোগ এক রকম নয়, ব্যাপারটা নির্ভর করে ঋণ খেলাপ করার ক্ষমতার ওপর। যাঁরা চিরকাল ঋণ খেলাপ করার ক্ষমতা রাখেন, তাঁরাই এখানে বেশি পুঁজি পান। আইন এখানে সুরক্ষা নয়, ঝুঁকির কারণ। এখানে আইনের আশ্রয় পাওয়া নির্ভর করে আপনি কে এবং এই আশ্রয় পাওয়ার জন্য আপনি কত টাকা খরচ করতে রাজি তার ওপর। অর্থাৎ এখানে গরিবের জন্য এক আইন, আর বড়লোকের জন্য আরেক আইন। আবার ধনীদের মধ্যে যাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, আইন তাঁদের জন্য এক রকম। আর যাঁদের সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই, তাঁরা বাজারে আইন কেনার প্রতিযোগিতায় নামেন। নিম্ন পর্যায়ে বিচারের পরিবর্তে আলোচনার সুযোগ থাকে এবং এ কারণে মানুষ আইন ভঙ্গ করতে উৎসাহিত হয়।

অবৈধভাবে প্রাপ্ত সম্পদ ও অপশাসনের কারণে ব্যক্তিপর্যায়ে অপরাধ সংঘটিত হয়। মতিঝিলের ঋণখেলাপি ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজনীতিকেরা মাস্তান ভাড়া করে নির্বাচনের মাঠে নামেন। সরকারি সম্পদ জবরদখলে এই মাস্তানেরা তাঁদের সহযোগিতা করে থাকে। এই মাস্তানেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। আর এই দায়মুক্তি কাজে লাগিয়ে মাস্তানেরা চাঁদাবাজি করে। অপরাধ তাদের কাছে ব্যক্তিগত উদ্যোগের শামিল। এই প্রবণতা শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতসহ আমাদের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশেও তা দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে অপরাধ উদ্যোগের এক ভিন্ন রূপ হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় এই অপরাধের মাধ্যমেই। এই পরিস্থিতিতে যেকোনো ব্যবস্থায় অন্যায্যতা বেড়ে যায়, যেখানে আইন প্রয়োগকারী ও নিয়ম ভঙ্গকারীদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

জনযুক্তিচর্চার অবক্ষয়

একটি সমাজ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সুশাসন থেকে দূরে সরে গেলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে জনযুক্তিচর্চার অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে। দার্শনিক কান্ট মনে করতেন, জনযুক্তিচর্চা হলো আলোকায়নের যুগের উপজাত পণ্য। কান্টের যুক্তি ছিল, 'আলোকায়নের জন্য মানুষের উন্মুক্তভাবে চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার থাকা উচিত, যার জন্য তাদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে না।' মুরশিদ তাঁর *নিউ ভ্যালুস* দিয়ে এমন সমাজ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যেখানে যুক্তিপূর্ণ গণতর্ক-বিতর্ক গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে পছন্দের হাতিয়ার হবে। তবে *নিউ ভ্যালুস* প্রকাশের জন্য এমন সমাজ দরকার ছিল, যেখানে স্বাধীনভাবে, নির্ভয়ে ও শাস্তির ভয় ছাড়াই মতপ্রকাশের পরিবেশ আছে। কিন্তু যে পৃথিবীতে *নিউ ভ্যালুস*-এর আবির্ভাব, সেখানে মানুষের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার ছিল না। আইয়ুব খানের আমলে পাকিস্তানের গণমাধ্যমকে প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স নামের এক আইনের অধীনে কাজ করতে হতো। সে কারণে তখন সবাই একধরনের স্বনিয়ন্ত্রণের মধ্যে কাজ করতে প্ররোচিত হতো। আইয়ুবের পতন এবং ১৯৬৯-৭১ সালের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশে পত্রিকা ও সাময়িকীগুলো স্বাধীনভাবে এবং পুরোপুরি নিজেদের প্রকাশ করতে শুরু করে। ১৯৭০ সালে ডিসেম্বরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বড় বিজয় লাভ করলে যে ক্ষণিকের জন্য নিরুপদ্রব পরিবেশ তৈরি হয়, তখন পত্রিকাগুলো হাত খুলে রাজনৈতিক বিষয়ে এবং দেশের সমস্যা সম্পর্কে লিখতে শুরু করে। আমাদের মতো যারা এই চ্যালেঞ্জ নিয়েছে, যেমন ফোরাম, তারা ছিল আকাশের মতো সীমাহীন। এরপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান বাংলাদেশের মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে জেনারেল টিক্কা

খানের অধ্যাদেশে আমাদের পত্রিকা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পাকিস্তান আমলে এসব মুক্তচিন্তার গলা টিপে ধরা কালাকানুনের জবাবে বাংলাদেশের সংবিধানে মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পায়। পাকিস্তান আমলের ওই আইনের কারণে গণবিতর্ক বহুদিন হুমকির মুখে ছিল। স্বাধীনতার পর প্রথম তিন বছর এই স্বাধীনতা ঝুঁকি ও স্বনিয়ন্ত্রণ ছাড়াই চর্চিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের পর বিভিন্ন সরকারের আমলে গণতন্ত্রের নানা ঘরানার জমানায় এই চর্চা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে, যদিও আমাদের সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

আর এখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা শুধু রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুর ভয়ে রুদ্ধ হচ্ছে না, কিছু আদর্শিক শক্তির হুমকির কারণেও তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যাদের কাছে কোনো বিশেষ প্রকৃতির দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। ফলে মানুষ যথেষ্ট মাত্রায় স্বনিয়ন্ত্রণের মধ্যে মতপ্রকাশ করছে। আবার কোন মত গ্রহণযোগ্য আর কোনটি নয়, তা পরিমাপের কোনো মৌল নীতিও নেই। কিছু কিছু ব্যাপারে সীমা-পরিসীমা নেই। একদিকে আইনের অপব্যবহার এবং অন্যদিকে শারীরিক হামলার হুমকি—এই উভয়বিধ ভীতির কারণে ব্যক্তি ও গণমাধ্যমের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হচ্ছে।

বাস্তবে অধিকাংশ গণমাধ্যমই কদাচিৎ মতপ্রকাশের স্বাধীন চর্চা করতে পারে। ইলেকট্রনিক ও ছাপা গণমাধ্যমের সংখ্যা অনেক বেড়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু খুব কম সংখ্যক গণমাধ্যমই এমন কোনো ইস্যু ধরতে চায়, যাতে রাষ্ট্র বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হতে পারে। খুব সম্ভবত এই গণমাধ্যমগুলো শাসক, রাজনৈতিক দল ও মালিকদের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। অনেক সময়ই দেখা গেছে, রাষ্ট্রের কোনো অঙ্গ বিশেষ কোনো গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে নির্ভয়ে ও বিনা আইনি চ্যালেঞ্জে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা চালিয়েছে।

এই ঐতিহ্য আমাদের দেশের অনন্য ব্যাপার নয়, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসহ সারা পৃথিবীতেই এর অস্তিত্ব দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে আলোকায়ন-সম্পর্কিত কান্টের ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত গণযুক্তি-তর্কের ধারণাটি আদর্শ হিসেবে থেকে যায়, বৈশ্বিক বাস্তবতার অংশ হিসেবে নয়। গণমাধ্যম জনমত গঠনে কারও চাপ ও কারসাজি ছাড়াই কাজ করতে পারে—এমন পরিবেশ আর থাকে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গণযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে আমরা সামাজিক মাধ্যমের উত্থান দেখেছি। শুরুতে আমরা অনেকেই আশা করেছি যে সামাজিক মাধ্যমের কারণে মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা পাওয়া যাবে। স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলো গণমাধ্যমের ওপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করে, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, এমনকি সরকারের বাইরের যে শক্তি গণযুক্তি-তর্কের পরিসর সীমিত করতে চায়, তাদের কাছ থেকেও। সামাজিক মাধ্যম এখনো মানুষের

সেবায় কাজে লাগে। মোবাইল ফোন দিয়ে সাধারণ মানুষেরা রাষ্ট্রের ভুল কাজ, যেমন নির্বাচনে জালিয়াতি, সরকারি সম্পদের অপব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের চিত্র ধারণ করে তা প্রচার করে।

আজকের এই তাৎক্ষণিক যোগাযোগের যুগে অসদাচরণের সবচেয়ে গোপনীয় তথ্য উদ্‌ঘাটনে নাগরিকদের হাতে যে নতুন শক্তি এসেছে এবং তা কীভাবে গণযুক্তি-তর্কের প্রয়োজনে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে মানুষের শিক্ষা থাকতে হবে। একুশ শতকে এটাই মানুষের মুক্তির অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠছে।

দুর্ভাগ্যবশত গণযুক্তি-তর্কের শত্রুরা সামাজিক মাধ্যমের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন বিরোধীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, ভুয়া খবর ছড়ানো, এমনকি গণযুক্তি-তর্কের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হবে। আমরা দেখেছি, একজন শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট টুইটার অ্যাকাউন্ট দিয়ে কীভাবে তাঁর লাখ লাখ গোঁড়া সমর্থকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। তাঁর টুইটগুলো গূঢ় উদ্দেশ্য-সংবলিত, যার দ্বারা তিনি সমালোচকদের ধুয়ে দেন এবং যুক্তিহীন সংস্কার প্রচার করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহারের কারণে ২৫০ শব্দের টুইট বার্তা কার্যত গণযুক্তি-তর্কের প্রতি মানুষের মনটা রুদ্ধ করে দেয়। ফলে গুরুতর তর্ক-বিতর্কের জায়গা আর থাকে না। দুঃখজনকভাবে সারা পৃথিবীতেই সামাজিক মাধ্যমের অপব্যবহার হচ্ছে। এর দ্বারা সম্ভাব্য একনায়কেরা যেমন অনুসারীদের উৎসাহিত করছেন, তেমনি এর দ্বারা সন্ত্রাসবাদেরও বিস্তার হচ্ছে।

অধিক উদার সমাজের সঙ্গে স্বল্প উদার সমাজের পার্থক্য এখানেই যে অধিক উদার সমাজের নাগরিকেরা মতপ্রকাশের নানা মাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ পান, যেখানে 'শত ফুল ফোটে ও শত চিন্তার বিকাশ হয়'। যে সমাজে নিপীড়ন বেশি, সেখানকার বাগানে আগাছার পরিমাণ বেশি থাকে, মালিরা সরকারি ও বেসরকারি নানা শক্তির নিপীড়নের ভয়ে থাকে। এমন সমাজে মুরশিদের আলোকায়নের মূল্যবোধ দূরবর্তী ব্যাপার হয়েই থাকবে।

যে সমাজে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হুমকির মুখে থাকে, সে সমাজে রাষ্ট্রের মুখপাত্রদের কণ্ঠস্বরই প্রবর্ধিত হয় এবং কেউ তার প্রতি গুরুতর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে না। অধিকতর মুক্ত সমাজে রাষ্ট্রের মতের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব এবং তা সেখানে করাও হয়। গণমাধ্যমের অধিকতর স্বাধীন অংশটি রাষ্ট্রের প্রতিটি মতের চ্যালেঞ্জ করতে পারে, সে জন্য তাদের কর্মীদের জীবনের ঝুঁকিতে থাকতে হয় না বা তাঁদের নিরাপত্তার ঘাটতি হয় না। এমনকি অধিকতর নিপীড়নমূলক সমাজে ব্যক্তি ও গণমাধ্যম ঝুঁকি নিতে চাইলে তাদের পক্ষে রাষ্ট্রের কাজ ও ঘোষণার প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব। আমাদের এটা মাথায় রাখা দরকার যে

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কিন্তু আইনের দ্বারা সীমিত নয়, বরং তা নির্ভর করে নাগরিকদের সেই স্বাধীনতাচর্চার ইচ্ছার ওপর—রাষ্ট্র যতক্ষণ না তাতে বাদ সাধছে।

আমাদের এই স্বাধীনতার চর্চার ওপর সীমা আরোপের ব্যাপারটা কিন্তু কী বলা হয়েছে বা লিখিত হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে লেখকের বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রচারণার ওপর এবং তাঁরা কোন মাধ্যম বেছে নিয়েছেন তার ওপর। যে সরকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আরোপে নিশ্চিন্ত থাকে, সে কিন্তু ভিন্নমতের প্রতি আরও সহনশীল হতে পারে, যেমন যে বুদ্ধিজীবীদের অত প্রচারণা নেই, তাঁদের সমালোচনা সরকার সহ্য করতেই পারে। এর বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা, যাঁরা বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেন, সরকার তাঁদের ভয় পায় এবং সুযোগ পেলে স্তব্ধ করে দেয়।

বঙ্গবন্ধুর যুগে জনযুক্তিচর্চা

যে সরকার নিজের তখতের ব্যাপারে অনিশ্চিত, তারা ভিন্নমতের প্রতি সহনশীল নয়। এমনকি নির্বিষ বুদ্ধিজীবীর কথাও তারা সহ্য করতে পারে না। এ ধরনের সরকার স্বল্প পরিচিত বুদ্ধিজীবীদের ওপরও খড়্গহস্ত হতে পারে। যে বুদ্ধিজীবীরা জনপ্রিয় নেতার কানে কথা ঢোকাতে পারেন, তাঁরা সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। আমার বেলায় যা হয়েছে তা হলো, লেখক হিসেবে আমার জীবনের রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী সময়টা কালের এমন পর্বেই এসেছিল, যখন আমাদের চিন্তা বঙ্গবন্ধুর মতো জাতীয় নেতার কাজে এসেছিল। বঙ্গবন্ধু বাগাড়ম্বরে নয়, শক্তিশালী জনযুক্তি-তর্কে বিশ্বাস করতেন। তিনি ফাঁকা বুলি, বাগাড়ম্বর বা বাজে কথা দিয়ে মানুষকে বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করতেন না।

পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্র যেকোনো সময় গণতান্ত্রিক মত দমন করার একচেটিয়া ক্ষমতা রাখত। তাই বঙ্গবন্ধুসহ অন্য বিরোধী নেতাদের রাজনৈতিক ও নীতিগত কর্মসূচির বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টিতে যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে জনযুক্তিচর্চার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। স্বশাসনের দাবিতে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবি সাধারণ রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর ছিল না। ছয় দফার দলিলটি খুবই সুচিন্তিত ছিল, পেশাদারদের কয়েক বছরের শ্রমলব্ধ ফসল ছিল এটি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত আওয়ামী লীগের ইশতেহার প্রণয়ন করেছিল আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল পেশাদার শ্রেণি। বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীনের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে এটি প্রণীত হয়েছিল। সেটিও ছিল খুব সুচিন্তিত ও যৌক্তিক দলিল, যা প্রণীত হয়েছিল ভোটারদের রাজনৈতিক চাহিদা ও সামাজিক উদ্বেগ মাথায় রেখে।

১৯৭০ সালে ডিসেম্বরের নির্বাচনের আগে পাকিস্তানি জান্তা বিশ্বাস করত, অন্য নেতাদের মতো বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে ইশতেহার প্রণয়ন করেছিলেন

ভোট পাওয়ার জন্য। নির্বাচনের পর ক্ষমতার ভাগ পেলে তিনি ছয় দফায় ছাড় দেবেন। তবে বঙ্গবন্ধু সাধারণ নেতা ছিলেন না। জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাঁকে যে রায় দিয়েছিলেন, তার প্রতি তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। নির্বাচনের পরপর তিনি ছয় দফা ও আওয়ামী লীগের ইশতেহার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা শুরু করেন, যাতে রাজনৈতিক আলোচনা ও সংসদীয় বিতর্কে তিনি এর যৌক্তিকতার পক্ষে কথা বলতে পারেন। এসব চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত হতে তিনি পেশাদার উপদেষ্টাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্বাচনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলেই কেবল তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন এবং তাদের তা বোঝানোর চেষ্টা করতেন। শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটাতে হলে যে তা বাস্তবায়নের বিকল্প নেই, তা-ও বোঝানোর চেষ্টা করতেন বঙ্গবন্ধু।

ব্যাপারটা হলো, তাজউদ্দীন আহমদের বঙ্গবন্ধুর মতো ক্যারিশমা ও উৎসাহিত করার ক্ষমতা না থাকলেও জনযুক্তিচর্চার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতি জরুরি ব্যক্তি। প্রখর বুদ্ধি ও অসাধারণ দ্বান্দ্বিক দক্ষতা দিয়ে তিনি সমর্থকদের বোঝাতেন। এমনকি বিরোধীদেরও তিনি বুদ্ধি দিয়ে নিজের মতে নিয়ে আসতেন। বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীনের যুগলবন্দী সেই যুগের চূড়ান্ত প্রতিনিধি ছিলেন, যে যুগে জনযুক্তি-তর্ক রাজনৈতিক বিতর্ককে যেমন রুচিশীল করে তুলেছিল, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত করেছিল।

খুব কম মানুষেরই এটা মনে আছে যে বঙ্গবন্ধু জনসভায় তাঁর কণ্ঠ ও শব্দ অস্ত্রের মতো ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কখনো প্রতিপক্ষ সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক কথা বলেননি। যুক্তির দ্বারস্থ হয়ে তিনি মানুষকে শুধু নিজের লক্ষ্যের প্রতি সমর্থন জোগাতেই উৎসাহিত করতেন না, যে যুক্তির কারণে তাঁর এই উদ্দেশ্য তার প্রতিও মানুষের সম্ভ্রম তৈরি করতেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুধু স্বাধীনতাসংগ্রামের দিকনির্দেশনার জন্য স্মরিত হবে না, সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনযুক্তিচর্চার এক অসাধারণ নিদর্শন হয়ে থাকবে এটি। ইউনেসকো যথার্থভাবেই একে স্বীকৃতি দিয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের পাকিস্তানি প্রতিপক্ষ এই উদ্দেশ্যে জনযুক্তিচর্চার শত্রু ছিল। তারা ক্রমাগত শক্তির ওপরই আস্থা রেখে গেছে, যুক্তির ওপর নয়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ শক্তির বিরুদ্ধে যুক্তির জয়ের বদৌলতে ইতিমধ্যে স্বাধীন জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন, কারণ নেতারা তাঁদের বুঝিয়েছিলেন যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ও স্বশাসনের এটাই একমাত্র পথ। পুরো জাতি যখন শক্তিশালী চিন্তার যুক্তি গ্রহণ করে, তখন তাদের আটকে রাখা বা হত্যা করে লাভ নেই। এমনকি তার নেতাদের হত্যা করেও লাভ নেই। আর নিপীড়কদের তখন পুরো জনগোষ্ঠীর ওপর

যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া এবং গণহত্যার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

এই যে জনযুক্তিচর্চার শক্তি মানুষকে একত্র করতে পারে, তার ঐতিহাসিক নমুনা দেখে পরবর্তী প্রজন্মের রাজনীতিকদের মনে এই প্রত্যয় সৃষ্টি হওয়া উচিত যে বলপ্রয়োগে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও ভিন্নমত দমন করলে উল্টো ফল হয়। কিছু কিছু সমাজ হয়তো কিঞ্চিৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো, টেকসই উন্নয়নের যে নজির আমরা দেখি, তা মূলত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনেই হয়েছে। যেসব দেশ দীর্ঘ সময় ধরে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে, সেই দেশে উন্নয়নের তারিফ করা যেতেই পারে। কিন্তু মানুষের অধিকার লঙ্ঘন ও কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়ার ক্ষতিপূরণ তা কখনোই হতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুনর্জাগরণ : জনযুক্তিচর্চার পুনরুজ্জীবন

একটা প্রশ্ন রাখব, যে সমাজ ক্রমে বর্জনমূলক হয়ে উঠছে, সেখানে কি স্বাধীনতাসংগ্রামের রাজনৈতিক চেতনা পুনর্জাগ্রত করা সম্ভব? চার দশক চলে গেছে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতেই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমাদের লক্ষ্যের পুনঃসংজ্ঞায়ন দরকার—এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা যেতেই পারে, সে তার ঐতিহাসিক বার্তা যতই স্মৃতিজাগানিয়া হোক না কেন। যে সমাজ স্বাধীনতার চেতনা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে, সেই সমাজে স্বাধীনতার চেতনার কথা বাগাড়ম্বরের মতো বলা এবং তার প্রতি নতজানু হওয়ার ভান করা, সামাজিক উত্তেজনা জারি রাখার কায়দার শামিল। কথা ও কাজের মধ্যে এই ফারাক থাকলে শুধু পুরোনো লক্ষ্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই তৈরি হয় না, তাতে সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাও নষ্ট হয়।

নূর জাহান, সারওয়ার মুরশিদ ও বয়স্ক প্রজন্মের আরও কয়েকজনের মতো আমি স্বাধীনতার মূল্যবোধের প্রতি নির্লজ্জভাবে অনুগত। কিন্তু এই প্রত্যয়েও আমার অত্যন্ত বিশ্বাস আছে যে সমাজের অভিশাপ দূর করতে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষক অর্জনগুলো ধরে রাখতে হলে পুরোনো মূল্যবোধের সমসাময়িকতা থাকতে হবে। তাই বক্তৃতার শেষাংশে আমি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নির্মাণের মধ্য দিয়ে কীভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধের পুরোনো মূল্যবোধগুলো পুনর্জাগ্রত করা যায়, তার পথ খুঁজব।

এতক্ষণ মূলত সতর্কবাণী শোনালাম। অর্থাৎ স্বাধীনতার মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে গেলে কী হতে পারে, তার সতর্কবার্তা। তাই সমাজের টেকসই রূপান্তরে স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলো পুনর্ব্যবহার করলে কী সুবিধা পাওয়া যাবে বা আমাদের হাতে এ বিষয়ক কী সুবিধা আছে, তার ওপর আলোকপাত করে ইতিবাচক হতে চাই।

আমি বলেছি যে সমাজে বাদ পড়া মানুষ আছে। আবার আমাদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে সংশোধনমূলক ব্যবস্থাও আমাদের হাতের নাগালেই আছে, বিশেষ

করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে; আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে তা এখন অনেক বেশি লভ্য। স্বাধীনতার পর আমরা যে ভগ্ন অর্থনীতি পেয়েছিলাম, সেখান থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। গত তিন দশকে, বিশেষ করে একুশ শতকে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তেজিভাব দেখা গেছে। এতে যেমন দারিদ্র্য কমেছে, তেমনি মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ার কারণে রাজস্বও বেড়েছে। সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং তাতে আমাদের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে। সম্প্রতি সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতেও বিনিয়োগ বাড়িয়েছে, তাই মানব উন্নয়ন সূচকে আমাদের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের উদ্যোগের কারণে আমাদের সাধারণ মানুষ আধুনিক যুগের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। এতে আমাদের অর্জন দৃষ্টিগ্রাহ্য।

অর্থনীতির এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির অন্তত আংশিক কারণ হচ্ছে নেতৃত্বের দূরদর্শিতা। বাংলাদেশের উন্নয়ন কাহিনির পৃথক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে একটি শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, যারা অপশাসন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে। উন্নয়নে আমাদের যে অর্জন, তার বড় কারণ হচ্ছে আমাদের কৃষক, মজুরি শ্রমিক, বিশেষ করে পোশাক খাতের নারী শ্রমিক, প্রবাসী শ্রমিক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বিশ্বমানের এনজিও আর গতিশীল ও ক্রমবর্ধমান পেশাদার ও উদ্যোক্তা শ্রেণির কঠোর পরিশ্রম, সৃজনশীলতা ও উদ্যোগী ভূমিকা। উন্নয়নের এই শক্তির কারণেই বাংলাদেশের 'উন্নয়নের বৈপরীত্য' নামক প্রপঞ্চটি তৈরি হয়েছে। অপশাসন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির বৈপরীত্যমূলক সহাবস্থানের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। উন্নয়নের এই গতিশীল চালিকাশক্তির লভ্যতা, অর্থনীতির সক্ষমতা, সরকারি সম্পদের অধিকতর প্রাপ্যতা, যোগাযোগব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি—এসব কারণে দারিদ্র্য হ্রাস ও প্রবৃদ্ধির সলতেয় আগুন ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ অঙ্গীকার ও সক্ষমতা বাস্তবায়নের জন্য অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও গণতন্ত্র নির্মাণে আমাদের বিশ্বাস পুনরায় স্থাপন করতে হবে। আমি এই তর্ক করে থাকি যে বাংলাদেশের মতো যে দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে, তার পক্ষে নিজ সমাজের সংহতি নষ্ট না করে সেই উত্তরাধিকার প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। টেকসই, দ্রুত ও রূপান্তরমূলক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক সংহতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দেশীয় ও বিদেশি পুঁজি একত্র করা—এ সবকিছু নির্ভর করে স্থিতিশীলতার ওপর, যা আবার গড়ে ওঠে সরকারের গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের শক্তি ও বৈধতা থেকে।

এ ছাড়া কোনো সরকারের আমলে উন্নয়নের ফসল ঘরে তুলতে হলে তাকে বহুল প্রচলিত রাজনৈতিক কমিশন ভোগের সংস্কৃতির অবসান ঘটাতে হবে। কারণ, এতে উন্নয়নের খরচ বেড়ে যায়, অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা নষ্ট হয় এবং দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। কমিশন ভোগের মধ্য দিয়ে যে দুর্নীতি হয়, তাতে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বেশি নষ্ট হয়, অন্য কিছুতে এতটা নষ্ট হয় না। এরপর বিরোধীরা তা নিয়ে প্রচারণা চালায়। সারওয়ার মুরশিদ যে শেষজীবনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, মুরশিদের মূল্যবোধ কেমন ছিল। টিআইবি তখন এবং এখনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাহসী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে শুধু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের রায় পরিমাপ করা যায় না। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে, তাকে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে একদিকে যেমন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিসর বড় করতে হবে, তেমনি উন্নয়ন যেন আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, সে জন্য আইনপ্রণেতাদের যথাযথ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

আমাদের সমাজের সবচেয়ে গতিশীল যে অংশটি অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যেমন ছোট কৃষক, মজুরি শ্রমিক, নারী, ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতা, প্রবাসী শ্রমিক; তাদের অধিকাংশই এসেছে নিম্নবর্গ থেকে। তারা আমাদের সমাজের অর্ধাংশ ও কম সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি। তাদের উৎপাদনসক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এই গোষ্ঠীকে আরও প্রণোদনা দিতে হবে, সে জন্য বিনিয়োগ করতে হবে। তারা যেন সম্পদ ও দক্ষতাপ্রাপ্তির বেশি সুযোগ পায় এবং বাজারে প্রতিযোগিতা করার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে পারে, সে ব্যবস্থা যেমন করতে হবে, তেমনি মূল্যসংযোজনে তাদের আরও সুযোগ দিতে হবে। নিম্ন আয়ের উৎপাদকেরা যাতে ভ্যালু চেইনে আরও ওপরের দিকে উঠে আসতে পারে, সে লক্ষ্যে আমাদের এমন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে হবে, যাতে তাদের যৌথ উদ্যোগের জন্য সংগঠিত করা যায়। এটি শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তা নয়, এতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে এবং তা যেমন সমাজে ছড়িয়ে পড়বে, তেমনি টেকসই হবে।

কর্মমুখর জনগোষ্ঠীকে প্রণোদনা দিতে নীতি সহায়তাসহ বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এতে একদিকে রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়া যাবে, অন্যদিকে বিপুল অর্থনৈতিক উৎপাদনও হবে। যে সরকার এটা নিশ্চিত করবে, সেই সরকারের প্রতি মানুষের সমর্থনও থাকবে। অধিকতর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে। এতে অংশীজনের সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনি গণতন্ত্রায়ণও হবে। নির্বাচনে বেশি ভোট পেতে রাজনৈতিক দলের টাকা ও ক্ষমতাওয়ালা মানুষের ওপর নির্ভরশীল হলে চলবে না, এর জন্য তাদের লাখ লাখ নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর ওপর ভরসা করতে হবে। তৃণমূলে

এই মানুষদের উৎসাহিত করা গেলে তাঁরা সবচেয়ে যোগ্য মানুষকেই নির্বাচিত করবেন। কর্মীরা এমন উৎসাহিত হলে তাঁরা শুধু দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচিতই করবেন না, অগণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করবেন।

কোনো নেতা বা দল যদি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নিবেদিতপ্রাণ সমর্থকদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে এবং এ-ও জানে যে বিপুলসংখ্যক জনগণের সমর্থনও তার আছে, তাহলে তার পক্ষে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে সব প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া সম্ভব। আজ কোনো নেতার হাতে যদি এমন অন্তর্ভুক্তিমূলক হাতিয়ার এবং জনসমর্থন থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে সমাজের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিদের উৎসাহিত করা সম্ভব। যাঁরা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এমন বিপুল সমর্থন নিয়ে কোনো রাজনৈতিক নেতা উন্নয়নপ্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন, যা বাংলাদেশকে একটি গতিশীল দেশে পরিণত করতে পারে, যার অর্থনীতি হবে বহুমুখী এবং যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তিতে প্রণীত হবে। যার পেছনে থাকবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রদত্ত জনগণের রায়। এমন একটি দেশ ভিয়েতনামের মতো দেশকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, যার সুবিধা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে এই রূপান্তর ঘটাতে পারে।

সে রকম অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজে জনযুক্তিচর্চা করা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে টেকসই করার অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার, শাসনব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মুক্ত, স্বাধীন ও জবাবদিহিমূলক গণমাধ্যমকে সম্পদ বিবেচনা করতে হবে, শত্রু নয়—তাকে দমিয়ে রাখার কিছু নেই। যে ব্যবস্থায় পেশাজীবীরা প্রশাসনের অপশাসন থেকে দূরে থাকেন এবং যাঁরা ক্ষমতাবানদের মুখের ওপর সত্য বলতে পারেন, তাঁরা জনযুক্তিচর্চার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেন এবং সুশাসিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ ও অস্তিত্বের অপরিহার্য অংশ হিসেবে কাজ করেন।

আজকের পৃথিবী সারওয়ার মুরশিদ ও নূর জাহান মুরশিদের জনযুক্তিচর্চার পৃথিবী থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আমি যে মুরশিদের অধুনা পুরোনো মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ঘটাতে চাচ্ছি এবং আমাদের সমসাময়িক সমস্যা আমলে নিতে চাচ্ছি, তা অনেকটা *নিউ ভ্যালুস*-এর পুরোনো পাঠকদের কাছে পত্রিকাটি একসময় যেমন রোমান্টিক কল্পনাবিলাস মনে হতো, তার চেয়ে কম রোমান্টিক নয়। আশি বছরের বেশি হলো আমার। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে এই জীবনে একবার পূর্ণতার অভিজ্ঞতা হয়েছিল; মুরশিদ দম্পতিদের মতো আজও আমি স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সেই বাংলাদেশের রূপায়ণ দেখতে চাই, যা আমাকে পূর্ণতার আরেক বোধের সন্ধান দেবে।

প্রবন্ধটি তৈরি করা হয়েছে সারওয়ার মুরশিদ ও নূর জাহান মুরশিদ স্মারক বক্তৃতা অবলম্বনে।

রাজনীতি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা

ড্যানিয়েল এস লেন, দাম হি কিম, গি এস লি
ব্রায়ান ই উইকস, এবং নজিন কোয়াক

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক আলাপের বিবাদপূর্ণ প্রচলিত ধারা সম্পর্কে উদ্বেগ বাড়ন্ত। এর মধ্যেই পণ্ডিতেরা চিহ্নিত করা শুরু করেছেন যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে যেই সামাজিক প্রেক্ষাপট ও আদান-প্রদান তৈরি হয়েছে তা অনলাইন রাজনৈতিক আলোচনার পরোক্ষ অংশগ্রহণ থেকে বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথ তৈরি করতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের প্রেরণা এসব গতিশীলতাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এ বিষয়ে খুব বেশি কাজ নেই। এই গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত দুই মেয়াদে প্যানেল জরিপের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অনলাইনে রাজনৈতিক ভিন্নমত ও তর্ক-বিতর্ক থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহারকারীরা রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করে। এর ফলে তাদের অফলাইনে বা বাস্তব জীবনে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বাড়ে। এই সম্ভাবনা যাচাই করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের নির্দিষ্ট কিছু প্রেরণা রয়েছে, যেমন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, সম্পর্ক রক্ষা করা ও আত্মপ্রচার। আলোচনায় রাজনৈতিক ভিন্নমত তৈরি হলে ব্যবহারকারী কী পরিমাণে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করবে, তা এসব প্রেরণা দ্বারা নির্ধারিত হয় কি না, তা-ও এই গবেষণায় পরীক্ষা করা হয়েছে। আমাদের গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারের প্রভাবের ফলে বেশি আকারে অনলাইনে রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এর ফলে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। আমরা এ-ও পর্যবেক্ষণ করেছি, যেসব ব্যবহারকারী রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বা সম্পর্ক রক্ষার তাগিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে (আত্মপ্রচারের জন্য নয়), তাদের ওপর এই পরোক্ষ প্রভাব বেশি শক্তিশালী। আমাদের

● অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

ফলাফলে যে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, তা হলো অনলাইন রাজনৈতিক ভিন্নমত থেকে অফলাইন রাজনৈতিক সক্রিয়তা, যা রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক দুভাবেই উদ্বুদ্ধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বহুবিধ বিষয়ে আলোচনা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, তথ্য শেয়ারিং, রাজনীতি, সম্পর্ক রক্ষা।

ভূমিকা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক আলোচনা করা একটা বিচ্ছিরি কাজ। কিন্তু আধুনিক অনলাইন তথ্যজগৎ রাজনৈতিক মতপার্থক্যে বিক্ষিপ্ত। এর প্রমাণ আমরা পাই উত্তপ্ত ফেসবুক পোস্ট ও অনলাইন খবরের মন্তব্য সেকশনে অগ্নিগর্ভ সব মন্তব্য থেকে (কো, কেনস্কি এবং রেইনস, ২০১৪)। বেশির ভাগ সময়ই অনলাইন রাজনৈতিক আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারকারীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়ে থাকে। জনপ্রিয় অনলাইন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর ধরনটাই এ রকম যে এর ফলে সামাজিক সীমানা দুর্বল হয়ে যায়। আবার দ্বান্দ্বিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এমন ব্যবহারকারীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে অনলাইন প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক মতপার্থক্য এখন সাধারণ ঘটনা (ব্রানডিজ, ২০১০)।

অনলাইন রাজনৈতিক আলোচনার বিবাদপূর্ণ পরিস্থিতিকে আমাদের দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক পরিবেশের প্রধান প্রদায়ক হিসেবে জনপ্রিয় গণমাধ্যমে তুলে ধরা হয় (দেখুন, মিলার, ২০১৪)। পণ্ডিতেরাও একইভাবে অনলাইনে তথাকথিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের একই বিন্দুতে আলোচনার ফলাফল বুঝতে চেষ্টা করেছেন (যাকে বলা হয় অনলাইন ক্রস-কাটিং ডিসকাশন বা ওসিসিডি)। এখানে ব্যবহারকারী বিপরীত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন অপর ব্যক্তির সঙ্গে আলাপচারিতায় নিযুক্ত হয় (ব্রানডিজ, ২০১০; ওজসিয়েসজাক ও মুজ, ২০০৯)। আলোচনার গণতন্ত্র বা ডেলিবারিটিভ ডেমোক্র্যাসির তত্ত্ব অনুসারে আলোচনার ফলে নাগরিকেরা কার্যকর বিতর্কে যুক্ত হয়, গণতান্ত্রিক তাৎপর্য রয়েছে এমন বিষয়ে মতামত গঠন করে এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখে (চ্যাম্বারস, ২০০৩)। পরীক্ষামূলক প্রমাণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের একই বিন্দুতে আলোচনা ঘটলে রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা বাড়ে এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মান উন্নত হয় (মুজ, ২০০২বি; প্রাইস, ক্যাপেলা ও নির, ২০০২)। কিন্তু এমনও গবেষণা আছে, যেখানে দেখা গেছে যে এ ধরনের ক্রস-কাটিং আলোচনার ফলে নাগরিকেরা আত্মপ্রকাশের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং বাস্তব জীবনে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কমিয়ে

ফেলে (হাম্পটন ও অন্যান্য, ২০১৪; মুজ, ২০০২এ)।

অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার প্রভাব সম্পর্কে ফলাফল মিশ্র। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একধরনের অনন্য সম্পর্ক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট আছে। এই সম্পর্ক ও প্রেক্ষাপট ব্যবহারকারীদের অনলাইনে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থেকে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে পরোক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম-সম্পর্কিত গবেষণায় এ ধরনের পরোক্ষ পথের ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে তথ্য খোঁজা, সম্পর্ক গড়া ও রক্ষা করা এবং নিজের পরিচয় ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহারকারীর অনলাইন আচরণ নির্ধারিত হয় জটিল সব প্রেরণার মাধ্যমে (দেখুন ঝ্যাং ও লেউং, ২০১৪)। ব্যবহারকারীরা অনলাইন রাজনৈতিক আলোচনার অবিশ্বাসী জলের গভীরে যেতে থাকে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে ব্যক্তিগত প্রেরণা ও নেটওয়ার্কের ধরন তাদের উদ্বুদ্ধ করে (দেখুন পাপাচারিসি, ২০১০)। এখান থেকে নির্ধারিত হয় কীভাবে ব্যবহারকারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অভিব্যক্তিপূর্ণ সম্পর্ককে কাজে লাগাবে, যা আবার অফলাইনে আরও ব্যয়বহুল রাজনৈতিক সক্রিয়তার আগ্রহকে প্রভাবিত করতে পারে। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের পাল্টা উত্তর দেওয়ার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খবর বা রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করার ক্ষমতা ব্যবহারকারীর শক্তিশালী অভিব্যক্তিপূর্ণ অস্ত্রকে বাস্তব রূপ দান করে। কারণ এর ফলে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস যেমন বিবৃত হয়, তেমনি একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে জনসমক্ষে প্রতিশ্রুতি রাখা হয়। ক্রমেই এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করার ফলে শুধু নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী যার সঙ্গে দ্বিমত করল তার উত্তরই দেওয়া হয় না বা শুধু তার দৃষ্টিভঙ্গিই ছড়িয়ে দেওয়া হয় না (হাসেল ও উইকস, ২০১৬), বরং অনলাইন ও অফলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণেও আরও বেশি মাত্রায় প্রেরণা জোগায় (বওলিয়ান, ২০১৫)।

এই গবেষণায় পরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলে ব্যবহারকারীরা রাজনৈতিক তথ্যাদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করতে উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে অফলাইন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা বাড়ে। অনিবার্যভাবেই, যেভাবে অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনায় ব্যবহারকারীরা অংশ নেয়, সেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের প্রেরণাগুলো তাদের প্রভাবিত করে (দেখুন কোয়ান-হাস ও ইয়ং, ২০১০)। একইভাবে আমরা বের করতে চেয়েছি, কীভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে ব্যক্তির প্রেরণাগুলো অফলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্যকার প্রস্তাবিত পরোক্ষ পথের আয়তনকে প্রভাবিত করতে পারে। আর এটা ঘটে অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে।

আমরা অন্তত তিনটি পন্থায় আগের গবেষণাগুলোয় অবদান রাখব। প্রথমত, অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার প্রভাবের ওপর বর্তমান গবেষণাভিত্তিক বিতর্ককে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এমন একটি তাত্ত্বিক মডেল প্রস্তাব করব এবং তা যাচাই করব। অনলাইন রাজনৈতিক মতপার্থক্য থেকে অফলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা একটা প্রেক্ষাপটের সমর্থন পাই, যেখানে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ারিং এবং অফলাইন রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার মধ্যে একটা কারণিক সংযোগের মূলত ক্রস-সেকশনাল প্রমাণকে মজবুত করতে আমরা প্যানেল উপাত্ত ব্যবহার করব (বওলিয়ান, ২০১৫)। সবশেষে আমরা দেখাব, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে ব্যবহারকারীর প্রেরণাগুলো অনলাইন রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে কীভাবে সাড়া দেয়। এ ব্যাপারটা মৌলিকভাবে নির্ধারণ করে দেয় এসব প্রেরণা। আমরা এখানে শুধু যারা রাজনীতিতে যুক্ত হতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসে তারাই নয়, বরং যারা সামাজিক ও আত্মপ্রচারের লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়, তাদেরও পরীক্ষা করব। দেখব এর ফলে কারা আমাদের প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক মডেল থেকে লাভবান হয়।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য কি গণতন্ত্রের জন্য ভালো?

গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের ওপর ক্রস-কাটিং আলোচনার প্রভাব সম্পর্কে বিতর্ক আছে। পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে করেন, এর ফলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সহজতর হয় (যেমন শিউফিল, হার্ডি, ব্রোসার্ড, ওয়েজমেল-ম্যানর ও নিসবেট, ২০০৬)। আবার অনেকে মনে করেন যে এর ফলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে অনুৎসাহিত করা হয় (যেমন মুজ, ২০০২এ, ২০০৬; ভ্যালেনজুয়েলা, কিম ও গিল দো জুনিগা, ২০১২)। একদিকে মতপার্থক্য বিষয়ে আলোচনা মতামতের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা বাড়াতে পারে। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার মতামত সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস হারাতে পারে এবং পুনরায় আলোচনায় অংশ নিতে কম ইচ্ছুক হতে পারে (মুজ, ২০০২এ, ২০০৬)। অন্যদিকে রাজনৈতিক শিক্ষণ (শিউফিল, নিসবেট ও ব্রোসার্ড, ২০০৪), ভিন্নমতের প্রতি সহিষ্ণুতা (মুজ, ২০০২বি) এবং নিজেদের মতামত শোধন (প্রাইস ও অন্যান্য, ২০০২) সহজতর করার মাধ্যমে রাজনৈতিক মতপার্থক্য রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

অতিসম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্রস-কাটিং আলোচনা গবেষণা করে পরীক্ষা করা হয়েছে। সেখানে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখা গেছে যে এর ফলে হয়

আলোচনা নেটওয়ার্কের বৈচিত্র্য বাড়ে (কিম, সু ও দো জুনিগা, ২০১৩), নতুবা ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় (বাক্শি, মেসিং ও অ্যাডামিক, ২০১৫; হিমেলবইম, ম্যাকক্রেরি ও স্মিথ, ২০১৩)। আগের গবেষণায় দেখা গেছে যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রাজনৈতিক পার্থক্য প্রকাশ পাওয়াকে উৎসাহিত করতে পারে, আবার সীমিতও করতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও আদান-প্রদান কীভাবে অনলাইনে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ফলে যুক্তি-পাল্টাযুক্তির প্রতি নাগরিকেরা সাড়া দেয়, সে বিষয়ে খুব কমই কাজ হয়েছে। এই গবেষণায় আমরা যে সম্ভাবনাটি পরীক্ষা করব তা হলো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করা অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনায় সাড়া দেওয়ার একটি কৌশল হতে পারে।

রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতপার্থক্যে সাড়া দেওয়া

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গি ও খবর ছড়িয়ে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হলো শেয়ার করা (গিল দো জুনিগা, জুং ও ভ্যালেনজুয়েলা, ২০১২; উইকস ও হলবার্ট, ২০১৩)। তবে এ ধরনের শব্দবন্ধনীর ধারণাগত স্পষ্টতার অভাব রয়েছে এবং পণ্ডিতেরা বিভিন্নভাবে এর উল্লেখ করেছেন (কুম্পেল, কারোনস্কি ও কিলিং, ২০১৫; ল্যাম্পিনেন, ২০১৫)। এই লেখায় আমরা 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ারিং' (এসএমপিআইএস) শব্দবন্ধনী ব্যবহার করব। এর মাধ্যমে আমরা বেশ কতগুলো আচরণকে বোঝাব। এর মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা রাজনীতি ও চলমান ঘটনা নিয়ে তথ্যাদি ও মতামত শেয়ার করে। এসব শেয়ার হতে পারে তারা ব্যক্তিগত বন্ধুদের সঙ্গে করে, না হয় আরও বিস্তৃত জনগণের সঙ্গে করে। এই বিবেচনায় রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ারিং রাজনৈতিক ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (দেখুন স্করিক, ঝু, গহ ও প্যাং, ২০১৬)। কিন্তু আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে এর মাধ্যমে সেই কার্যাবলি বোঝায়, যেখানে বাস্তব রাজনৈতিক তথ্যাদি ও মতামত আদান-প্রদান হয় (এটা আপ-ভোটিং ও লাইক দেওয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক মতামত জানান দেওয়ার বিপরীত)।

ফেসবুক ও টুইটারে পোস্ট ও টুইট আকারে এ ধরনের রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ে ভরপুর (গট্রিফাইড, বার্থেল, সিয়ারার ও মিশেল, ২০১৬)। এগুলোর ব্যাপকতা থাকলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করা ব্যবহারকারীর সুনাম ও সম্পর্কের ওপর সম্ভাব্য প্রভাবের কারণে ঝুঁকিপূর্ণও বটে। থরসন (২০১৩) দেখিয়েছেন যে কলেজের শিক্ষার্থীরা ফেসবুকে

রাজনৈতিক বিষয়বস্তু শেয়ার দেওয়া এড়িয়ে চলে। তাদের ধারণা, এর ফলে তাদের ভুল বোঝা হবে এবং তাদের প্রতি অন্যায্য ধারণা পোষণ করা হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশের ওপর করা সাম্প্রতিক গবেষণায় একইভাবে দেখা গেছে, পাল্টা দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন তথ্যাদির উপস্থিতি ব্যবহারকারীকে নিজেদের মত প্রকাশে অনুৎসাহিত করতে পারে (হাম্পটন ও অন্যান্য, ২০১৪)। এর সঙ্গে নীরবতা তত্ত্বের প্যাঁচের মিল রয়েছে, যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে মানুষ যখন মনে করে সে সংখ্যালঘু, তখন তার মত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে (নোয়েল-নিউমান, ১৯৯১)। নীরবতা তত্ত্বের প্যাঁচ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য ছিল এটা ব্যাখ্যা করা যে কীভাবে ক্রস-কাটিং আলোচনা ব্যবহারকারীকে তার মতামত নিজের নেটওয়ার্কের মধ্যেই কম প্রভাবশালী হিসেবে ভাবতে শেখায়। ফলে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করতে নিরুৎসাহিত করে (গেয়ারহার্ট ও ঝ্যাং, ২০১৫)।

তবে গবেষণায় এমনও দেখা গেছে যে বেশির ভাগ পক্ষাবলম্বী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীর তালিকায় প্রধানত সমমনা রাজনৈতিক বিশ্বাসের বন্ধু থাকে। অ্যালগরিদমের কারণেও কিছুটা সমমনা বিষয়বস্তুগুলোই নিউজফিডে আসে (বাক্‌শি ও অন্যান্য, ২০১৫)। ফলে এসব ব্যবহারকারীর ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা কম। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সম্মুখীন হলে তুলনামূলক বিরল বেসুরো রাজনৈতিক তথ্যাদি ও মতামত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যখন বেশি মাত্রায় পাল্টা দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন তথ্যাদির সম্মুখীন হয়, তখন ব্যবহারকারীর দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের মধ্যে অনৈক্য (কগনিটিভ ডিসোন্যান্স) তৈরি হয়। কারণ তারা চায় অন্যদের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলন ঘটাতে (ডনসবাচ ও মাথিস, ২০১৩; ফেসটিঙ্গার, ১৯৬২)। আমাদের যুক্তি হলো, রাজনৈতিকভাবে সমমনা নেটওয়ার্কের মধ্যে তথ্যাদি শেয়ার করা হলে অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার ফলে সৃষ্ট অনৈক্য কমানোর একটি কার্যকর পন্থা হতে পারে। কারণ ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ারিং পুনরায় উন্মোচন করে। গবেষণায় এই বিতর্কের সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় যে যখন ব্যবহারকারী ভিন্নমতের তথ্যের সম্মুখীন হয়, তখন সে তার মতামত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে এমন তথ্যাদি খুঁজতে সক্রিয়ভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সম্পর্কগুলোকে কাজে লাগায় (নব্লোক-ওয়েস্টারউইক ও মেঙ, ২০১১)। শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে ব্যবহারকারী মতামত পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী তথ্যাদির খোঁজ পেতে পারে। এটা দুইভাবে হতে পারে: (১) শেয়ারিংয়ের আগে যেসব বিষয়বস্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসে তা বাছাই করার প্রক্রিয়া এবং (২) শেয়ার করা

তথ্যে সমমনা ব্যক্তিদের লাইক দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানানো। রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করার আগে ব্যবহারকারী অবশ্যই নিজ মতামত সমর্থন করে বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এমন তথ্যাদি খুঁজে এবং নিজে নিজে সেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে (লি ও মা, ২০১২)। এই প্রক্রিয়া অনৈক্য কমানোর মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা দিতে পারে। এমনও প্রমাণ আছে যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের নেটওয়ার্কের লোকজনের কাছ থেকে মতামত সমর্থনমূলক প্রতিক্রিয়া পায়। ফলে তাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহ দূর হয় (চো, আহমেদ, কিউম, চই ও লি, ২০১৬)।

এই গবেষণায় আমরা বলতে চেয়েছি যে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ফলে সৃষ্ট অনৈক্য কমাতে শেয়ারিং একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। একইভাবে আমরা যুক্তি দিয়েছি যে অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করার সম্পর্ক থাকতে পারে। কারণ ব্যবহারকারীরা তাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে মতামত পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী তথ্যাদি এবং রাজনৈতিকভাবে সমমনা ব্যক্তিদের কাছ থেকে সমর্থন আশা করে। নিচের হাইপোথেসিস বা অনুমান দিয়ে আমরা এটা বোঝাতে পারি :

হাইপোথেসিস১ : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করার সঙ্গে অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা (ওয়েভ১) ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত (ওয়েভ১)।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে প্রেরণার ভূমিকা

মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন ও লক্ষ্য নিয়ে (পার্ক, কি ও ভ্যালেনজুয়েলা, ২০০৯)। এর মানে দাঁড়ায়, অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করার সম্পর্ক ব্যবহারকারী ব্যক্তির প্রেরণার ওপর নির্ভরশীল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের প্রেরণা খুঁজতে গিয়ে ব্যবহার ও পরিতৃপ্তির তাত্ত্বিক কাঠামো প্রয়োগ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে মানুষ নির্দিষ্ট কিছু প্রয়োজন মেটাতে সক্রিয়ভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে থাকে (কোয়ান-হাস ও ইয়ং, ২০১০)। আগের গবেষণাগুলোয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খবর শেয়ার করার পেছনে তিন ধরনের প্রাথমিক প্রেরণা চিহ্নিত করা হয়েছে : পরোপকারী, সামাজিক ও নিজ স্বার্থ (কুম্পেল ও অন্যান্য, ২০১৫)। পরোপকারী প্রেরণা যেসব ব্যবহারকারীর, তারা তাদের সামাজিক নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকা ব্যবহারকারীদের জন্য খবর ও তথ্য শেয়ার করে থাকে (বয়েড, গোল্ডার ও লোটান, ২০১০)। যাদের সামাজিক প্রেরণা থাকে, তারা

খবর ও তথ্য শেয়ার করে অন্যদের সামাজিকীকরণ ঘটাতে এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে (লি ও মা, ২০১২)। সবশেষে, যারা নিজ স্বার্থে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে থাকে, তারা মনোযোগ পেতে এবং নিজেদের সুনাম বৃদ্ধির জন্য খবর ও তথ্যাদি শেয়ার করে থাকে (বয়েড ও অন্যান্য, ২০১০; লি ও মা, ২০১২)।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খবর শেয়ার করার পেছনে কোন ধরনের প্রেরণা কাজ করে, তা ব্যাপকভাবে গবেষণা করা হয়েছে (যেমন দেখুন স্করিক ও অন্যান্য, ২০১৬)। কিন্তু অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা ও রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ারিংয়ের মধ্যে যে সম্পর্কের হাইপোথেসিস আমরা দিয়েছি, এসব বিভিন্ন প্রেরণা তা পরিচালনা করে কি না, সে বিষয়টি খুব একটা স্পষ্ট নয়। কুম্পেল ও অন্যান্য (২০১৫) এবং অন্যান্য গবেষণার ওপর ভিত্তি করে আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের তিনটি প্রেরণাকে আমাদের তাত্ত্বিক মডেলের জন্য প্রাসঙ্গিক মনে করি : (১) সামাজিক বিষয় ও রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া, (২) সম্পর্ক রক্ষা করা এবং (৩) আত্মপ্রচার।

প্রথমত, যারা সামাজিক বিষয় ও রাজনীতিতে যুক্ত হতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তাদের জন্য অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ারিংয়ের মধ্যে সম্পর্কের ইতিমধ্যে শক্তিশালী সংযোগ পাওয়া যায়। এমন ব্যবহারকারীরা প্রধানত রাজনৈতিকভাবে আগ্রহী থাকে। ফলে মতপার্থক্যের সম্মুখীন হয় অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার মাধ্যমে, যা আবার তার দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের মধ্যে আরও বেশি অনৈক্য বা কগনিটিভ ডিজোন্যান্স সৃষ্টি করে (ডনসবাচ ও মোথিস, ২০১৩; ফেস্টিঙ্গার, ১৯৬২)। কগনিটিভ ডিজোন্যান্স কমাতে এসব ব্যবহারকারী তাদের পূর্বের বিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায় এবং তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফলে তথ্যাদি শেয়ার করার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত করতে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত হতে চায় (গ্রিন, পামকুইস্ট ও শিকলার, ২০০৪)। এসব চিন্তা ছাড়াও আমরা নিচের হাইপোথেসিস দিতে চাই :

হাইপোথেসিস২ : অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা (ওয়েভ১) এবং রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ারিংয়ের (ওয়েভ১) মধ্যে সংযোগ সেসব ব্যবহারকারীর মধ্যে বেশি শক্তিশালী, যারা সামাজিক বিষয় ও রাজনীতিতে যুক্ত হতে গিয়ে (ওয়েভ১) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

যখন রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সম্মুখীন হয়, তখন অরাজনৈতিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের শেয়ার করার সম্ভাবনাকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে? পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করার অন্যতম প্রধান প্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (এলিসন, ভিটাক, গ্রে ও ল্যাম্প, ২০১৪)। যখন এ ধরনের ব্যবহারকারীরা অনলাইনে প্রচণ্ড রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সম্মুখীন হয়, তখন রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করা তাদের জন্য সম্পর্ক তৈরি ও রক্ষা করার একটি পথ বাতলে দিতে পারে। যেমন টুইটারে, ব্যবহারকারীরা খবরের নিবন্ধ শেয়ার করে যখন সেগুলো তাদের নিজেদের মতবিরুদ্ধ হয়। তবে তারা সেগুলো শেয়ার করে তখনই, যদি তা তাদের অনুসারীদের রাজনৈতিক মতের সঙ্গে মিলে যায় (অ্যান, কোয়েরসিয়া, চা, গুম্মাদি ও ক্রওক্রফট, ২০১৪)। এমন টুইটার ব্যবহারকারীদের জন্য নিজেদের মতবিরুদ্ধ খবরের নিবন্ধ শেয়ার করা সামাজিকীকরণ ও সম্পর্ক রক্ষা করার পদ্ধতি হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে এটাও হতে পারে যে যারা সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তারা রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে তাদের সম্পর্কের জন্য হুমকিস্বরূপ বিবেচনা করতে পারে এবং মনে করে যে শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে তাদের সামাজিক যোগাযোগ আরও বেশি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে (থরসন, ২০১৩)। বস্তুত, অনেক টুইটার ব্যবহারকারী বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে চলে। এর পরিবর্তে তারা সব ধরনের মানুষের জন্য নিরাপদ তথ্যাদি শেয়ার করতে চায় (মারউইক ও বয়েড, ২০১১)।

নিজের সম্পর্কে ধারণার ব্যবস্থাপনা ও আত্মপ্রচারের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে (এলিসন, হেইনো ও গিবস, ২০০৬; জেন্টিল, টুয়েঙ্গি, ফ্রিম্যান ও ক্যাম্পবেল, ২০১২)। বড় আকারের জনগণকে আকৃষ্ট করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা তাদের পরিচয়সত্তার নির্দিষ্ট দিকের ওপর জোর দেয় অথবা কম জোর দেয়। নির্ভর করে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া তারা পায় তার ওপর (মারউইক ও বয়েড, ২০১১)। যখন অনলাইনে আত্মপ্রচারের জন্য ব্যবহারকারী রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সম্মুখীন হয়, তখন তারা রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করতে পারে। উদ্দেশ্য থাকে নিজেদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করানো বা সামাজিক নেটওয়ার্কের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া বের করা। নিজেদের রাজনৈতিকভাবে প্রজ্ঞাবান বা নিজের মতে অটল থাকে বলে প্রমাণ করতে পারলে এসব ব্যবহারকারী তাদের কাঙ্ক্ষিত ভাবমূর্তি প্রকাশ করতে পারে (গিল দো জুনিগা ও অন্যান্য, ২০১২)। তবে এটাও হতে পারে যে শেয়ার করাটা সুনামের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ; বিশেষ করে সেসব অবস্থায়, যেখানে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সম্ভাবনার মধ্যে আমরা নিচের গবেষণা প্রশ্নটি উপস্থাপন করছি :

গবেষণা প্রশ্ন ১: অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা (ওয়েভ১) ও রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ারিংয়ের (ওয়েভ১) মধ্যে সম্পর্ক কি সেসব ব্যবহারকারীর জন্য ভিন্ন হয়, যারা সম্পর্ক রক্ষা বা আত্মপ্রচারের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে?

রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করা ও অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

মানুষের জীবনে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপ্তি ঘটেছে অনেক। ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে বাস্তব জীবনে প্রথাগত রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কমে যাবে বলে উদ্বেগ রয়েছে (পুটনাম, ২০০০)। একইভাবে অন্যরা মনে করে যে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কারণ এর ফলে কম খরচে ও কম সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ করা যায়। যার ফলে মানুষ রাজনীতিতে যুক্ত না হয়েও ভাবে যে তারা যুক্ত রয়েছে। এভাবে তাদের প্রকৃত অংশগ্রহণ সীমিত করে ফেলছে (গ্ল্যাডওয়েল, ২০১০)। তবে এ ধরনের উদ্বেগ অতিমাত্রায় নিরাশাবাদী। কারণ গবেষণায় দেখা যায় যে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্পর্ক রয়েছে (বওলিয়ান, ২০০৯, ২০১৫)।

অফলাইনে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সম্পর্ক নিয়ে করা গবেষণার বেশির ভাগই জোর দেয় একটি বিষয়ের ওপর। তা হলো, এই মাধ্যমগুলোয় কম সংশ্লিষ্টতার রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গি প্রথাগত অংশগ্রহণকে কমিয়ে ফেলার বদলে উৎসাহিত করে (ভ্যাকারি ও অন্যান্য, ২০১৫)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করাকে কম সংশ্লিষ্টতার রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এ ধরনের আচরণের শারীরিক মূল্য তুলনামূলকভাবে কম (চাডউইক, ২০০৯; ভ্যাকারি ও অন্যান্য, ২০১৫)। যদিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর কায়িক পরিশ্রম খুব একটা দরকার হয় না, কিন্তু এর ফলে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সহজতর হয়। পিংগ্রি (২০০৭) মনে করেন, রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ নাগরিকদের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইতিবাচক বাড়তি প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ এর ফলে আত্মপ্রকাশকারী নিজেকে বিস্তৃত করতে চায় এবং সেই বার্তায় যুক্ত হয়। এতে করে তারা রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ হয়। রাজনৈতিক তথ্যাদি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বাইরে যেতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং অফলাইনে রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত হয় (রোজাস ও পুইগ-ই-আব্রিল, ২০০৯)। এ ছাড়া অনলাইনে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করার ফলে রাজনীতি সম্পর্কে আরও জানতে, রাজনৈতিক ঘটনার সমন্বয় করতে এবং অংশগ্রহণ করতে ব্যক্তিকে উৎসাহিত

করতে পারে। এর সবগুলোই অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঘটায় (কোয়াক, উইলিয়ামস, ওয়াং ও লি, ২০০৫)। গবেষণালব্ধ প্রমাণও এই বিতর্ককে সমর্থন করে। এখানে দেখা যায় যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু শেয়ার করা, পোস্ট দেওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার ফলে অফলাইনে আরও বেশি রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ঘটে (গিল দো জুনিগা, মলিনো ও ঝেঙ, ২০১৪; ভ্যাকারি ও অন্যান্য, ২০১৫)। বিদ্যমান তত্ত্ব ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা নিচের হাইপোথেসিস দাঁড় করিয়েছি :

হাইপোথেসিস ৩ : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ার করার (ওয়েভ১) সঙ্গে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (ওয়েভ২) ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে।

মতপার্থক্য থেকে শেয়ার করার মাধ্যমে পদক্ষেপ নেওয়া : একটি তাত্ত্বিক নমুনা

অন্যান্য গবেষণা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা আদতে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে। এটা ঘটে থাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করার মাধ্যমে। এই পর্যন্ত এ ধরনের পরোক্ষ পথ পরীক্ষা করে দেখার মতো কোনো কাজ হয়নি। কিন্তু অনলাইনে নির্দিষ্ট ধাঁচের কিছু রাজনৈতিক আচরণ যে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া যায় (কোয়াক ও অন্যান্য, ২০০৫; ভ্যাকারি ও অন্যান্য ২০১৫)। একইভাবে আমরা একটি তাত্ত্বিক মডেল দাঁড় করিয়েছি, যেখানে অনলাইন মতপার্থক্য থেকে অফলাইনে সক্রিয় হওয়ার পরোক্ষ পথের কথা বলা হয়েছে। আর এটা ঘটে থাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করার মাধ্যমে (চিত্র ১)। নিচের হাইপোথেসিসটি আমরা দাঁড় করিয়েছি।

চিত্র-১ : তাত্ত্বিক নমুনা

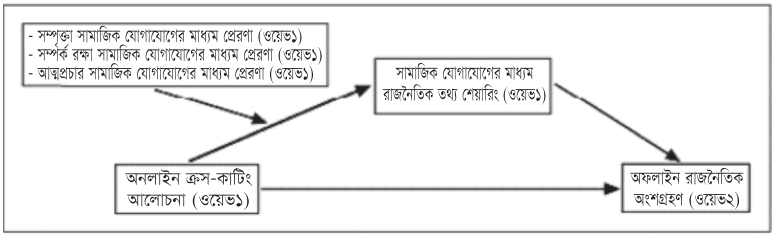

হাইপোথেসিস ৪ : অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা (ওয়েভ১) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার (ওয়েভ১) করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (ওয়েভ২) সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত।

এই অনুমিত পরোক্ষ পথ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে ব্যবহারকারীর প্রেরণার ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন হতে পারে কি না, তা-ও আমরা পরীক্ষা করেছি। যেহেতু এই প্রভাব বিষয়ে আগের কোনো কাজ নেই, তাই আমরা নিচের গবেষণা প্রশ্নটি উত্থাপন করছি :

গবেষণা প্রশ্ন ২ : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করার মাধ্যমে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে (ওয়েভ২) অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার (ওয়েভ১) পরোক্ষ প্রভাব কি ব্যবহারকারীর প্রেরণার ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন হয় (সামাজিক বিষয় ও রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টতা, সম্পর্ক রক্ষা বা আত্মপ্রচার)?

গবেষণা পদ্ধতি

নমুনা

যুক্তরাষ্ট্রে দুই পর্যায়ে হওয়া জাতীয় অনলাইন জরিপের উপাত্ত ব্যবহার করে এই গবেষণা করা হয়েছে। জরিপকারী সংস্থা ইপসস অনলাইন উত্তরদাতাদের জোগাড় করেছে। ইপসসই সব উপাত্ত সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করেছে। নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে জরিপ-পূর্ব একটি প্যানেলের উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে। এই প্যানেলে প্রায় দশ লাখ পরিবার ছিল। তারা অনলাইন জরিপে অংশ নিতে নির্দিষ্ট বিরতিতে যোগাযোগ করার অনুমতি দিয়েছিল। বয়স ও লিঙ্গের জন্য কোটা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যেন জাতীয় জনসংখ্যার প্রতিফলন ঘটে এমন একটি নমুনা চূড়ান্ত করা যায়। যদিও এই কোটার ভিত্তিতে নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি প্রথাগত সম্ভাব্যতা নমুনা প্রক্রিয়ার চেয়ে আলাদা, কিন্তু এর ফলে তুলনামূলক উপাত্ত পাওয়া গেছে (পুটনাম, ২০০০)। জরিপের ওয়েভ১ পরিচালনা করা হয়েছিল ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাধারণ ক্যাম্পেইনের সময়। প্রথম পর্যায়ের এই জরিপে সাড়া প্রদানের হার ছিল ৭ দশমিক ২ শতাংশ। ১৭ হাজার ৩৮১ জনকে জরিপে অংশ নিতে বলা হলে ১ হাজার ২৫০ জন জরিপ সম্পন্ন করে। একই সময়ে করা বড় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানের হারের সঙ্গে এই হার তুলনাযোগ্য (পিউ রিসার্চ সেন্টার, ২০১২)। ওয়েভ১-এ অংশ নেওয়া সব উত্তরদাতাকে ওয়েভ২-তে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয় ২০১২ সালের নভেম্বরে। মোট ৯৫০ জন উত্তরদাতা জরিপ সম্পন্ন করে। ফল দাঁড়ায় ৭৬ শতাংশ সময়োগী মূল্য বা রিটেনশন রেট। চূড়ান্ত নমুনায় যে জনমিতি পরিস্থিতি পাওয়া গেছে, তা জাতীয় জনসংখ্যাচিত্রের সঙ্গে মিলে যায়। এই জাতীয় জনসংখ্যাচিত্র ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি ব্যুরোর আমেরিকান কমিউনিটি জরিপে (এসিএস) পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে জরিপ করা হয়েছিল চলকের জন্য। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৮ ও তার চেয়ে বড় বয়সের মানুষের মিডিয়ান বয়স (ACS

= 45–54, W1 = 47), নারীদের শতকরা হার (ACS = 51.4%, W1 = 52%) এবং মিডিয়ান খানা আয় (ACS = US$50,000–US$74,999, W1 = US$60,000– US$64,999)। একমাত্র ব্যতিক্রম পাওয়া গেছে ২৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সীদের গড় শিক্ষার হারে। শিক্ষার হার (কলেজ ডিপ্লোমা) আমাদের ওয়েভ১ জরিপে এসিএসের (কিছু কলেজ) চেয়ে বেশি। ওয়েভ২-এর জনমিতি জরিপ ওয়েভ১-এর সঙ্গে তুলনাযোগ্য। শুধু গড় বয়সের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। গড় বয়স ওয়েভ২-তে বেশি (৫৩ বছর)। ওয়েভ১-এ তা ৪৭ বছর।

আমাদের গবেষণা মূলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে প্রেরণা ও আচরণের ওপর জোর দেয়। তাই আমাদের বিশ্লেষণ সীমিত রেখেছি শুধু তাদের মধ্যেই, যারা ওয়েভ১ জরিপে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে উত্তর দিয়েছে, যেমন ফেসবুক বা টুইটার (n = 861, 68.9%)। যারা ওয়েভ২-তে ছিল, তাদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রযোজ্য। চূড়ান্ত নমুনা ছিল ৫৯৪ জন উত্তরদাতার।

পরিমাপ

অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা: রাজনৈতিক মতপার্থক্য বিষয়ে অনলাইন কথোপকথনের মাত্রা নির্ণয় করতে দুটি পরিমাপ ব্যবহার করে একটি সূচক তৈরি করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তারা গত মাসে কী পরিমাণে (১) তাদের পছন্দের প্রার্থীর যারা বিরোধিতা করেছে তাদের সঙ্গে অনলাইনে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং (২) 'মতপার্থক্য রয়েছে এমন রাজনীতি বা সামাজিক বিষয়ে অনলাইন কথোপকথন হয়েছে'। দুটি বিষয়েই ৬ পয়েন্টের স্কেলে পরিমাপ করা হয়েছে। উত্তরগুলো ছিল 'একেবারেই না' থেকে 'প্রতিদিন'। ফলাফলপ্রাপ্ত সূচক আমাদের অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা পরিমাপে কাজ দিয়েছে (ওয়েভ১; এম=১.৫০, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=০.৯৬, আর=.৭৫)।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার: উত্তরদাতারা কী পরিমাণে নির্দেশিত ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক তথ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে, তা বোঝার জন্য ওয়েভ১ পরিচালনার সময় তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, গত মাসে কী পরিমাণে তারা (১) 'তাদের বন্ধুবান্ধব, পরিবার বা পরিচিতজনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে রাজনীতি ও চলমান বিষয়ে তথ্য বা মতামত শেয়ার করেছে' এবং (২) 'কী পরিমাণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তথ্য বা মতামত এমনভাবে পোস্ট করেছে, যাতে অন্যরাও রাজনীতি ও চলমান বিষয় সম্পর্কে তথ্য বা মতামত শেয়ার করতে পারে। এগুলোও একই রকম ৬ পয়েন্টের

স্কেলে পরিমাপ করা হয়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং সূচকে একত্র করা হয়েছে (ওয়েভ১; এম=১.৯১, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=১.৩৩, আর=.৮১)।

অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পরিমাপের জন্য পাঁচটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কী পরিমাণে তারা (১) 'রাজনৈতিক সমাবেশ, মিছিল বা বক্তৃতায় অংশ নিয়েছে', (২) 'কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজ করেছে', (৩) 'কোন সরকারি কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে', (৪) 'ভোট দিতে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেছে', এবং (৫) 'কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের জন্য অর্থ-সহায়তা দিয়েছে'। প্রতিটি পরিমাপক একই রকম ৬ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়েছে এবং তারপর অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পরিমাপের জন্য দুটি সূচকে একত্র করা হয়েছে। 'অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ'কে (ওয়েভ২) আমাদের নির্ভরশীল চলক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে (এম=১.৬০, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=০.৭২, এ=.৭৬)। আবার 'অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ'কে (ওয়েভ১) অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বেসলাইন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়েছে (এম=১.৫০, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=০.৬৮, এ=.৭৮)।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রেরণা: আগের গবেষণায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের বিভিন্ন ধরনের প্রেরণা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে (যেমন কুম্পেল ও অন্যান্য, ২০১৫)। এই গবেষণায় তিনটি নির্দিষ্ট প্রেরণার নিয়ন্ত্রক ভূমিকা দেখা হয়েছে—রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, সম্পর্ক রক্ষা এবং আত্মপ্রচার। এর সবগুলোই দেখানো হয়েছে যে ইতিবাচকভাবে অনলাইন ও অফলাইন সামাজিক পুঁজি ও নাগরিক সংশ্লিষ্টতায় প্রভাব ফেলে (পার্ক ও অন্যান্য, ২০০৯)। ব্যবহারকারীদের প্রেরণা নিরূপণে আমরা উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা 'নির্দিষ্ট কারণে' ফেসবুক বা টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেছিল কি না। এর ফলে আমরা উত্তরদাতাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের প্রেরণামূলক উপাদান পরিমাপ করতে পেরেছি। এটাকে আমরা তাদের প্রেরণার যুক্তিসংগত নিরূপণ বলে মনে করি।[১] এ বিষয়গুলো ৬ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে 'একদম দ্বিমত করা' থেকে 'একদম একমত' উত্তর ছিল। চারটি পরিমাপকের একটি সূচক ব্যবহার করে 'রাজনীতি ও সামাজিক বিষয়ে সম্পৃক্ততার' জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের প্রেরণা নিরূপণ করা হয়েছে: (১) 'গণসংশ্লিষ্ট ও রাজনীতি বিষয়ে তথ্য বিনিময় করা', (২) 'সংবাদ ও গণসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা', (৩) 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা', এবং (৪) 'কোনো

সামাজিক বিষয়ে প্রচারণা চালানো' (ওয়েভ১; এম=২.৭১, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=১.৪৪, এ=.৯১)। দুটি পরিমাপকের একটি সূচক ব্যবহার করে 'সম্পর্ক রক্ষার' জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের প্রেরণা নিরূপণ করা হয়েছে: (১) 'অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা' এবং (২) 'নিজের নেটওয়ার্কের মধ্যে যারা আছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা' (ওয়েভ১; এম=৪.৯৩, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=১.২৬, আর=.৭৭)। সবশেষে দুটি পরিমাপকের একটি সূচক ব্যবহার করে 'আত্মপ্রচারের' জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের প্রেরণা নিরূপণ করা হয়েছে: (১) 'নিজের ব্যক্তিগত দক্ষতা বা লুক্কায়িত মেধা ব্যবহার করে অন্যদের মুগ্ধ করা' এবং (২) 'জনপরিসরে করা নিজের কোনো অর্জন সম্পর্কে অন্যদের জানিয়ে রাখা' (ওয়েভ১; এম=২.২৭, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=১.৩৯, আর=.৭৬)।

নিয়ন্ত্রক চলক: আমাদের বিশ্লেষণে বেশ কয়েকটি নিয়ন্ত্রক চলক অন্তর্ভুক্ত করেছি। এগুলো হয়তো স্বাধীন ও মধ্যস্থতাকারী চলকের সঙ্গে তাত্ত্বিকভাবে সম্পর্কিত অথবা নির্ভরশীল চলককে প্রভাবিত করে বলে পরিচিত। নির্দিষ্টভাবে আমরা এই সম্ভাবনার জন্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাই যে আমরা যে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করি, তা শুধু সামগ্রিকভাবে ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের কারণে। যারা অনলাইনে রাজনীতিতে সক্রিয়, তাদের অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি (বওলিয়ান, ২০০৯)। এটা ধরে নিয়ে আমরা সামগ্রিক 'অনলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ চলক' নিয়ন্ত্রণ করি। এই পরিমাপক নির্মাণ করা হয়েছে গত মাসে উত্তরদাতারা কী পরিমাণে ছয়টি রাজনৈতিক আচরণে যুক্ত হয়েছিল তার একটি সূচক তৈরি করার মাধ্যমে (যেমন কোনো অনলাইন পিটিশন শুরু করা, কোনো অনলাইন গ্রুপে যুক্ত হতে ক্লিক করা)। এটাও আগেরগুলোর মতো ৬ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করে করা হয়েছে (ওয়েভ১; এম=১.৬৪, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=০.৭০)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করার সামগ্রিক প্রবণতার প্রতিফলন কি না, তা জানতে আমরা উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তারা গত মাসে কী পরিমাণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করেছে। এই প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ারিং' চলকের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করি। এ বিষয়টিও একই রকম ৬ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়েছে (ওয়েভ১; এম=২.৪৪, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=১.৪৩)। গবেষণায় দেখা যায় যে রাজনৈতিক তথ্য পাঠানো বা গ্রহণ করা দুটিই সম্ভবত পরবর্তী সময়ে তাদের 'অফলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণে' প্রভাব ফেলে (ভ্যাকারি ও অন্যান্য, ২০১৫)। এর ফলে আমরা দুটি পরিমাপক ব্যবহার করে সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য গ্রহণের চলক নিয়ন্ত্রণ করি। এটা করা হয় তাদের এই প্রশ্ন করার মাধ্যমে যে গত মাসে তারা কী পরিমাণে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক তথ্য গ্রহণ করেছে। প্রতিটি আইটেম একই রকম ৬ পয়েন্ট মাত্রার স্কেল ব্যবহার করে নিরূপণ করা হয়েছে। দুটিই 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য গ্রহণের' একটি সূচকে একত্র করা হয়েছে (ওয়েভ১; এম=৩.১৮, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=১.৬২, আর=.৫৩)।

পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে উত্তরদাতাদের রাজনৈতিক আগ্রহ ও রাজনৈতিক খবর হজম করার মাত্রা দ্বারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং প্রভাবিত হয় (হ্যাসেল ও উইকস, ২০১৬)। এর ফলে আমরা 'রাজনৈতিক আগ্রহ' চলক নিয়ন্ত্রণ করি। এটা করা হয় উত্তরদাতাদের এই প্রশ্ন করার মাধ্যমে যে তারা 'আমি রাজনীতিতে বেশ আগ্রহী' বক্তব্যের সঙ্গে একমত কি না। এটাও ৬ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করে করা হয়েছে (১: 'একদম দ্বিমত' থেকে ৬: 'একদম একমত', এম=৩.৪২, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=১.৫৬)। প্রথাগত গণমাধ্যম ব্যবহার নিরূপণ করতে উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তারা কী পরিমাণে দৈনিক সংবাদপত্র, জাতীয় নৈশখবর এবং স্থানীয় টেলিভিশন খবর দেখে। প্রতিটি আইটেমের উত্তরগুলো ৫ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়েছে—'কখনোই না' থেকে 'প্রায়ই'। এরপর এগুলোকে 'প্রথাগত গণমাধ্যম ব্যবহার' সূচকে সংক্ষেপিত করা হয়েছে (এম=৩.১৮, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=১.০২, ক্রোনবাক'স এ=.৬৭)।

এরপর আমরা রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার প্রভাব অভিপ্রায় হিসেবে পরিচিত নির্মাণগুলো নিয়ন্ত্রণ করি। এর মধ্যে যেমন রয়েছে রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা (ক্যাপ্রারা, ভেসিয়োন, কাপান্না ও মিবেন, ২০০৯) এবং পক্ষাবলম্বনের শক্তি (গ্রিন, ১৯৯৯)। উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, তারা 'আমি মনে করি, রাজনীতি যেভাবে চলছে তাতে আমার তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে' বক্তব্যের সঙ্গে একমত কি না। এর মাধ্যমে তাদের 'রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা' পরিমাপ করা হয়েছে। এটাও ৬ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করে নিরূপণ করা হয়েছে (১: 'একদম দ্বিমত' থেকে 'একদম একমত', এম=৩.৪২, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=১.৫৬)। পক্ষাবলম্বনের শক্তি পরিমাপ করতে উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তাদের দলীয় সংশ্লিষ্টতা বলতে: শক্তিশালী ডেমোক্র্যাট, মাঝারি ডেমোক্র্যাট, স্বাধীন, মাঝারি রিপাবলিকান, শক্তিশালী রিপাবলিকান অথবা অন্যান্য। দলীয় সংশ্লিষ্টতা ভিন্ন কোডে ফেলে 'পক্ষাবলম্বনের শক্তি' হিসাব করা হয়েছে {১=কোনো দলীয় সংশ্লিষ্টতা নেই (এন=১৭৯), ২=মাঝারি রিপাবলিকান/ডেমোক্র্যাট (এন=২৪৩), ৩=শক্তিশালী রিপাবলিকান/ডেমোক্র্যাট (এন=১৭২); এম=১.৯৯, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন=০.৭৭}।

সবশেষে বয়স, লিঙ্গ ও শিক্ষাকে জনতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রক চলক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত

করা হয়েছে।

ফলাফল

নকশা ১-এ প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক মডেল পরীক্ষা করার জন্য আমরা তিনটি সংযত মধ্যস্থতা বিশ্লেষণ পরিচালনা করেছি। প্রতিটিই একটি স্বতন্ত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের উদ্দেশ্যকে (যেমন সম্পৃক্ততা, সম্পর্ক রক্ষা বা আত্মপ্রচারকে) নিয়ামক হিসেবে ধরে করা হয়েছে। মডেলের মধ্যস্থতা অংশের মাধ্যমে যে বিষয়টি পরীক্ষা করা হয়েছে, তা হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে (ওয়েভ১) 'অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের' (ওয়েভ২) ওপর অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার (ওয়েভ১) প্রভাব। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের প্রতিটি প্রদেয় উদ্দেশ্য দ্বারা অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের সম্পর্ক কতটুকু নিয়ন্ত্রিত হয় তা পরীক্ষা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং (ওয়েভ১) এবং অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (ওয়েভ২) মধ্যে কার্যকারণ সংযোগ পরীক্ষা আরও শক্তিশালী করতে আমরা প্যানেল উপাত্ত ব্যবহার করেছি। এর ফলে অংশগ্রহণের মাত্রা ডব্লিউ১ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে ঘটা পরিবর্তন আমরা কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করতে পারি (এভল্যান্ড ও থমসন, ২০০৬)। প্রতিটি মডেলে আমরা জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম-নির্দিষ্ট আচরণ, এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের অন্যান্য উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করি। হায়েসের (২০১৩) সুপারিশ অনুযায়ী আমরা আনস্ট্যান্ডার্ডাইজড রিগ্রেশন কোইফিশিয়েন্ট ব্যবহার করেছি এবং *R2*-এর পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করেছি মূল চলকগুলোর জন্য প্রভাব আকারের পরিমাপক হিসেবে (প্রতি টেবিলে মন্তব্য আকারে দেওয়া হয়েছে)[২]।

অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের (হাইপোথেসিস ১) সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত কি না, তা পরীক্ষা করতে আমরা আন্তক্রিয়া টার্মগুলো যুক্ত করার আগে সব প্রেডিক্টর চলক এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক মূল্যায়ন করেছি (টেবিল ১, প্রথম কলাম)[৩]। অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত, *বি=.৩৫* (.০৫), *পি<.০০১*। এতে দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক মতপার্থক্যপূর্ণ অনলাইন আলোচনায় প্রায়ই অংশ নেওয়া ব্যবহারকারীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করার সম্ভাবনা বেশি। এর সঙ্গে আমাদের প্রথম হাইপোথেসিসের মিল রয়েছে।

এই মডেলে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের সঙ্গে

সংযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত {*বি=.২৪* (.০৩), *পি<.০০১*}। আবার সম্পর্ক রক্ষার উদ্দেশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের সঙ্গে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কিত {*বি=-.০৮* (.০৩), *পি<.০১*}। যারা রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তারা সাধারণত রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করে। কিন্তু যারা সম্পর্ক তৈরি ও রক্ষা

টেবিল ১ : সম্পৃক্ততা প্রেরণাকে মেডিয়েটর হিসেবে ব্যবহার করে মডারেটেড মেডিয়েশনের জন্য রিগ্রেশন বিশ্লেষণের সংক্ষেপসার

	সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য শেয়ারিং (ওয়েভ১) (মেডিয়েটর)		**অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (ওয়েভ২) (ক্রাইটেরিয়ন)**
	বি (এসই)	বি (এসই)	বি (এসই)
এসএম রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং (ওয়েভ১)	-	-	.০৪ (.০২)#
অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা (ওয়েভ১)	.৩৫ (.০৫)***	.০৭ (.১১)	.০১ (.০৩)
সম্পৃক্ততা এসএম প্রেরণা (ওয়েভ১)	.২৪ (.০৩)***	.১৪ (.০৫)**	-
অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা (ওয়েভ১)X সম্পৃক্ততা এসএম প্রেরণা (ওয়েভ১)	-	.০৭ (.০২)**	-
সম্পর্ক রক্ষা এসএম প্রেরণা (ওয়েভ১)	-.০৮ (.০৩)**	-.০৮(.০৩)**	-.০১ (.০২)
আত্মপ্রচার এসএম প্রেরণা (ওয়েভ১)	-.০৩ (.০৩)	-.০৩ (.০৩)	.০২ (.০২)
অফলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (ওয়েভ১)	-.০৪ (.০৭)	-.০৬ (.০৭)	.৬৯ (.০৪)***
অনলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (ওয়েভ১)	.১৮ (.০৭)**	.১৭ (০৭)**	.০৩ (.০৪)
এসএম ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ারিং (ওয়েভ১)	.১৮ (.০৩)***	.১৮ (.০৩)***	-.০০২ (.০২)
এসএম রাজনৈতিক তথ্য গ্রহণ (ওয়েভ১)	.২৫ (.০৩)***	.২৫ (.০৩)***	-.০১ (.০২)
বয়স (ওয়েভ১)	.০০১ (.০০২)	.০০১ (.০০২)	-.০০০৩ (.০০১)
লিঙ্গ (ওয়েভ১) (পুরুষ = ১, নারী = ২)	-.২৩ (.০৭)***	-.২৪ (.০৭)***	.০১ (.০৪)
শিক্ষা (ওয়েভ১)	-.০৪ (.০৪)	-.০৪ (.০৪)	.০৩ (.০২)
রাজনৈতিক আগ্রহ (ওয়েভ১)	.০২ (.০৩)	.০২ (.০৩)	.০১ (.০২)
রাজনৈতিক ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা (ওয়েভ১)	.০৫ (.০৩)#	.০৫ (.০৩)#	.০৪ (.০২)*
প্রথাগত গণমাধ্যম ব্যবহার (ওয়েভ১)	.০৭ (.০৪)#	.০৬ (.০৪)#	.০১ (.০২)
দলীয় শক্তি (ওয়েভ১)	.০০৪ (.০৪)	-.০০২ (.০৪)	-.০২ (.০৩)
ধ্রুব	-.১৪ (.২৮)	.৩০ (.৩২)	.১১ (.১৬)
অ্যাডজাস্টেড *R2*	.৬৫	.৬৬	.৬০
অবশিষ্ট এসই	.৭৯ (df=৫৭৮)=	.৭৮ (df=৫৭৭)	.৪৫ (df=৫৭৮)
F পরিসংখ্যান	-৭৪.৫৭*** (df=১৫; ৫৭৮)	৭১.৪০*** (df=১৬; ৫৭৭)	৫৯.২৮** (df=১৫; ৫৭৮)

এসএম = সোশ্যাল মিডিয়া; এসই = স্ট্যান্ডার্ড এরর।

আনস্ট্যান্ডার্ডাইজড কোফিশিয়েন্ট রিপোর্ট করা হয়েছে। এসই বন্ধনীর ভেতরে রয়েছে। $N = ৫৯৪$। যেই মডেলে এসএম রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং (ওয়েভ১) প্রেডিক্ট করা হয়েছে, সেখানে অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার জন্য $\triangle R2 = .০৩৪$, অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা x সম্পৃক্ততা এসএম প্রেরণার জন্য $\triangle R2 = .০০৫$ (সব *p*s <.০৫)। যেই মডেলে অফলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (ওয়েভ২) প্রেডিক্ট করা হয়েছে, সেখানে এসএম রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের (ওয়েভ১) জন্য $\triangle R2 = .০০২$ (প্রান্তিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, $p < .১$)।

#$p < .1$; *$p < 0.05$; **$p < 0.01$; ***$p < 0.001$ (two-tailed).

চিত্র ২ : সম্পৃক্ততা প্রেরণার কার্য হিসেবে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের (এসএমপিআইএস) ওপর অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার (ওসিসিডি) শর্তাধীন প্রভাব।

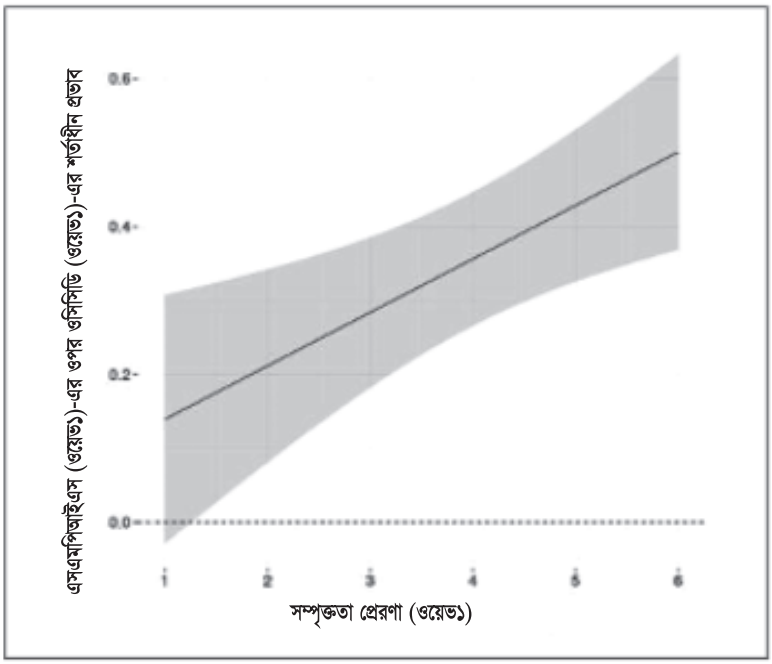

টীকা : পূর্ণ রেখার মাধ্যমে শর্তাধীন প্রভাবের পয়েন্ট মাপা হয়েছে। ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভাল বোঝাতে ভরাট অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। জনসন-নেইমেন পদ্ধতি ব্যবহার করে নকশা তৈরি করা হয়েছে। যেখানে কনফিডেন্স ইন্টারভাল শূন্য অতিক্রম করে না, সেখানে প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ।

করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তাদের রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করার সম্ভাবনা কম।

আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রেডিক্টর নয়। এর ফলে বোঝা যায় যে যারা নিজেদের প্রচারের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তাদের শেয়ার করার আচরণের ওপর এর কোনো সরাসরি প্রভাব নেই।

এরপর আমরা দেখেছি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের তিনটি প্রেরণা (সংযুক্ততা, সম্পর্ক রক্ষা ও আত্মপ্রচার) অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে কি না (হাইপোথেসিস ২ এবং গবেষণা প্রশ্ন ১)। যে মডেলে সম্পৃক্ততা প্রেরণাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পরীক্ষা করা হয়েছে, সেখানে আমরা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও

ইতিবাচক আন্তক্রিয়া দেখতে পাই, {*বি*=.০৭ (.০২), *পি*<.০১}। এখানে দেখা যায় যে অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী হয়ে থাকে। কারণ ব্যবহারকারীরা রাজনীতি ও সামাজিক বিষয়ে সংযুক্ত হতে ক্রমাগত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয় (টেবিল ১, দ্বিতীয় কলাম)। জনসন-নেইমেন টেকনিক ব্যবহার করে চিত্র ২-এ এই আন্তক্রিয়াশীল প্রভাব দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যায় যে প্রভাব রৈখিকভাবে বাড়তে থাকে। ৯৫ শতাংশ কনফিডেন্স ইন্টারভালে সংযুক্ততা প্রেরণার সর্বনিম্ন পর্যায়েই শুধু শূন্য অতিক্রম করছে। এখানে আমাদের দ্বিতীয় হাইপোথেসিসের সমর্থন পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে যারা সামাজিক বিষয় ও রাজনীতিতে যুক্ত হতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের প্রতি বেশি অনুপ্রাণিত হয়, তাদের জন্য অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের সম্পর্ক বেশি শক্তিশালী।

যখন সম্পর্ক রক্ষার প্রেরণাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়, তখনো আমরা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও ইতিবাচক আন্তক্রিয়া দেখতে পাই, {*বি*=.০৯ (.০৩), *পি*<.০১ (টেবিল ২, দ্বিতীয় কলাম)}। এখানে বলা প্রয়োজন, যদিও সম্পর্ক রক্ষার প্রেরণা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক নেতিবাচক, কিন্তু তাদের আন্তক্রিয়া আবার ইতিবাচক। অন্যভাবে বলতে গেলে, যারা সম্পর্ক তৈরি ও রক্ষা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তারা সাধারণত রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করে না। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং এবং অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী হয়। কারণ ব্যবহারকারীরা ক্রমাগত তাদের সম্পর্ক রক্ষা করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়। চিত্র ২-এ জনসন-নেইমেন টেকনিক ব্যবহার করে আন্তক্রিয়াশীল প্রভাব অঙ্কন করা হয়েছে। এখানে দেখা যায় ৯৫ শতাংশ কনফিডেন্স ইন্টারভালসমেত প্রভাব রৈখিকভাবে বাড়তে থাকে। এখানে শূন্য অতিক্রম করছে সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণার মানের ক্ষেত্রে। তবে সেটা মোটামুটি ৬ পয়েন্ট স্কেলের মাঝবিন্দুতে। সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণার মধ্যস্থতাকারী প্রভাব আবার সম্পৃক্ততা প্রেরণার মতোই। কিন্তু দেখে মনে হয় স্কেলের মধ্যবিন্দুর ওপরের মানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আত্মপ্রচার প্রেরণার কোনো মধ্যস্থতাকারী প্রভাব পাওয়া যায়নি, {*বি*=.০২ (.০২), *পি*=এন.এস}। এখান থেকে দেখা যায় যে নিজের প্রচারের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতে যারা উদ্বুদ্ধ হয়, তাদের এই ব্যবহারের ফলে অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ারিংয়ের মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলে না। এর ফলে আমাদের প্রথম গবেষণা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। যদি অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা ও আত্মপ্রচার

প্রেরণার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো আন্তযোগাযোগ না ঘটে, তাহলে আমাদের যেই মডেলে আত্মপ্রচার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে আমাদের ফলাফলের অবশিষ্টাংশ সেই মডেলের আওতায় পড়ে না।

এরপর আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ারিং (ওয়েভ১) অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (ওয়েভ২) সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পৃক্ত কি না (হাইপোথেসিস ৩)।[৪] সম্পৃক্ততা প্রেরণাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যেই মডেলে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং (ওয়েভ১) অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি ইতিবাচক পূর্বসূরি, {*বি*=.০৪ (.০২), *পি*<.১}। সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণাকে যেই মডেলে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানেও এটা ইতিবাচক পূর্বসূরি, {*বি*=.০৫ (.০২), *পি*<.০৫ (যদিও সম্পৃক্ততা প্রেরণাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যেই মডেলে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে প্রভাব খুবই নগণ্য।)}। এর ফলে আমাদের তৃতীয় হাইপোথেসিসের ক্ষেত্রে মিশ্র প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্যাদি শেয়ারিংয়ের ফলে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সাধারণত বাড়ে (তৃতীয় কলামে, টেবিল ১ ও ২ দেখুন)।[৫] অফলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (ওয়েভ১) ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক চলক ব্যবহার করার পরও এই সম্পর্ক স্থায়ী অবস্থায় থাকে। এর ফলে দেখা যায়, সব মডেলনির্বিশেষে এটা স্বাভাবিকভাবেই একটি শক্তিশালী পূর্বসূরি, {*বিএস*=.৬৯-.৭৯ (.০২-.০৪), *পিএস*<.০১}।

সবশেষে আমরা দুটি মধ্যস্থতাকারী ব্যবহার করে দুটি নিয়ন্ত্রিত মধ্যস্থতা মডেল পরীক্ষা করেছি। এগুলো হলো সম্পৃক্ততা প্রেরণা ও সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণা। দেখা গেছে, এ দুটি অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মধ্যে সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়, অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা (ওয়েভ১) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের (ওয়েভ১) মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে কি না। এটাও দেখা হয়েছে যে প্রত্যেক মধ্যস্থতাকারীর পর্যায় অনুযায়ী এই মধ্যস্থতাকারী প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হয় কি না (হাইপোথেসিস ৪ এবং গবেষণা প্রশ্ন ২)। প্রথম মডেলে সম্পৃক্ততা প্রেরণাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ধরে আনস্ট্যান্ডার্ডাইজড পরোক্ষ প্রভাব হিসাব করা হয়েছে। এখানে ১০ হাজার বুট-স্ট্র্যাপিং স্যাম্পল এবং বাইয়াস-কারেক্টেড ৯৫ শতাংশ কনফিডেন্স ইন্টারভাল ব্যবহার করা হয়েছে (টেবিল ৩)। আমরা সম্পৃক্ততা প্রেরণার সব পর্যায়েই পরোক্ষ প্রভাব পেয়েছি। যারা সামাজিক বিষয় ও রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয়, তাদের জন্য সামাজিক

টেবিল ২ : সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণাকে মেডিয়েটর হিসেবে ব্যবহার করে মডারেটেড মেডিয়েশনের জন্য রিগ্রেশন বিশ্লেষণের সংক্ষেপসার

	সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য শেয়ারিং (ওয়েভ১) (মেডিয়েটর)		অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (ওয়েভ২) (ক্রাইটেরিয়ন)
	বি (এসই)	বি (এসই)	বি (এসই)
এসএম রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং (ওয়েভ১)	-	-	.০৫ (.০২)*
অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা (ওয়েভ১)	.৩৫ (.০৫)***	-.১৪ (.১৯)	.০১ (.০৩)
সম্পর্ক রক্ষা এসএম প্রেরণা (ওয়েভ১)	.০৮ (.০৩)**	.২০ (.০৫)***	-
অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা (ওয়েভ১)^{X} সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণা (ওয়েভ১)	-	.০৯ (.০৩)**	-
সম্পৃক্ততা এসএম প্রেরণা (ওয়েভ১)	-.২৪ (.০৩)**	-.২৩(.০৩)***	-.০১ (.০২)
আত্মপ্রচার এসএম প্রেরণা (ওয়েভ১)	-.০৩ (.০৩)	-. (.০৩)	.০৩ (.০২)
অফলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (ওয়েভ১)	-.০৪ (.০৭)	-.০২ (.০৭)	.৬৯ (.০৪)***
অনলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (ওয়েভ১)	.১৮ (.০৭)*	.১৯ (০৭)**	.০৩ (.০৪)
এসএম ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ারিং (ওয়েভ১)	.১৮ (.০৩)**	.১৮ (.০৩)***	-.০০২ (.০২)
এসএম রাজনৈতিক তথ্য গ্রহণ (ওয়েভ১)	.২৫ (.০৩)**	.২৫ (.০৩)***	-.০১ (.০২)
বয়স (ওয়েভ১)	.০০১ (.০০২)	.০০৩ (.০০২)	-.০০০৩ (.০০১)
লিঙ্গ (ওয়েভ১) (পুরুষ = ১, নারী = ২)	-.২৩ (.০৭)**	-.২৪ (.০৭)***	.০১ (.০৪)
শিক্ষা (ওয়েভ১)	-.০৪ (.০৪)	-.০৩ (.০৪)	.০৩ (.০২)
রাজনৈতিক আগ্রহ (ওয়েভ১)	.০২ (.০৩)	.০২ (.০৩)	.০১ (.০২)
রাজনৈতিক ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা (ওয়েভ১)	.০৫ (.০৩)#	.০৫ (.০৩)#	.০৪ (.০২)*
প্রথাগত গণমাধ্যম ব্যবহার (ওয়েভ১)	.০৭ (.০৪)#	.০৭ (.০৪)#	.০১ (.০২)
দলীয় শক্তি (ওয়েভ১)	.০০৪ (.০৪)	-.০০৪ (.০৪)	-.০২ (.০৩)
ধ্রুব	-.১৪ (.২৮)	.৩০ (.৩২)	.০৯ (.০৩)
অ্যাডজাস্টেড $R2$	.৬৫	.৬৬	.৬০
অবশিষ্ট এসই	.৭৯ (df=৫৭৮)	.৭৮ (df=৫৭৭)	.৪৫ (df=৫৭৮)
F পরিসংখ্যান -	৭৪.৫৭*** (df=১৫; ৫৭৮)	৭১.২০*** (df=১৬; ৫৭৭)	৫৯.৩৫** (df=১৫; ৫৭৮)

এসএম = সোশ্যাল মিডিয়া; এসই = স্ট্যান্ডার্ড এরর।

আনস্ট্যান্ডার্ডাইজড কোফিশিয়েন্ট রিপোর্ট করা হয়েছে। এসই বন্ধনীর ভেতরে রয়েছে। N =৫৯৪। যেই মডেলে এসএম রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং (ওয়েভ১) প্রেডিক্ট করা হয়েছে, সেখানে অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার জন্য $\triangle R2$ = .০৩৪, অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা x সম্পর্ক রক্ষা এসএম প্রেরণার জন্য $\triangle R2$ = .০০৪ (সব ps <.০৫)। যেই মডেলে অফলাইন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (ওয়েভ২) প্রেডিক্ট করা হয়েছে, সেখানে এসএম রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের (ওয়েভ১) জন্য $\triangle R2$ = .০০৩ (সব ps <.০৫)। #p < .1; *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 (two-tailed).

যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার পরোক্ষ প্রভাব বেশি।

দ্বিতীয় যেই মডেলে সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ধরে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে, সেখানে সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণার সব পর্যায়েই আনস্ট্যান্ডার্ডাইজড পরোক্ষ প্রভাবের পরীক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। সম্পৃক্ততা প্রেরণার প্রথম

মডেলের মতো এই মডেলেও যারা সম্পর্ক রক্ষা করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তাদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার পরোক্ষ প্রভাব বেশি। এই ফলাফলের ফলে আমরা দ্বিতীয় গবেষণা প্রশ্নের উত্তর পাই। এখানে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা

টেবিল ৩ : সম্পৃক্ততা এসএম প্রেরণার ভ্যালুতে এসএম রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের (এসএমপিআইএস) মাধ্যমে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার (ওসিসিডি) শর্তাধীন পরোক্ষ প্রভাব

সম্পৃক্ততা এসএম প্রেরণা	পয়েন্ট পরিমাপ	৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভাল
১.২৭ (-১ এসডি)	.০০৭ (.০০৬)	.০০০ থেকে .০২৪
২.৭১ (মিন)	.০১১ (.০০৭)	.০০১ থেকে .০২৮
৪.১৫ (+ ১ এসডি)	.০১৬ (.০০৯)	.০০১ থেকে .০৩৫

এসএম : সোশ্যাল মিডিয়া
পাথ এস্টিমেটগুলো আনস্ট্যান্ডার্ডাইজড কোফিশিয়েন্ট। পরোক্ষ প্রভাব মাপা হয়েছে ১০,০০০ বুটস্ট্র্যাপিং স্যাম্পলের ওপর ভিত্তি করে, যা ৯৫% পক্ষপাত সংশোধনী বা বাইয়াস-কারেক্টেড কনফিডেন্স ইন্টারভাল।
সব নিয়ন্ত্রক চলক মডেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। N= ৫৯৪

চিত্র ৩ : সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণার কার্য হিসেবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের (এসএমপিআইএস) ওপর অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার (ওসিসিডি) শর্তাধীন প্রভাব।

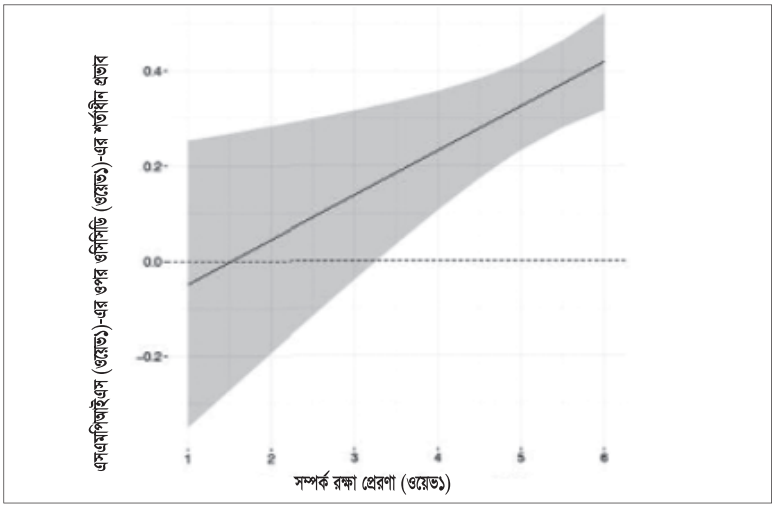

টীকা : পূর্ণ রেখার মাধ্যমে শর্তাধীন প্রভাবের পয়েন্ট মাপা হয়েছে। ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভাল বোঝাতে ভরাট অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। জনসন-নেইমেন পদ্ধতি ব্যবহার করে নকশা তৈরি করা হয়েছে। যেখানে কনফিডেন্স ইন্টারভাল শূন্য অতিক্রম করে না, সেখানে প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ।

টেবিল ৪: সম্পর্ক রক্ষা এসএম প্রেরণার ভ্যালুতে এসএম রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের (এসএমপিআইএস) মাধ্যমে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার (ওসিসিডি) শর্তাধীন পরোক্ষ প্রভাব

সম্পর্ক রক্ষা এসএম প্রেরণা	পয়েন্ট পরিমাপ	৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভা
৩.৬৭ (-১ এসডি)	.০০৯ (.০০৬)	.০০১ থেকে .০২৭
৪.৯৩ (মিন)	.০১৬ (.০০৮)	.০০১ থেকে .০৩৪
৬.০০ (+ ১ এসডি)	.০২০ (.০১১)	.০০২ থেকে .০৪৫

এসডি = স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন; এসএম = সোশ্যাল মিডিয়া

পাথ এস্টিমেটগুলো আনস্ট্যান্ডার্ডাইজড কোফিশিয়েন্ট। পরোক্ষ প্রভাব মাপা হয়েছে ১০,০০০ বুটস্ট্র্যাপিং স্যাম্পলের ওপর ভিত্তি করে, যা ৯৫% পক্ষপাত সংশোধনী বা বাইয়াস-কারেক্টেড কনফিডেন্স ইন্টারভাল। সব নিয়ন্ত্রক চলক মডেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। N = ৫৯৪

অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সম্পৃক্ততা ও সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণা—দুটিই এই প্রভাবকে মধ্যস্থতা করে, কিন্তু আত্মপ্রচারকে মধ্যস্থতা করে না।

আলোচনা

অনলাইন রাজনৈতিক আলোচনার ভুবন ক্রমশই বিতর্কিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অভিনব সম্পর্ক অফলাইনে বা বাস্তব জীবনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রচলিত ধারার একটি পরোক্ষ পদ্ধতি আমাদের সামনে হাজির করেছে। এই সম্ভাবনাটিই এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের ফল প্রস্তাবিত তাত্ত্বিক মডেলকে সমর্থন করে। এখানে দেখা গেছে যে পরোক্ষভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে বেশি মাত্রায় অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার ফলে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। এর বাইরেও আমরা দেখেছি যে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা প্রেরণা ও সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করায় অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী হয়।

ক্রস-কাটিং আলোচনার ফল-সম্পর্কিত মিশ্র ফল প্রতিফলিত করে আমরা অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্যে সরাসরি কোনো সংযোগ খুঁজে পাইনি (গেয়ারহার্ট ও ঝ্যাং, ২০১৫; হ্যাম্পটন ও অন্যান্য, ২০১৪)। এর বদলে দেখা যায়, অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনার সঙ্গে বেশি মাত্রায় রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং-সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক থেকে দেখা যায় যে শেয়ারিং একধরনের আচরণ, যা রাজনৈতিক মতানৈক্য থেকে তৈরি হওয়া হুমকির সঙ্গে ব্যক্তিকে মানিয়ে নিতে অভিনবভাবে সাহায্য করে। শেয়ারিংয়ের প্রক্রিয়ায় যখন ব্যবহারকারী রাজনৈতিক বিষয়বস্তু বাছাই করে এবং তা গ্রহণ করে,

তখন তাদের সামনে একটি সুযোগ তৈরি হয়। আর তা হলো তাদের পছন্দের তথ্যের প্রতি নিজেদের উন্মুক্ত করা এবং রাজনৈতিকভাবে সমমনা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা।

এই গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো, অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনা এবং রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রভাবিত হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে ব্যক্তির প্রেরণার মাধ্যমে। স্বাভাবিকভাবেই যেসব ব্যবহারকারী রাজনৈতিক হাঙ্গামায় জড়াতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতে আসে, তারা যখনই রাজনৈতিক ভিন্নমতের মুখোমুখি হয়, তখন বেশি বেশি রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করা শুরু করে। যাদের সম্পৃক্ততা প্রেরণা বেশি, তাদের আমরা 'রাজনৈতিক নেশাখোর' বলে আখ্যায়িত করি। তাদের জন্য রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের মূল কারণ। একইভাবে 'রাজনৈতিক নেশাখোরেরা' রাজনৈতিক আলোচনায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে। একবার যুক্ত হয়ে গেলে তাদের রাজনৈতিক ভিন্নমতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই ফলাফলের সঙ্গে আগের গবেষণার মিল রয়েছে। এখানে দেখা যায়, বেশি মাত্রায় রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে বেশি মাত্রায় অসংগতির অভিজ্ঞতা পায়। তাদের নিজেদের মতামত পুনর্নিশ্চিত করে যেসব আচরণ, সেগুলোয় যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তাদের বেশি (দেখুন ট্যাবার ও লজ, ২০০৬)।

তবে আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, রাজনৈতিক ভিন্নমত ও শেয়ারিংয়ের মধ্যে সম্পর্কের ওপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের অন্যান্য প্রেরণারও প্রভাব রয়েছে। যারা সম্পর্ক রক্ষায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হয়নি। রাজনৈতিক ভিন্নমত থাকায় তাদের জন্য রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গির অপ্রত্যাশিত পথ তৈরি হয়েছে। এটা হতে পারে এ কারণে যে যারা সম্পর্ক রক্ষা করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতে চায়, তারা তাদের নেটওয়ার্কের অন্যদের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ হয়, যেন সংযোগটা অব্যাহত থাকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অন্যান্য গবেষণায় সামাজিক পুঁজি তৈরিতে সম্পর্ক রক্ষার ভূমিকা হাইলাইট করেছে (টং ও ওয়ালথার, ২০১১) এবং ফলাফলে দেখা যায় ব্যবহারকারীরা প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই ব্যবস্থার সুবিধা নিয়ে সামাজিক সমর্থনের সংকেত দিয়ে থাকে (এলিসন ও অন্যান্য, ২০১৪)। আমাদের ধারণা, যেসব ব্যবহারকারীর এ ধরনের বাহ্যিক সামাজিক ঝোঁক আছে, তারা ভিন্ন রাজনৈতিক মতামত শুনতে বেশি আগ্রহী হতে পারে এবং আলোচনায় অবদান রাখতে পারে। সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে যাদের বেশি

মাত্রায় সংবেদনশীলতা আছে, তারাও বেশি মাত্রায় অসংগতির মুখোমুখি হতে পারে। এটা হতে পারে যখন সম্পর্কগত দ্বন্দ্বের সম্ভাবনার ব্যাপারে উদ্বেগ থেকে রাজনৈতিক ভিন্নমত তৈরি হয়। সাধারণত, যারা সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ, তাদের রাজনৈতিক তথ্য শেয়ার করার সম্ভাবনা কম। তবে রাজনৈতিক ভিন্নতা মেটানোর ক্ষেত্রে এটা একটা উপকারী পদ্ধতি হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ারিং শুধু রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গির জন্য একটি বড় শিঙা হিসেবেই কাজ করে না, বরং সামাজিক সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার পদ্ধতিও বটে (গিল দো জুনিগা ও অন্যান্য, ২০১৪; লি ও মা, ২০১২)। এই ফলাফল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের উপাত্তে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার চেয়ে সম্পর্ক রক্ষার উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার বেশি স্বাভাবিক মনে হয়েছে।

আমাদের মডেলে আত্মপ্রচার প্রেরণার কোনো মধ্যস্থতাকারী প্রভাব ছিল না। এ থেকে বোঝা যায় যে একধরনের ব্যবহারকারী আছে, যাদের জন্য রাজনৈতিক ভিন্নমত মেটাতে তথ্য শেয়ারিং বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল নয়। নার্সিসিজম বৃদ্ধির ওপর যেসব গবেষণা আছে, সেখানে দেখা যায় যে যারা নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে আবিষ্ট তারা নাগরিক বিষয়ে খুব বেশি সম্পৃক্ত নয় (টুয়েঙ্গি, কেইথ ও ফ্রিম্যান, ২০১২)। আত্মপ্রচার প্রেরণার তেমন কোনো নেতিবাচক প্রভাব আমরা পাইনি। তবে এটা ঠিক যে যারা তাদের নিজেদের ভাবমূর্তি নিয়ে আচ্ছন্ন, তারা হয় রাজনৈতিক ভিন্নমত-সংক্রান্ত আলোচনায় কম যুক্ত হয় অথবা এ-সংক্রান্ত তথ্য শেয়ারিংকেও সুনামের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে (থরসন, ২০১৩)।

আমাদের ফলাফলে ডব্লিউ১ বা ওয়েভ১-এর সঙ্গে ওয়েভ২-এর সংযোগ পাওয়া যায়। ওয়েভ১ হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং। ওয়েভ২ হলো অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ। এখানে ওয়েভ১-এর ক্ষেত্রে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পর্যায়গুলোর জন্য নিয়ন্ত্রক চলক ছিল। এর ফলে অনলাইনে রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গি এবং অফলাইনে রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্যকার সম্পর্কের পূর্ববর্তী প্রমাণ সম্পর্কে আরও বেশি কার্যকারণ সমর্থন পাওয়া যায় (গিল দো জুনিগা ও অন্যান্য, ২০১৪)। আমাদের স্যাম্পলে যাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ে যুক্ত হয়, তারা রাজনৈতিক বিতর্কে বেশি যুক্ত হয়, অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিজেদের আরও ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করে এবং এগুলো করার ক্ষেত্রে আরও বেশি সুযোগ পেয়ে থাকে (শাহ ও অন্যান্য, ২০১২; ভ্যাকারি ও অন্যান্য, ২০১৫)।

সবশেষে, আমাদের তাত্ত্বিক মডেলের একগুচ্ছ পরীক্ষায় দেখা যায় যে

রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর অনলাইনে ক্রস-কাটিং আলোচনার একটি পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। এই মধ্যস্থিত প্রভাব আমাদের তাত্ত্বিক উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে পাওয়া যায়, কীভাবে অনলাইনের ভিন্নমত অফলাইনের পদক্ষেপে পরিণত হয় এবং কীভাবে অনলাইন সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রতি ব্যবহারকারীদের ঝোঁক তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সুযোগ ব্যবহারের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা প্রেরণা এবং সম্পর্ক রক্ষা প্রেরণার মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা থেকে দেখা যায় যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের ব্যবহার ও পরিতৃপ্তি অনলাইনের রাজনৈতিক কার্যক্রমকে অফলাইনে রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (লি ও মা, ২০১২)। যেসব গবেষণায় বলা হয়েছে যে ক্রস-কাটিং আলোচনার ফলে অংশগ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেগুলোর বিপরীতে আমাদের গবেষণায় দেখা যায় যে ভিন্নমত পোষণের একটি সামাজিক হওয়ার ঝোঁক আছে। ভিন্নমতের মুখোমুখি হলে রাজনৈতিক পদক্ষেপ ত্বরান্বিত করতে পারে।

আমাদের পাওয়া পরিমিত প্রভাব থেকে দেখা যায় যে আমাদের মডেলে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (ওয়েভ২) ছোট একটি ব্যতিক্রম ধরা পড়েছে। অন্যান্য উচ্চমানের রাজনৈতিক আচরণের শক্তিশালী নির্ধারক বিবেচনায় এটা প্রত্যাশিতও। জনসংখ্যা পর্যায়ে আমাদের প্রাপ্ত প্রভাবের আরও বেশি সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। যেসব প্যানেল উপাত্ত আমরা বিশ্লেষণ করেছি, তা আমাদের কার্যকারণ দাবির পেছনে বাড়তি শক্তি জুগিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিবর্তন পরীক্ষা করার মাধ্যমে এটা আমরা করতে পেরেছি। এখানে বিভিন্ন ধরনের চলক আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি। এর মধ্যে রয়েছে বিগত দিনের রাজনৈতিক আচরণ এবং গণমাধ্যম ব্যবহার। আমাদের গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। প্রথমত, উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে তার অনলাইন আচরণ বিবেচনা করেছি। যেকোনো জরিপের ক্ষেত্রেই উত্তরদাতার নিজের বলা তথ্য পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রেরণার ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। কারণ এখানে উত্তরদাতাকে জিজ্ঞেস করা হয়, সে 'নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যে' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেছে কি না। আমাদের যুক্তি হলো, নির্দিষ্ট প্রেরণা মূল্যায়নের জন্য এ বিষয়গুলো যুক্তিসংগত। কিন্তু এগুলোর সীমাবদ্ধতা হলো, এখানে উত্তরদাতাদের সরাসরি তাদের প্রেরণা কী, তার প্রতিফলন বা প্রতিবেদন দিতে বলা হয় না। তবে আত্মমূল্যায়ন পদক্ষেপের পুরো প্রক্রিয়ায় এমন কোনো পক্ষপাতদুষ্ট উত্তর নেই, যা আমাদের তাত্ত্বিক মডেলকে প্রভাবিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের পদক্ষেপে আমরা ফরম্যাট, কনটেন্ট বা

নির্দিষ্ট শ্রোতাকে ধারণ করিনি। যেহেতু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিংয়ের বিস্তৃত কারণ রয়েছে (হ্যাসেল ও উইকস, ২০১৬; লি ও মা, ২০১২), তাই ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য আমাদের অন্যতম নির্দেশনা হলো শেয়ারিং প্রক্রিয়ার আরও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান যেন করা হয়। সবশেষে, এটা হতে পারে যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক ভিন্নমত ও প্রকাশভঙ্গি একসঙ্গেই ঘটতে পারে এবং একে ওপরকে পরিবর্তনশীলভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই মডেলে আমরা অনলাইন ক্রস-কাটিং আলোচনাকে একটি স্বাধীন চলক হিসেবে ধরে নিয়েছি। তবে ভবিষ্যৎ গবেষণায় এই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা দরকার যে রাজনৈতিক আলোচনা ও প্রকাশভঙ্গি একে ওপরকে শক্তিশালী করে এবং ধীরে ধীরে আচরণ গঠনে সাহায্য করে।

বর্তমানে রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রেকর্ড পরিমাণ দলীয় বিভক্তি (পিউ রিসার্চ সেন্টার, ২০১৬) এবং রাজনৈতিক ডিসকোর্সের নেতিবাচক প্রকৃতি সম্পর্কে ভীতি (দেখুন কার, ২০১৬)। একটি বিভক্ত ও অচল পাবলিক স্ফেয়ার বা জনপরিসর তৈরিতে ইন্টারনেটের ভূমিকা নিয়ে তাই উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে আমরা অনন্য এক সামাজিক প্রেক্ষাপট ও আদান-প্রদান ব্যবস্থা পেয়েছি। এর ফলে আমরা আশা করতে পারি যে অনলাইনে রাজনৈতিক ভিন্নমত বস্তুত ফলদায়ক হতে পারে। আমাদের ফলাফল বিশেষভাবে উৎসাহব্যঞ্জক এ কারণে যে যারা সম্পর্ক রক্ষার্থেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে থাকে, তাদেরও রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গি এবং অফলাইনে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ কাজের ক্ষেত্রে এসব পরোক্ষ পদ্ধতি উদ্‌ঘাটন করা দরকার এবং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দুই ধরনের প্রেরণাই বিবেচনা করা দরকার। এর ফলে কীভাবে অনলাইনে রাজনৈতিক ভিন্নমত অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে সহায়তা করে, তা আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করা যাবে।

টীকা

১. আমরা উত্তরদাতাদের সরাসরি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের প্রেরণা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। কারণ এর ফলে এটি একটি অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিমূর্ত এবং ধারণাগতভাবে চাহিদাসম্পন্ন অনুশীলনে পরিণত হতে পারত। প্রেরণা মূল্যায়নের জন্য আমাদের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে বেশ কয়েকজন পূর্ববর্তী গবেষকের কাছ থেকে (যেমন, ক্যাম্পবেল ও কোয়াক, ২০১০; গিল দো জুনিগা, জুং, এবং ভ্যালেনজুয়েলা, ২০১২)।

২. গতানুগতিক যে PROCESS ম্যাক্রো আমরা পরোক্ষ প্রভাব গণনার জন্য বুটস্ট্র্যাপিং ব্যবহার করে করেছি, তা স্ট্যান্ডার্ডাইজড রিগ্রেশন কোএফিশিয়েন্ট তৈরি করতে পারেনি (হায়েস, ২০১৩)। যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজড চলক আমরা PROCESS-এ ব্যবহার করি, তাহলে বুটস্ট্র্যাপ কনফিডেন্স ইন্টারভাল তৎক্ষণাৎ ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই ইন্টারভালের ওপর আমরা পরিসংখ্যানগত তাৎপর্যের জন্য নির্ভর করি। বিভিন্ন প্রেডিক্টরের প্রভাব আয়তন সরাসরি তুলনা করার ক্ষেত্রে আমরা সব মূল চলকের জন্য ডার্লিংটন ও হায়েসের (২০১৬) স্কয়ার্ড সেমিপার্শিয়াল কোরিলেশন (আর২ পরিবর্তিত) কোএফিশিয়েন্ট বিবরণী দেওয়ার পরামর্শ অনুসরণ করেছি।

৩. সব মডেলেই আমরা নন-ইন্টারঅ্যাকটিভ টার্মের জন্য ভেরিয়েন্স ইনফ্লেশন ফ্যাক্টর গণনা করেছি। এখানে মাল্টিকলিনেয়ারিটি অনুপস্থিত থাকার অনুমান নিশ্চিত করা হয়েছে (টাবাচনিক ও ফিদেল, ২০১২)।

৪. PROCESS ম্যাক্রোর ৭ নম্বর মডেলে, শুধু প্রথম রিগ্রেশন অ্যানালাইসিসে মডারেটর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে বাস্তব জীবনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অনুমান করা হয়েছে। এর ফলে টেবিল ১ ও ২-এর শেষ কলামের মডেলগুলো মডারেটর হিসেবে মনোনীত প্রেরণা চলককে অন্তর্ভুক্ত করে না। PROCESS মডেলের এই সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে আমরা আরও একটি রিগ্রেশন পরীক্ষা করেছি, যেখানে বাস্তব জীবনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অনুমান করা হয়েছে এবং তিনটি প্রেরণা চলকই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা যা এখানে বলেছি, তা থেকে এর ফল ভিন্ন হয়নি।

৫. যেখানে সম্পৃক্ততা প্রেরণাকে মডারেটর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেই বিশ্লেষণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক তথ্য শেয়ারিং ও অফলাইনে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্যে সম্পর্ক খুবই কম তাৎপর্যপূর্ণ। সে জন্য হায়েস (২০১৩) বলেছেন যে মেডিয়েশন মডেলে সিগনিফিক্যান্স পরীক্ষা করা বুটস্ট্র্যাপিং ও বায়াস-কারেক্টেড কনফিডেন্স ইন্টারভাল দিয়ে পরোক্ষ প্রভাব পরিমাপের চেয়ে কম প্রাসঙ্গিক।

তথ্যপঞ্জি

—An, J., Quercia, D., Cha, M., Gummadi, K., & Crowcroft, J. (2014). Sharing political news: the balancing act of intimacy and socialization in selective exposure. *EPJ Data Science*, *3*, 1–21. doi:10.1140/epjds/s13688-014-0012-2

—Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, *348*, 1130–1132. doi:10.1126/science.aaa1160

—Boulianne, S. (2009). Does internet use affect engagement? A metaanalysis of research. *Political Communication*, *26*, 193–211. doi:10.1080/10584600902854363

—Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A metaanalysis of current research. *Information, Communication, &*

Society, *18*, 524-538. doi:10.1080/1369118x.2015.1008542

—Boyd, d., Golder, S., & Lotan, G. (2010, January 5–8). *Tweet, tweet, retweet: Conversational aspects of retweeting on Twitter*. 2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, Honolulu, HI. doi:10.1109/HICSS.2010.412

—Brundidge, J. (2010). Encountering "Difference" in the contemporary public sphere: The contribution of the internet to the heterogeneity of political discussion networks. *Journal of Communication*, *60*(4), 680–700. doi:10.1111/j.1460-2466.2010.01509.x

—Campbell, S. W., & Kwak, N. (2010). Mobile communication and civic life: Linking patterns of use to civic and political engagement. *Journal of Communication*, *60*, 536–555. doi:10.1111/ j.1460-2466.2010.01496.x

—Caprara, G. V., Vecchione, M., Capanna, C., & Mebane, M. (2009). Perceived political self-efficacy: Theory, assessment, and applications. *European Journal of Social Psychology*, *39*, 1002–1020. doi: 10.1002/ejsp.604

—Carr, N. (2015, September 2). *How social media is ruining politics*. Retrieved from http://politi.co/1JLtKs8

—Chadwick, A. (2009). Web 2.0: New challenges for the study of e-democracy in an era of informational exuberance. *I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society*, *5*, 9–41.

—Chambers, S. (2003). Deliberative democratic theory. *Annual Review of Political Science*, *6*(1), 307–326. doi:10.1146/annurev.polisci.6.121901.085538

—Cho, J., Ahmed, S., Keum, H., Choi, Y. J., & Lee, J. H. (2016). Influencing myself: Self-reinforcement through online political expression. *Communication Research*, 93650216644020. doi:10.1177/0093650216644020

—Coe, K., Kenski, K., & Rains, S. A. (2014). Online and uncivil? Patterns and determinants of incivility in newspaper website comments. *Journal of Communication*, *64*, 658–679. doi:10.1111/jcom.12104

—Darlington, R. B., & Hayes, A. F. (2016). *Regression analysis and linear models: Concepts, applications, and implementation*. New York, NY: Guilford.

—Donsbach, W., & Mothes, C. (2013). The dissonant self: Contributions from dissonance theory to a new agenda for studying political communication. *Annals of the International Communication Association*, *36*, 3–44. doi:10.1080/23808985. 2013.11679124

—Ellison, N. B., Heino, R., & Gibbs, J. (2006). Managing impressions online: Self-presentation processes in the online dating environment. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *11*, 415–441. doi:10.1111/j.1083-6101.2006.00020.x

—Ellison, N. B., Vitak, J., Gray, R., & Lampe, C. (2014). Cultivating social resources on social network sites: Facebook relationship maintenance behaviors and their role in social capital processes. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *19*, 855–870. doi:10.1111/jcc4.12078

—Eveland, W. P., & Thomson, T. (2006). Is it talking, thinking, or both? A lagged dependent variable model of discussion effects on political knowledge. *Journal of Communication*, *563*, 523–542. doi:10.1111/j.1460 2466.2006.00299.x

—Festinger, L. (1962). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford, CA: Stanford University Press.

—Gearhart, S., & Zhang, W. (2015). "Was it something I said?" "No, it was something you posted!" A study of the spiral of silence theory in social media contexts. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, *18*, 208–213. doi:10.1089/cyber.2014.0443

—Gentile, B., Twenge, J. M., Freeman, E. C., & Campbell, W. K. (2012). The effect of social networking websites on positive self-views: An experimental investigation. *Computers in Human Behavior*, *28*, 1929–1933. doi:10.1016/j.

chb.2012.05.012

—Gil de Zuniga, H., Jung, N., & Valenzuela, S. (2012). Social media use for news and individuals' social capital, civic

engagement and political participation. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *17*, 319–336. doi:10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x

—Gil de Zuniga, H., Molyneux, L., & Zheng, P. (2014). Social media, political expression, and political participation: Panel analysis of lagged and concurrent relationships. *Journal of*

Communication, *64*, 612–634. doi:10.1111/jcom.12103

—Gladwell, M. (2010, October 4). Small change: Why the revolution will not be tweeted. *The New Yorker*, pp. 42–49.

—Gottfried, J., Barthel, M., Shearer, E., & Mitchell, A. (2016, February 4). The 2016 presidential campaign—A news event that's hard to miss. *Pew Research Center's Journalism Project*. Retrieved from http://www.journalism.org/2016/02/04/the-2016-presidential-campaign-a-news-event-thats-hard-to-miss/

—Green, D. P., Palmquist, B., & Schickler, E. (2004). *Partisan hearts and minds: Political parties and the social identities of voters*. New Haven, CT: Yale University Press.

—Greene, S. (1999). Understanding party identification: A social identity approach. *Political Psychology*, *20*, 393 403. doi:10.1111/0162-895X.00150

—Hampton, K. N., Rainie, L., Lu, W., Dwyer, M., Shin, I., & Purcell, K. (2014). *Social media and the "spiral of silence."* Washington, DC: Pew Research Center.

—Hasell, A., & Weeks, B. E. (2016). Partisan provocation: The role of partisan news use and emotional responses in political information sharing in social media. *Human Communication Research*, *42*, 641–661. doi:10.1111/hcre.12092

—Hayes, A. F. (2013). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. New York, NY: Guilford Press.

—Himelboim, I., McCreery, S., & Smith, M. (2013). Birds of a feather tweet together: Integrating network and content analysis to examine cross-ideology exposure on Twitter. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *18*, 40–60. doi:10.1111/jcc4.12001

—Kim, Y., Hsu, S.-H., & de Zuniga, H. G. (2013). Influence of social media use on discussion network heterogeneity and civic engagement: The moderating role of personality traits. *Journal of Communication*, *63*, 498–516. doi:10.1111/jcom.12034

—Knobloch-Westerwick, S., & Meng, J. (2011). Reinforcement of the political self through selective exposure to political messages. *Journal of Communication*, *61*, 349–368. doi:10.1111/j.1460-2466.2011.01543.x

—Kumpel, A. S., Karnowski, V., & Keyling, T. (2015). News sharing in social media: A review of current research on news sharing users, content, and networks. *Social Media + Society*, *1*(2), doi:10.1177/2056305115610141

—Kwak, N., Williams, A. E., Wang, X., & Lee, H. (2005). Talking politics and engaging politics: An examination of the interactive relationships between structural features of political talk and discussion engagement. *Communication Research*, *32*, 87–111. doi:10.1177/0093650204271400

—Lampinen, A. (2015). Deceptively simple: Unpacking the notion of "sharing." *Social Media + Society*, *1*(1), doi:10.1177/2056305115578135

—Lee, C. S., & Ma, L. (2012). News sharing in social media: The effect of gratifications and prior experience. *Computers in Human Behavior*, *28*, 331–339. doi:10.1016/j.chb.2011.10.002

—Marwick, A. E., & boyd, d. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. *New Media and Society*, *13*, 114–133. doi:10.1177/1461444810365313

—Miller, C. C. (2014, August 26). How social media silences debate. *The New York Times*. Retrieved from http://www.nytimes.com/ 2014/08/27/upshot/how-social-media-silences-debate.html

—Mutz, D. C. (2002a). The consequences of cross-cutting networks for political participation. *American Journal of Political Science*, *46*, 838–855. doi:10.2307/3088437

—Mutz, D. C. (2002b). Cross-cutting social networks: Testing democratic theory in practice. *American Political Science Review*, *96*, 111–126. doi:10.1017/S0003055402004264

—Mutz, D. C. (2006). *Hearing the other side: Deliberative versus participatory democracy*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

—Noelle-Neumann, E. (1991). The theory of public opinion: The concept of the spiral of silence. *Annals of the International Communication Association*, *14*, 256–287. doi:10.1080/23808985.1991.11678790

—Papacharissi, Z. (2010). *A networked self: Identity, community,*

and culture on social network sites. New York, NY: Routledge.

—Park, N., Kee, K. F., & Valenzuela, S. (2009). Being immersed in social networking environment: Facebook groups, uses and gratifications, and social outcomes. *Cyberpsychology & Behavior*, *12*, 729–733. doi:10.1089/cpb.2009.0003

—Pew Research Center. (2012). *Social networking sites and politics*. Retrieved from http://www.pewinternet.org/2012/03/12/social-networking-sites-and-politics/

—Pew Research Center. (2016). *Partisanship and Political Animosity in 2016*. Retrieved from http://www.peoplepress.org/2016/06/22/partisanship-and-political-animosityin-2016

—Pingree, R. J. (2007). How messages affect their senders: A more general model of message effects and implications for deliberation. *Communication Theory*, *17*, 439–461. doi:10.1111/j.1468-2885.2007.00306.x

—Price, V., Cappella, J. N., & Nir, L. (2002). Does disagreement contribute to more deliberative opinion? *Political Communication*, *19*, 95–112. doi:10.1080/105846002317246506

—Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York, NY: Simon & Schuster.

—Quan-Haase, A., & Young, A. L. (2010). Uses and gratifications of social media: A comparison of Facebook and Instant messaging. *Bulletin of Science, Technology & Society*, *30*, 350–361. doi:10.1177/0270467610380009

—Rojas, H., & Puig-i-Abril, E. (2009). Mobilizers mobilized: Information, expression, mobilization, and participation in the digital age. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *14*, 902–927. doi:10.1111/j.1083 6101.2009.01475.x

—Scheufele, D. A., Nisbet, M. C., Brossard, D., & Nisbet, E. C. (2004). Social structure and citizenship: Examining the impacts of social setting, network heterogeneity, and informational variables on political participation. *Political Communication*, *21*, 315–338. doi:10.1080/10584600490481389

—Scheufele, D. A., Hardy, B. W., Brossard, D., Waismel-Manor, I. S., & Nisbet, E. (2006). Democracy based on difference: Examining the links between structural heterogeneity, heterogeneity of discussion networks, and democratic citizenship.

Journal of Communication, *56*(4), 728–753. doi:10.1111/j.1460-2466.2006.00317.x

—Shah, D. V., Friedland, L. A., Wells, C., Kim, Y. M., Rojas, H., & Bennett, W. L. (2012). The personalization of politics: Political identity, social media, and changing patterns of participation. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, *644*(1), 20–39. doi:10.1177/0002716212451428

—Skoric, M. M., Zhu, Q., Goh, D., & Pang, N. (2016). Social media and citizen engagement: A meta-analytic review. *New Media & Society*, *18*, 1817–1839. doi:10.1177/1461444815616221

—Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). *Using multivariate statistics* (6th ed.). Boston, MA: Pearson.

—Taber, C. S., & Lodge, M. (2006). Motivated skepticism in the evaluation of political beliefs. *American Journal of Political Science*, *50*(3), 755–769. doi:10.1111/j.1540-5907.2006.00214.x

—Thorson, K. (2013). Facing an uncertain reception: young citizens and political interaction on Facebook. *Information, Communication & Society*, *17*, 203–216. doi:10.1080/1369118X.2013.862563

—Tong, S., & Walther, J. B. (2011). Relational maintenance and CMC. In K. B. Wright & L. M. Webb (Eds.), *Computermediated communication in personal relationships* (pp. 98–118). New York, NY: Peter Lang.

—Twenge, J. M., Keith, W., & Freeman, E. C. (2012). Generational differences in young adults' life goals, concern for others, and civic orientation, 1966–2009. *Journal of Personality and Social Psychology*, *102*, 1045–1062. doi:10.1037/a0027408

—Vaccari, C., Valeriani, A., Barbera, P., Bonneau, R., Jost, J. T., Nagler, J., . . .Tucker, J. A. (2015). Political expression and action on social media: Exploring the relationship between lower- and higher-threshold political activities among twitter users in Italy. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *20*, 221–239. doi:10.1111/jcc4.12108

—Valenzuela, S., Kim, Y., & Gil de Zuniga, H. (2012). Social networks that matter: Exploring the role of political discussion for online political participation. *International Journal of Public*

Opinion Research, *24*, 163–184. doi:10.1093/ijpor/edr037

—Weeks, B. E., & Holbert, R. L. (2013). Predicting dissemination of news content on social media: A focus on reception, friending, and partisanship. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, *90*, 212–232. doi:10.1177/1077699013482906

—Wojcieszak, M. E., & Mutz, D. C. (2009). Online groups and political discourse: Do online discussion spaces facilitate exposure to political disagreement? *Journal of Communication*, *59*, 40–56. doi:10.1111/j.14602466.2008.01403.x

—Zhang, Y., & Leung, L. (2014). A review of social networking service (SNS) research in communication journals from 2006 to 2011. *New Media & Society*, *17*, 1007–1024. doi:10.1177/1461444813520477



সমাজে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব

জ্যাকব আমেদি

ভূমিকা

জ্ঞানই শক্তি। যদিও আমরা সবাই প্রবাদটি জানি, কিন্তু জ্ঞান ছড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভূমিকা খুব কম মানুষই বোঝে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর কল্যাণে যে কেউ ইন্টারনেটের মাধ্যমে অবারিত জ্ঞানের সাগর থেকে তাদের জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ করতে পারে। আমাদের এই বর্তমান আধুনিক বিশ্বে সামাজিক মাধ্যম আমাদের সমাজ, অর্থনীতি ও সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে প্রভাব ফেলছে তা অনস্বীকার্য। সামাজিক মাধ্যম এক নতুন গণমঞ্চ, যা মানুষের মধ্যকার চিন্তাচেতনার আদান-প্রদানে, মানুষে মানুষে যোগাযোগে, কোনো উদ্দেশ্যে সবাইকে সমবেত করতে, পরামর্শ পেতে ও দিতে সুযোগ তৈরি করে দেয়। সামাজিক মাধ্যমগুলো যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করে যোগাযোগের মাধ্যমগুলোকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছে এবং যোগাযোগের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে, যাতে দমনাত্মক দেশগুলোর সবাই সমান ও গণতান্ত্রিকভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এই গণমাধ্যমগুলো বৈচিত্র্যময় স্বতঃস্ফূর্ত, আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক, পাণ্ডিত্যপূর্ণ-অপণ্ডিতচিত সব ধরনের লেখাকেই ধারণ করে ও বিকাশের সুযোগ করে দেয়। এই গণমাধ্যম সমস্বার্থের গোষ্ঠীগুলোকে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রের পরিধি বাড়িয়ে দেয়, যেমনটা দেখা যায় ছাত্রদের সমন্বিত দলবদ্ধ প্রকল্পের কাজে। সামাজিক মাধ্যমগুলো শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, শ্রেণিবৈষম্য, স্বার্থ, সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পর্যালোচনাগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসে।

যদিও এই সামাজিক মাধ্যমগুলো আমাদের সমাজ, দেশ ও সংস্কৃতির দেয়াল ভেঙে সব মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, কিন্তু এর সবকিছুরই একটা মূল্য আছে।

● অনুবাদ : **মো. ফাহাদ হোসেন**

সামাজিক মাধ্যমগুলোর কিছু খারাপ প্রভাবও আমাদের জীবনে দৃশ্যমান। কারণ অন্তঃকরণের-বিচ্ছিন্নকরণের সংযুক্তি ও বৈশ্বিক পরিব্যাপ্তি আমাদের কৃষ্টিকে ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু করে দিচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমগুলো আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা হরণ করছে এবং মানবিক, শারীরিক ও অনুভূতির সাহচর্যকে ভার্চুয়াল যোগাযোগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করছে। এই মাধ্যমগুলো আমাদের আত্মসংযম কেড়ে নিয়ে নিজেদের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে অকেজো করে দিয়েছে এবং সেই সব অবান্তর তথ্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাসপ্রবণ করে তুলছে, যা আমরা কোনো বাছবিচার ছাড়াই প্রতিনিয়ত গলাধঃকরণ করে চলেছি।

শ্লেষাত্মকভাবে বলতে গেলে, সামাজিক মাধ্যমগুলো ধীরে ধীরে আমাদের একটা অসামাজিক প্রজন্মে রূপান্তরিত করছে। এখন আমরা টেলিফোনের কথোপকথনের চেয়ে খুদে বার্তা আদান-প্রদানকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি এবং সরাসরি সাক্ষাতের থেকে অনলাইনে কথা বলাই শ্রেয় মনে করছি। এমনকি অনেকে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে সহজলভ্য প্রচারমাধ্যম, যেমন ফেসবুক, টুইটার ও ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করেছে। জোনাথন ফোয়ার তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সামাজিক মাধ্যমের প্রতিটা পদক্ষেপ আমাদের আবেগময় উপস্থিতিকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ করে দিয়েছে, যেখানে মানবিকতা জানানোর থেকে তথ্য দেওয়া সহজ।' গড়িয়ে যাওয়া প্রতিটি দিন আমাদের এই কথার সত্যতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

আমাদের জীবনে সামাজিক মাধ্যমগুলোর তিন ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ও সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন গবেষকের গবেষণায় প্রাপ্ত প্রমাণাদি নিয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিন ধরনের নেতিবাচক দিকের প্রথমে রয়েছে—সামাজিক মাধ্যমগুলো মানুষের মাঝে অনলাইন যোগাযোগের মিথ্যে ও অগভীর সম্পৃক্ততা এবং বাহ্যিক বন্ধুত্বকে জিইয়ে রেখে তাদের মানসিক বৈকল্য ত্বরান্বিত করে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক মাধ্যম মানুষের পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবন থেকে মূল্যবান সময় কেড়ে নিয়ে তাদের আসক্ত করে ফেলে। ফলে তাদের সামাজিক দক্ষতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং অসামাজিক আচরণ বেড়ে যায়। সবশেষে, সামাজিক মাধ্যমগুলো অপরাধীদের জন্য একটা হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে, যা খুব সহজে ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন রকমের অপরাধ কর্ম সম্পাদন করে। এই গবেষণার তৃতীয় বিশ্লেষণে জটিল মানসিক সমস্যার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার সংযোগ দেখানো হয়েছে।

পটভূমি

যদিও সামাজিক মাধ্যমগুলোর ক্ষতিকর দিকগুলো হলো আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, তবু ব্যবহারিক দিক দিয়ে সামাজিক মাধ্যমগুলোর অনেক উপকারী দিকও রয়েছে, যা স্বীকার করতেই হবে। সামাজিক মাধ্যমগুলো সমমনা মানুষদের দল গঠনে কার্যকর

ভূমিকা রাখে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে তাদের প্রতিষ্ঠানের দলগত প্রকল্পের অনেক কাজে সামাজিক মাধ্যমগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, ফেসবুক শিক্ষার্থীদের ক্লাসের বাইরেও তাদের নিজেদের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট-সম্পর্কিত ধারণাগুলো আদান-প্রদানের সুযোগ করে দেয়। কিছু স্কুল ক্লাসরুমের শিক্ষার বাইরেও বিভিন্ন ব্লগকে শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে, যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ইংরেজিতে দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে ঝালিয়ে নিতে পারে। সামাজিক মাধ্যমগুলো খুব ভালো বিপণন মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহারকারীর সংখ্যা গুণোত্তর ধারায় বেড়ে যাওয়াতে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য, এমনকি তাদের কোনো পণ্যের ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্য আলোচনা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই সামাজিক মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে, কোম্পানিগুলো তাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই সামাজিক মাধ্যমগুলোকে বিজ্ঞাপনের প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। উপরন্তু, সামাজিক মাধ্যমগুলোর তথ্য প্রচলিত গণমাধ্যমগুলোর থেকে অধিক দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এখন সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে আমরা কোনো ব্যক্তির নিখোঁজ সংবাদ আমাদের স্মার্টফোনেই পেয়ে যাই। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমগুলোতে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ঘটনাগুলোর মধ্যে কলোরাডোর অরোরায় ২০১২ সালে সিনেমা হলে গুলি চালানো, বোস্টনে ২০১৩ সালের ম্যারাথনে বোমাবাজি এবং কয়েক সপ্তাহ আগে জিম্বাবুয়ের সিংহ সিসিলের মৃত্যু অন্যতম। প্রচলিত গণমাধ্যমগুলোর থেকে সামাজিক মাধ্যমগুলো খুব তাড়াতাড়ি মানুষের মধ্যে কোনো ঘটনার কারণ ও ফলাফল ছড়িয়ে দিতে পারে এবং ওই ঘটনাগুলোয় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জাগ্রত করে। বিশেষ করে দ্রুততার সঙ্গে সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বোস্টনের ম্যারাথনে বোমাবাজির ঘটনা একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঘটনার পরে এফবিআই দুজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির ছবি ফেসবুক, টুইটার ও রেডিটে ছড়িয়ে দেয়। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছবি ও তথ্য সবাই বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের গ্রুপে ছড়িয়ে দেয়। এই বিষয়ের তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় এই ঘটনা জন-উৎস বা জন-গোয়েন্দা নামে অভিহিত করা হয়, ফলে দুষ্কৃতকারীরা কোথাও পালানোর সুযোগ পায়নি। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দুষ্কৃতকারীদের একজনকে মৃত পাওয়া যায় ও অন্য একজনকে হাজতে আটক করা হয়। এগুলো হলো সামাজিক মাধ্যমের অনেক উপকারিতার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

সামাজিক মাধ্যমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফেসবুকের আছে ১৪০ কোটি ব্যবহারকারী (২০১৭ সালের শেষে ২০০ কোটি ২০ লাখ দাঁড়িয়েছে)। এই সংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ, যা আমাদের বুঝতে, শিখতে এবং তথ্য তৎক্ষণাৎ আদান-প্রদানে সহায়তা করে পুরো পৃথিবীকে একটা ছোট্ট গ্রামের মতো

বানিয়ে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও সামাজিক মাধ্যমগুলোর এই উপকারী দিকগুলোর পাশাপাশি এসব মাধ্যমের অনেক ক্ষতিকর দিকও আছে, যা সমাজে খারাপ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। পুরো প্রবন্ধে আমি তিনটি প্রধান বিষয় আলোচনা করব, যা আমি গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে খুঁজে পেয়েছি। সেগুলো হলো সামাজিক মাধ্যম ও মানসিক সমস্যা, সামাজিক মাধ্যমগুলোকে অপরাধের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার এবং সর্বশেষে সামাজিক মাধ্যমের সঙ্গে অপরাধের সম্পৃক্ততা।

প্রথম বিশ্লেষণ : সামাজিক মাধ্যম ও মানসিক সমস্যা

পরের অংশে আমি সমার্থক যুক্তি দিয়ে দেখাব কীভাবে সামাজিক মাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুক মানুষের মধ্যে মানসিক সমস্যা তৈরি করে। এটা স্পষ্ট যে সামাজিক মাধ্যমগুলো মানুষের ওপর, বিশেষ করে তরুণদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটা ঘটে যখন তারা নিজেদের ও তাদের উদ্ভূত কোনো সমস্যার মাত্রাতিরিক্ত বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করে।

ফেসবুকীয় বিষাদ

বেশ কিছু গবেষক একটা নতুন ঘটনাপ্রবাহের প্রস্তাব করেছেন, যা 'ফেসবুকীয় বিষাদ' নামে আখ্যা দেওয়া যায়। এই ফেসবুকীয় বিষাদের উৎপত্তি হয় যখন কেউ ফেসবুকে মাত্রাতিরিক্ত সময় ব্যয় করে এবং তাদের মধ্যে বিষাদের সৃষ্টি হয়। গ্রহণযোগ্যতা খোঁজা ও অন্যের দৃষ্টিগোচরে আসার প্রবণতাই হলো সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য। যা-ই হোক, ইন্টারনেটের অনলাইন জগতে সর্বদা সম্পৃক্ততা ও নিবিড়তা প্রত্যেক ব্যবহারকারীর মাঝে আত্মসচেতনতা জাগিয়ে তোলে, যা একটা পর্যায়ে ব্যক্তির মাঝে বিষাদ সৃষ্টি করে। যেসব মানুষ ফেসবুকীয় বিষাদে ভুগে, তারা সামাজিক একাকিত্বের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে ক্ষতিকর ইন্টারনেট সাইট ও ব্লগে সাহায্য খুঁজে বেড়ায়। এই সাহায্য খুঁজে বেড়ানোটা আবার একটা পর্যায়ে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে, যা হয়রানি, যৌন হয়রানি, আগ্রাসী মনোভাব ও আত্মবিধ্বংসী মনোভাব বৃদ্ধি করে। অসাবধানতায় মাত্রাতিরিক্ত সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করার ফলে হতাশার সৃষ্টি হয়। পরিষ্কার করে বলতে গেলে, ফেসবুকের দ্বারা সৃষ্ট হতাশা শুধু ফেসবুকেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই মানসিক সমস্যাগুলো অন্য সামাজিক মাধ্যমগুলোতেও প্রতিফলিত হয়। যেহেতু বর্তমানে ফেসবুক সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত সামাজিক মাধ্যম, তাই সামাজিক মাধ্যমগুলোর দ্বারা সৃষ্ট মানসিক সমস্যাগুলোকে সাধারণভাবে ফেসবুকীয় হতাশা নামেই অভিহিত করা হয়। প্রফেসর ড. জোয়ান ডেভিলা ও তাঁর সহকর্মী লিসা স্টার এবং আমেরিকার স্টোনিব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক তাঁদের গবেষণায় হতাশা ও সামাজিক মাধ্যম

ব্যবহারের মধ্যে একধরনের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা একদল তরুণীর ওপর চালানো নিরীক্ষায় দেখেছেন যে মাত্রাতিরিক্ত ফেসবুক ব্যবহারে ওই তরুণীদের মধ্যে হতাশা ও উদ্বেগ আশঙ্কাজনক হারে বাড়িয়ে দিয়েছে। এক বছর পরে ওই তরুণীদের ওপর পুনর্নিরীক্ষণ চালিয়ে গবেষকেরা দেখতে পান যে যাঁরা নিজেদের সমস্যা অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করেননি, তাঁদের চেয়ে যাঁরা নিজেদের সমস্যাগুলো বারবার সামাজিক মাধ্যমে বন্ধুদের সঙ্গে বা অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাঁরা আরও বেশি মানসিক সমস্যার ঝুঁকিতে আছেন। ড. ডেভিলা বলেছেন, 'খুদে বার্তা, তাৎক্ষণিক বার্তা ও সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ কিশোর-কিশোরীদের আরও বেশি উদ্বেগপ্রবণ করে তোলে, যা পরবর্তী সময়ে হতাশায় পরিণত হয়।' মোটা দাগে বলতে গেলে, সামাজিক মাধ্যমগুলো যুবসমাজকে অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মসচেতন, উদ্বিগ্ন এবং সবশেষে হতাশ করে ফেলে।

সামাজিক মাধ্যমে কোনো সমস্যা নিয়ে বারবার আলোচনার ফলে তা ব্যক্তিকে ওই সমস্যা থেকে বের তো হতেই দেয় না, বরং ব্যক্তি সমস্যার বেড়াজালে আটকে যায়। এই জাল থেকে পরবর্তী সময়ে সে আর বের হতে পারে না এবং জীবনকে সামনে এগিয়ে নিতেও পারে না। আসলে এসব সমস্যা খুবই তুচ্ছ যেমন: অন্যদের কাছে নিজের অবয়ব নিয়ে আত্মসচেতনতা, বন্ধুদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অথবা প্রেমের প্রতিদান ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে কি না। অতীতে মেয়েরা নিজের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো তাদের ডায়েরিতে লিখে রাখত কিংবা অন্য কারও সঙ্গে সমস্যাগুলো নিয়ে ফোনে আলাপ করত। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক মাধ্যম কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো সবার সামনে নিয়ে আসছে। ঠিক এভাবেই যখন কোনো কিশোর-কিশোরী তার সমস্যা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করে, তখন স্বাভাবিকভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের মন্তব্যই আসে, যা ওই কিশোর-কিশোরীকে সমস্যার জালে জড়িয়ে ফেলে। যখন সামাজিক মাধ্যমে কোনো সমস্যা প্রকাশ করা হয়, তখন তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, এমনকি যদি ওই পোস্ট মুছেও দেওয়া হয়, তবু কোথাও কারও কাছে তার স্ক্রিনশট থেকে যায়। এই চিন্তায় ওই ব্যক্তির মধ্যে আরও বেশি মানসিক সমস্যা দানা বাঁধে।

নতুন আরেকটি গবেষণায় দেখা যায় যে যারা সামাজিক মাধ্যম, গেমিং, খুদে বার্তা, মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাদের মধ্যে উদ্বেগ ও হতাশা বেশি কাজ করে। মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ড. মার্ক বেকারের গবেষণায় দেখা যায়, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ নিজেরাই জানিয়েছে তাদের হতাশায় ভোগার কথা এবং ৪২ শতাংশ মানুষ উদ্বিগ্নতায় ভোগে। এটা থেকে স্পষ্ট হয় যে সামাজিক মাধ্যমগুলো মানুষকে হতাশা, উদ্বেগ ও টানাপোড়েনে জড়িয়ে ফেলে।

সামাজিক মাধ্যম ও উদ্বেগ

হতাশা ও উদ্বেগ ছাড়াও সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহারকারীদের ওপর মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়। ৭ হাজার মায়ের ওপর চালানো অন্য এক জরিপে দেখা যায়, যেসব মা সামাজিক মাধ্যম পিন্টারেস্টে ছবি প্রকাশ করেন, তাঁদের মধ্যে ৪২ শতাংশ মা পিন্টারেস্ট চাপে ভোগেন। কিন্তু কীভাবে এই সামাজিক মাধ্যমগুলো তাদের ব্যবহারকারীদের মধ্যে উদ্বেগ, হতাশা ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে? এই হতাশা ও মানসিক চাপ সৃষ্টি মূলত দুভাবে হয়ে থাকে। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ হতাশার সৃষ্টি করে। সর্বদা সামাজিক মাধ্যমে কী হচ্ছে, কী বার্তা এল—এই চিন্তা একধরনের প্রবৃত্তি, যা সব সময় শিকারির ভয়ের মতো তাড়া করে বেড়ায় এবং এটা একধরনের চাপ সৃষ্টিকারী হরমোন নিঃসৃত করে।

দ্বিতীয়ত, যেভাবে সামাজিক মাধ্যমগুলো হতাশা ও মানসিক চাপ বাড়ায় তা হলো ব্যক্তির মধ্যে একধরনের কাল্পনিক, অবাস্তব ও অর্জন করা যায় না এমন নিখুঁতভাবে তুলে ধরার প্রবণতা তৈরি করে। সর্বদা নিজেকে অন্যের কাছে নিখুঁত হিসেবে তুলে ধরার এই মানসিক চাপ থেকেই হতাশা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। এই মানসিক চাপ অবিরাম চলার কারণে ব্যক্তির ওপর চাপ সৃষ্টিকারী হরমোন করটিসোল অনবরত নির্গত হতে থাকে, যা একসময় শরীরের গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাকের ক্ষতি সাধন করে এবং এর ফলে মস্তিষ্কের সাড়াদানে বিঘ্ন ঘটিয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দেয়।

সম্পর্কের অলীক ঘনিষ্ঠতা সামাজিক মাধ্যমে হতাশা উদ্রেকের আরেকটি কারণ। যদিও সামাজিক মাধ্যমের উপরিভাগে আমাদের আনন্দঘন মুহূর্তগুলো প্রাধান্য পায়, কিন্তু গভীরতায় লুকিয়ে থাকে আমাদের বাস্তবিক জীবনের অনেক না বলা সংগ্রাম ও কষ্ট। সুতরাং নিজেদের সব থেকে আনন্দময় মুহূর্তগুলোকে আমরা একধরনের মুখোশের মাধ্যমে অন্যদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি, কারণ আমরা অন্যদেরও সেই একই জিনিস করতে দেখি। ফলে সামাজিক মাধ্যমে আমাদের যে জীবনকথা তুলে ধরি, তা আসলে আমরা অন্যদের যেভাবে দেখাতে চাই নিজেকে। কিন্তু সত্যিকারেই আমরা কী, তা দেখাতে চাই না।

এভাবেই অনেকে নিজেদের তথাকথিত 'সুখী' রূপ ভার্চুয়াল যোগাযোগে অন্যকে প্রকাশ করে, কিন্তু বাস্তবে নিজেদের সত্যি রূপ ও সত্যি সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয় না। অনেক গবেষণাতেই দেখা গেছে যে এই আপাতদৃষ্টির ও ভাসা-ভাসা সম্পর্ক দীর্ঘসূত্রতায় মানসিক পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফেসবুক ও টুইটারের মতো সামাজিক মাধ্যমগুলো যেকোনো মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, হোক সে হাইস্কুলের বন্ধু, সহকর্মী বা প্রতিবেশী। 'অনেক দিনের যোগাযোগ না থাকা বন্ধুদের ফেসবুকে আচমকা খুঁজে পেলে প্রথম দিকে কী আনন্দই না লাগে,' বললেন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের প্রফেসর স্টিভেন স্ট্রগাটস। কিন্তু তিনি এই আনন্দের মধ্যে কালো ছায়াও খুঁজে পেলেন। তিনি দেখেছেন যে এই সামাজিক মাধ্যমগুলোতে শক্ত সম্পর্কের সঙ্গে দুর্বল সম্প-

র্কগুলোকে গুলিয়ে ফেলার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সত্যিকারের বন্ধু ও শুধু পরিচিতদের মধ্যে তফাতটা ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছে। যাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই, সেই সব মানুষকে নিয়েই বেশি সময় কাটাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহারকারীরা।

এই রকম সম্পর্কের উদাহরণ টানতে গিয়ে তিনি আরও বলেন যে আমার এক মেয়েবন্ধু এক দিন তার জিমের একটা সেলফি ফেসবুকে পোস্ট করে। প্রথম দিকে ব্যাপারটা ভালোই ছিল, মাত্র ২০টার মতো লাইক পড়েছিল এবং কিছু উৎসাহমূলক মন্তব্য। কিন্তু বিপত্তিটা বাধে তখনই, যখন একজন ওই ছবিতে নেতিবাচক মন্তব্য করে। ওই রেশ ধরে অন্যরাও একটার পর একটা খারাপ মন্তব্য করেই যাচ্ছিল। শেষমেশ তাকে ছবিটি ফেসবুক থেকে সরিয়ে ফেলতে হয়।

সামাজিক মাধ্যম ও ক্যাটফিশিং

যখন মানুষ সামাজিক মাধ্যমে বেশি সময় কাটায়, তখন থেকেই শুরু হয় সত্যিকারের সম্পর্কগুলোর মধ্যে টানাপোড়েন। এই সামাজিক মাধ্যমে বেশি বেশি সময় কাটানোতে আমাদের ভালোবাসার ও কাছের মানুষগুলো এবং পরিবারের ঘনিষ্ঠজনেরা দুর্ভোগ পোহায়। এমটিভি ক্যাটফিশ নামের একটা ডকুমেন্টারিতে দেখিয়েছে যে মানুষ কীভাবে সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া পরিচয়ে অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। এই ধরনের মিথ্যে অভিনয় অনেক মানুষের ঘর-সংসার, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও মানসিক শান্তি বিনষ্ট করেছে। ক্যাটফিশের একটা পর্বে নেভ শুলম্যান, যিনি বর্ণনা করছিলেন, তাঁর অনলাইনে খুঁজে পাওয়া প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন, হায়, এ কে! অনলাইনে পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। এমনকি তাঁর সেই অনলাইন প্রেমিকার অনলাইনে প্রকাশ করা ছবির সঙ্গে বাস্তবে কোনো মিল নেই। তখন নেভ ভাবলেন, যদি একজন মানুষ তাঁর অবয়ব নিয়ে মিথ্যে বলতে পারে, তাহলে তাঁর চরিত্রের অন্য দিকগুলো নিয়ে অনেক প্রশ্নই উঠে আসে। বিখ্যাত ম্যাগাজিন *সাইকোলজি টুডে*তে ২০১২ সালে অজিন সাইয়িদি নামের মনোবিজ্ঞানী বলেছেন, এটা এখন প্রমাণিত যে বাস্তব দুনিয়ায় অসম্ভব এমন অনেক কিছুই অনলাইনে সম্ভব, কারণ সেখানে পরিচয় লুকানো যায়। তার ওপরে মানুষের মন যখন প্রেমে হাবুডুবু খায়, তখন অনেক জটিল বিষয় এড়িয়ে যায়।

ক্যাটফিশের একটা পর্বে দেখানো হয় যে ১৩ বছরের মেগান মেয়ার নামের এক কিশোরী আত্মহত্যা করে, কারণ অনলাইনে জশ ইভানস নামের একটা ভুয়া কিশোর তাকে সাইবার বুলিং করেছিল। পরবর্তী সময়ে তদন্তে বেরিয়ে আসে যে আসলে জশ ইভানস নামের ওই ভুয়া প্রোফাইলটি মেগানের থেকে বয়সে বড় তারই এক প্রতিবেশীর।

খুব বেশি সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের প্রবণতা অনেক বেশি ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক মাধ্যমগুলো মিথ্যে সম্পর্কের বেড়াজালে মানুষকে জড়িয়ে ফেলে, যা দীর্ঘসূত্রতায় কাল হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় বিশ্লেষণ : সামাজিক মাধ্যম ও অপরাধ সংঘটন

মানসিক সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় যে সমস্যা সমাজে প্রকট হয়ে উঠেছে, তা হলো সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে অপরাধ সংঘটন। পরিচয় গোপন করার মাধ্যমে অপরাধী চক্র সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে অন্যদের সঙ্গে মিথ্যা বলে জোচ্চুরি করে, আক্রমণ করে, আঘাত করে। অনেক অপরাধী সামাজিক মাধ্যমে তাদের পরিচয় গোপন করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ঘটায়। যেমন সাইবার বুলিং, সাইবার সন্ত্রাস, মানব পাচার, মাদক কেনাবেচা ইত্যাদি।

সামাজিক মাধ্যম ও বুলিং (হেনস্তা)

বর্তমান যুগে তরুণদের মাঝে সাইবার বুলিং (মানসিকভাবে হেনস্তা করা) এক কালো জাল ছড়িয়েছে। সহজে প্রতিবাদ করতে পারে না এমন তরুণ-তরুণীদের কমতি-ঘাটতি নিয়ে অনবরত অপমান করা, মানসিক পীড়া দেওয়া ও সমাজে অন্যদের কাছে ছোট করার এই প্রবণতাই সাইবার বুলিং নামে পরিচিত। এই অপমান ও পীড়া দেওয়ার জন্য যখন মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, তখন সেই বুলিংকেই 'সাইবার বুলিং' বলে। যারা সাইবার বুলিং করে, তারা খুব সহজেই অনলাইনে তাদের পরিচয় গোপন করতে পারে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে ২০-৩০ শতাংশ তরুণ-তরুণী এই সাইবার বুলিংয়ের শিকার অথবা সাইবার বুলিং করে। ব্রিটেনের ন্যাশনাল চিলড্রেনস হোমের করা জরিপে বেরিয়ে আসে যে প্রতি চারটি শিশুর মধ্যে কমপক্ষে একটি শিশু এই সাইবার বুলিংয়ের শিকার। এই সমস্যা পরবর্তী সময়ে শিশুর মানসিকতা বেড়ে ওঠায় ব্যাঘাত ঘটায়। এমনকি শিশুদের আত্মহননের পথেও ধাবিত করে এই সাইবার বুলিং।

আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এত অপমৃত্যু, আত্মহত্যা ও মানসিক সমস্যার বৃদ্ধি সামাজিক মাধ্যমের খারাপ দিকগুলোকেই খতিয়ে দেখার কথা মনে করিয়ে দেয়। সম্প্রতি এই সাইবার বুলিং সমাজ ও দেশের কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়ে তুলেছে। অনেকে চায়, এই পরিচয় গোপন করার পন্থা তুলে দিতে, কেউ কেউ আবার চায় অপরাধীদের সাজা হোক। অনেক দেশই এখন সাইবার বুলিং রোধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে।

সামাজিক মাধ্যম ও সন্ত্রাস

সামাজিক মাধ্যমের আরও একটি ভয়ংকর দিক হলো অপরাধী ও সন্ত্রাসীরা এই সামাজিক মাধ্যমগুলোকে তাদের অপরাধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

বিগত কয়েক বছরে এই সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে সন্ত্রাসীরা ইউরোপ, রাশিয়া, আমেরিকা এমনকি মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে সন্ত্রাসীরা নিজেদের দলে মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারছে খুব সহজেই। নয়-এগারোর হামলার পর আল-কায়েদাসহ অসংখ্য জিহাদি আন্দোলনকারী দলের খোঁজ পাওয়া গেছে, যারা সামাজিক মাধ্যমকে তাদের প্ল্যাটফর্ম বানিয়েছে। ইসরায়েলের হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওইম্যানের গবেষণায় পাওয়া গেছে, কীভাবে সন্ত্রাসীরা সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের প্রোপাগান্ডা মানুষের মাঝে ছড়ায় ও জিহাদি কর্মী সংগ্রহ করে। সন্ত্রাসীরা জানে, কোন ব্যক্তি তাদের মতামত ধারণ করে। সেই সব ব্যক্তিকে টার্গেট করে তারা সামনে এগোতে থাকে।

উপসংহার

সবকিছুর সারাংশে বলতে গেলে, যদিও সামাজিক মাধ্যমগুলোর কিছু উপকারী দিক, যেমন খুব দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করা—থাকা সত্ত্বেও মানসিক বৈকল্য, অপরাধের আধার ও মিথ্যের ছড়াছড়িতে সামাজিক মাধ্যমের যে অপব্যবহার, তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক মাধ্যমের এই উত্থান নতুন হলেও বেশির ভাগ সময়ই এই উপকারিতাগুলোকেই ফলাও করে প্রচার করা হয়, যতটা না তার খারাপ ও কালো দিকগুলোকে তুলে ধরা হয়। এই প্রচলন অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। আমি আশা করি, আমার এই আলোচনা সামাজিক মাধ্যমগুলোর দুই দিকেই যুক্তিতর্ক দিয়ে উপস্থাপন করতে পেরেছি। যদিও পরিবর্তন ভালো এবং অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তার একটা মূল্য আছে, যা ভুলে গেলে চলবে না। ভালো দিক কম হলেও তা দীর্ঘসূত্রতায় খুব একটা মন্দ বয়ে আনে না, কিন্তু খারাপ দিকগুলো অবহেলা করলে এর পরিণাম সুদূরপ্রসারী হয়। আমার এই উপস্থাপনায় আমি দেখাতে চেয়েছি যে সামাজিক মাধ্যমের এই সেন্সরবিহীন ও যথাযথ মনিটরিং ছাড়া বেড়ে ওঠা আমাদের সামাজিক কাঠামোর শৃঙ্খলা ভেঙে দিতে পারে, যদি না আমরা সচেতনভাবে খোঁজ না রাখি যে ওখানে কী হচ্ছে, কী হচ্ছে না। সামাজিক মাধ্যমগুলোকে প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণের ওপরে রাখলে সেটি আমাদের ভালো বৈ খারাপ হবে না।

তথ্যসূত্র

১. Brockman, John. *Is the Internet Changing the Way You Think?: The Net's Impact on Our Minds and Future.* 2011 ed. New York: Harper Perennial, 2011. 451.

২. Bannink, Rienke; Broeren, Suzanne; van de Looij – Jansen, Petra M, "Cyber and Traditional Bullying Victimization as a Risk Factor for

Mental Health Problems and Suicidal Ideation in Adolescents". *PLoS ONE*. Apr2014, Vol. 9 Issue 4, p1-7. 7p. http://eds.b.ebscohost.com.libproxy.scu.edu/ehost/detail/

৩. Bhui, Kamaldeep, Brian Everitt, and Edgar Jones. "Might Depression, Psychosocial Adversity, and Limited Social Assets Explain Vulnerability to and Resistance against Violent Radicalisation?" *PLoS ONE*, 2014.

৪. Bryfonski, Dedria. *The Global Impact of Social Media*. 2011 ed. Detroit, MI: Greenhaven Press, 2012. 224.

৫. Campbell, Marilyn (2005) "Cyber bullying: An old problem in a new guise?" *Australian Journal of Guidance and Counseling*, Australian Academic Press, 2005, 76.

৬. Deen, Hana S., and John A. Hendricks. *Social Media: Usage and Impact*. 2012 ed. Lanham, Md.: Lexington Books, 2012. 307.

৭ Jacobs, Tom; *The Link Between Depression and Terrorism*; SEP 29, 2014 http://books-andculture/antidepressants-depression-terrorism-weapon

৮. O'keeffe, G. S., and K. Clarke-Pearson. "The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families." *Pediatrics*, 2011, 800-04

৯. Saedi, Auzeen, Ph.D., (2012) Psychology Today; Millennial Media; The media saturated generation Y; "Catfish" and the Perils of Online Dating. http://www.psychologytoday.com/ blog/millennialmedia/201212/catfish-and-the-perils-online-dating

১০. Spears, Barbara ; Campbell, Marilyn; Slee, Phillip T.2Butler, "Cyberbullies' perceptions of the harm they cause to others and to their own mental health," *School Psychology International*. Dec2013, Vol. 34, Issue 6, p613-629. 17p.
http://www.protectachild.com.au/ latest_news.php#article80

১১. Weimann, Gabriel; "The Psychology of Mass-Mediated Terrorism," *American Behavioral Scientist*. Sep2008, Vol. 52 Issue 1, p69-86. 18p http://eds.a.ebscohost.com.libproxy.scu.edu/ ehost/detail/

১২. Mark W. Becker, Reem Alzahabi, and Christopher J. Hopwood. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*. February 2013

১৩. Becker, Mark W., Reem Alzahabi, and Christopher J. Hopwood. "Media Multitasking Is Associated with Symptoms of Depression and Social Anxiety." *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 16, no. 2 (2013): 132-35. Accessed August 27, 2015

১৪. Starr, Lisa; Davilla, Joanne Dr.; *Excessive Discussion Of Problems Between Adolescent Friends May Lead To Depression And Anxiety*. Stony Brook University . January 27, 2009.

রাজনৈতিক অর্থনীতি

একটি রাখাইন প্রবাদ
বরিশাল বিভাগের আদিবাসী রাখাইনদের ভূমিসংকট পর্যালোচনা

পাভেল পার্থ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের ১৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে বাঙালি ছাড়া অন্য ৩০ লাখ জাতিগোষ্ঠীর মানুষ 'আদিবাসী' হিসেবে নিজেদের একক পরিচয় দাঁড় করিয়েছে। আদিবাসীদের ভেতরে রাখাইনদের মোট জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৪ হাজার ৫০০। বাংলাদেশে কয়েক শ বছরের প্রাচীন রাখাইন সভ্যতার নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও রাখাইন জনগণ দেশের মূলধারায় উপেক্ষিত। পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী দ্বীপে আদি রাখাইন বসতি স্থাপনের ইতিহাস জানা গেলেও আজ পুরো বরিশাল বিভাগ রাখাইনশূন্য হয়ে পড়েছে। প্রশ্নহীনভাবে রাখাইন বসত ও ভূমি বেদখলই এর অন্যতম কারণ। চলতি আলাপটি বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগের রাখাইন জনগণের ভূমিহীনতা-সম্পর্কিত প্রশ্নকে ঘিরে বিস্তৃত হয়েছে। উপকূলে চলমান হেজেমনিক বা অধিপতি উন্নয়ন-বাহাদুরি ও রাখাইন জনগণের ভূমিযন্ত্রণা বুঝতে একটি প্রচলিত রাখাইন প্রবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। উপকূলের রাখাইনদের ভূমিসংকটকে এক প্রচলিত রাখাইন প্রবাদের ময়দান থেকেই বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবাদে বলা হয়েছে, যখন চারদিকে বাঁধ বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়ে সব প্রাণপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন আর ওই এলাকা বসবাসের উপযোগী থাকে না এবং এমন পরিস্থিতিতে নতুন বসতির খোঁজে স্থানান্তরিত হতে হয়। রাখাইনদের ভূমিসংকট বুঝতে বর্তমান লেখাটি প্রবাদে বর্ণিত সেই 'বাধা'কে নানাভাবে চলমান দেখতে পেয়েছে। ভূমি দখল, উপকূলীয় বাঁধ, অধিগ্রহণ, রাষ্ট্রীয় অবহেলা, জাতিগত নিপীড়ন, বিচারহীনতা, বাঙালি জাত্যভিমান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাখাইন সংস্কৃতির প্রতি উদাসীনতা, রাজনৈতিক বাহাদুরি, বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের মতো প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি আজ রাখাইনদের বসতির বেঁচে থাকার প্রাণপ্রবাহগুলোকে হুমকিতে ফেলছে। লেখাটি উল্লিখিত এলাকার প্রবীণ রাখাইন নারী ও পুরুষদের স্মৃতি-আখ্যানকে মূল সূত্র ধরে এই প্রজন্মের রাখাইনদের ভূমিযন্ত্রণা খোঁজার চেষ্টা করেছে। রাখাইন জনগণ, উল্লিখিত অঞ্চল ও বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকাশিত ও

অপ্রকাশিত নানা দলিল, নথি, প্রত্নস্থল, রাখাইনদের আদি ও দখল হয়ে যাওয়া বসতিস্থল, এলাকার বাঙালি, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকর্মীদের ভাষ্য লেখাটির নানা সূত্র বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একক ও দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, অভিযোগ ও তর্ক এবং অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ভেতর দিয়েই চলতি লেখার তথ্যগুলো নথিভুক্ত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। রাখাইন জীবনদর্শন ও ঐতিহ্যগত ভূমিরীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপিত এই লেখা 'প্রতিবেশ-রাজনীতির' ডিসকোর্সে এক নয়া সংযোজন।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

রাখাইন জনগণ, রাখাইন প্রবাদ, ভূমিসংকট, আদিবাসী, উপকূল, বরিশাল বিভাগ, বাংলাদেশ।

আলাপের ফেনা

'...খেপু ও কলা দুই বার্মিজ ভাই ছিল। দুই ভাইয়ের নামেই দুটি পাড়া, দুটি বাজার। খেপুপাড়া আর কলাপাড়া। দুই বাজারের ভিতরে একটি খাল। এখন খালও বন্ধ আর বার্মিজরাও আগের মতন নাই, তবে নাম দুইটা আছে।'[১]

'...বিখ্যাত আমু[২] *রাখাইনের নামে বরগুনার "আমতলীর" নাম হয়েছে।'*

বাংলাদেশের বরিশাল বিভাগের সমুদ্র উপকূলের রাখাইন আদিবাসীদের ভূমিসংকট বিষয়ে চলতি আলাপখানি শুরু হয়েছে ওপরের দুটি জনভাষ্য দিয়ে। একটি রাষ্ট্রের 'সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে পাওয়া, অন্যটি খোদ রাষ্ট্র নিজে প্রচার করেছে। বাংলাদেশে যাঁরা কক্সবাজার কিংবা কুয়াকাটা ভ্রমণ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে রাখাইনদের পরিচয় ঘটেছে; আর কিছু না হোক 'বার্মিজ আচার', 'বার্মিজ চন্দনমাটি', 'বার্মিজ লুঙ্গি' কিংবা 'মুন্ডি' নামের একধরনের নুডলসের মাধ্যমে অন্তত পরিচয় ঘটেছে। বাংলাদেশের রাখাইনদের মূল বসতি নদী ও সমুদ্র উপকূল। বৃহত্তর বাঙালিসহ মূলধারার কাছে দেশের সব আদিবাসী জাতিগুলোর আত্মপরিচয় এখনো অস্পষ্ট। তারপরও লেখক ও পুলিশ কর্মকর্তা ধীরাজ ভট্টাচার্যের *যখন পুলিশ ছিলাম* বইতে রাখাইন নারী মাথিনের প্রেমকাহিনি বেশ পরিচিত গল্প কিংবা হারুনর রশিদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *মেঘের অনেক রং*-এও আমরা রাখাইন চরিত্র পাই। এর বেশি আর কিছু নয়। পটুয়াখালী, বরগুনা থেকে শুরু করে কক্সবাজার—এই অঞ্চলের আদি নামগুলোও রাখাইনদের ভাষায়। যেমন ক্যানছাই চোয়ান। আজ এই নামটি বদলে গেছে। এখন এর নাম পটুয়াখালীর কুয়াকাটা—দেশের এক অন্যতম পর্যটনস্থল। রাখাইনদের জনসংখ্যা ও বসতি অঞ্চলের সুস্পষ্ট কোনো হালনাগাদ তথ্য ও পরিসংখ্যান হাতের নাগালে পাওয়া যায় না। এক হিসাবে[৩] জানা যায়, বাংলাদেশে রাখাইনদের মোট জনসংখ্যা

১৪ হাজার ৫০০। বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় রাখাইনদের মোট জনসংখ্যা ২ হাজার ৫০০। বরগুনা ও পটুয়াখালীর রাখাইন জনসংখ্যা দেশের মোট রাখাইনদের ১৭ শতাংশ। ২০১৭ সালে ব্যক্তিগত জরিপে বরিশাল বিভাগে ৪০টি রাখাইনপাড়ার (কলাপাড়ায় ২৫টি, আমতলীতে ১২টি, গলাচিপায় ২টি, বরগুনায় ১টি) অস্তিত্ব জানতে পারি। দেখা যায়, বরগুনা ও পটুয়াখালীর দুটি উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের ১৩টি পাড়ায় বর্তমানে রাখাইন বসতি আছে। এখানে রাখাইনদের মোট ১৩টি প্যাগোডা বা উপাসনালয় আছে। বরগুনা ও পটুয়াখালীর রাখাইনদের মধ্যে ২২ জন প্রবীণ বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের 'বয়স্ক ভাতা' পান। শিক্ষা উপবৃত্তি ও বয়স্ক ভাতা ছাড়া অন্যান্য সরকারি সেবা-পরিষেবা পাওয়ার তথ্য জানা যায়নি। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে রাখাইনদের জনমিতির সূত্রমতে, মাত্র দুই শ বছরে, প্রায় ৮১ শতাংশ রাখাইন গ্রাম বেদখল হয়ে রাখাইনশূন্য হয়েছে এবং রাখাইন জনসংখ্যা কমেছে প্রায় ৯৫ শতাংশ। নিচের সারণিতে (সারণি-১) আমরা দেখার চেষ্টা করব, বরিশাল বিভাগে রাখাইন জনসংখ্যা বছর বছর কতখানি হ্রাস পেয়েছে।

সারণি : ১ : বরিশাল বিভাগে রাখাইন জনসংখ্যা ও রাখাইন বসতির পরিবর্তনচিত্র

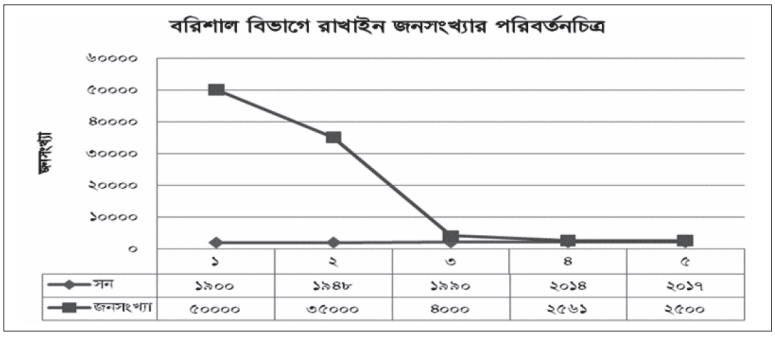

১৭৮৪ সালে পটুয়াখালীর সমুদ্র উপকূলে রাখাইন বসতি স্থাপনের ইতিহাস জানা যায়। ১৭৮৪-১৯০০ সালের দিকে বরিশাল উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ৫০ হাজারের বেশি রাখাইন বসবাস করত। ১৯০০-১৯৪৮ সালে এই সংখ্যা হয় ৩৫ হাজার। ১৯৯০ সালে কমে দাঁড়ায় ৪ হাজার। মংতাহানের[৪] লেখা থেকে জানা যায়, ১৯০০ সালে পটুয়াখালী ও বরগুনা অঞ্চলে ২৪২টি রাখাইনপাড়া ছিল (কলাপাড়ায় ১২০টি, আমতলীতে ৬৯টি, গলাচিপায় ২৯টি এবং বরগুনায় ২৪টি)। মংতাহান দেখিয়েছেন, ২০০৪ সালে উল্লিখিত অঞ্চলে ৪৭টি রাখাইনপাড়া অবশিষ্ট আছে (কলাপাড়ায় ২৮টি, আমতলীতে ১৩টি, গলাচিপায় ৫টি এবং বরগুনায় ১টি

পাড়া)। ২০১৪ সালে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান কারিতাসের বরিশাল অঞ্চলের 'ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইসিডিপি-রাখাইন) জরিপ' অনুযায়ী এই উপকূলীয় অঞ্চলের রাখাইন জনসংখ্যা প্রায় ২ হাজার ৫৬১ জন। পটুয়াখালী ও বরগুনা অঞ্চলের প্রবীণ রাখাইনদের সঙ্গে আলাপ করে মোট ২৩৭টি রাখাইন গ্রামের নাম পাওয়া যায়। বর্তমানে ১৯২টি রাখাইন গ্রামের কোনো হদিস নেই। বর্তমানে সেখানে কোনো রাখাইন বসতি নেই, বসবাস করছে বাইরে থেকে আসা বাঙালিরা। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের রাখাইন জীবনের প্রশ্নহীন বঞ্চনা ও ভূমিসংকটের ধরন বুঝতে ঢাকা থেকে ১৩ সদস্যের এক নাগরিক প্রতিনিধিদল[৫] ১৭ থেকে ১৯ মার্চ ২০১৭ সালে বরিশাল বিভাগের বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা এবং পটুয়াখালীর রাখাইন জনপদ পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে এই প্রজন্মের রাখাইনরা জানান, বর্তমানে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় ২৮টি এবং গলাচিপা উপজেলায় ৪টি রাখাইন গ্রাম আছে। বরগুনা জেলার তালতলী ও সদরে ১৩টি রাখাইন গ্রাম আছে। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে রাখাইনদের জনমিতির সূত্রমতে, মাত্র দুই শ বছরে, প্রায় ৮১ শতাংশ রাখাইন গ্রাম বেদখল হয়ে রাখাইনশূন্য হয়েছে এবং রাখাইন জনসংখ্যা কমেছে প্রায় ৯৫ শতাংশ। রাখাইন জনগোষ্ঠীর এই নির্মম পরিণতি ও অন্যায় ভূমি দখলের বিরুদ্ধে আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এখনো কোনো উল্লেখযোগ্য ন্যায়বিচারের নমুনা দেখিনি। এমনকি স্থানীয় পর্যায়ে গ্রাম থেকে স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন সবাইকেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত নির্বিকারই দেখেছি। সরকারি অফিসে নিজেদের ভূমিসংকট বিষয়ে নানাবিধ আইনি অভিযোগ জানাতে গেলে রাখাইনরা কোনো সহায়তা পায় না এবং তাদের বলা হয়, 'অভিনয় কইরো না'।

সরকারি কর্মকর্তাদের এমন উদ্ভট অভিযোগের জবাবে রাখাইনরা বলে, 'আমরা কোনো অভিনয় জানি না স্যার'।[৬] কিন্তু নিদারুণভাবে উপকূলের রাখাইনদের ভূমিসংকটের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে আছে বাণিজ্যিক অভিনয়কলার সম্পর্ক। ১৯৮৪ সালে উৎপল দত্ত, মিঠুন চক্রবর্তী ও রোজিনা অভিনীত জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা *অবিচার*-এর শুটিং হয়েছিল পটুয়াখালীর কুয়াকাটায়। তখন কুয়াকাটায় পাবলিক যানবাহন বলতে কেবল কিছু ভ্যান চলত। রাখাইনরা তখনই আন্দাজ করতে পেরেছিল যে খুব দ্রুত সবকিছু বদলে যাবে। কারণ ঠিক এর পরপরই কুয়াকাটায় পর্যটনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। অধিকাংশ এলাকা দখল-বেদখল হতে থাকে এবং নানা ধরনের বৃহৎ অবকাঠামো গড়ে ওঠে। রাখাইনরা ক্রমান্বয়ে নিজ ভূমি থেকে উদ্বাস্তু হতে থাকে। কমতে থাকে বরিশাল অঞ্চলের রাখাইনপাড়াগুলো। নিচের সারণিতে (সারণি-২) আমরা দেখার চেষ্টা করব ১৯০০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বরিশাল অঞ্চলের রাখাইনপাড়ার অবস্থা।

সারণি-২ : বরিশাল বিভাগে রাখাইন বসতির পরিবর্তনচিত্র

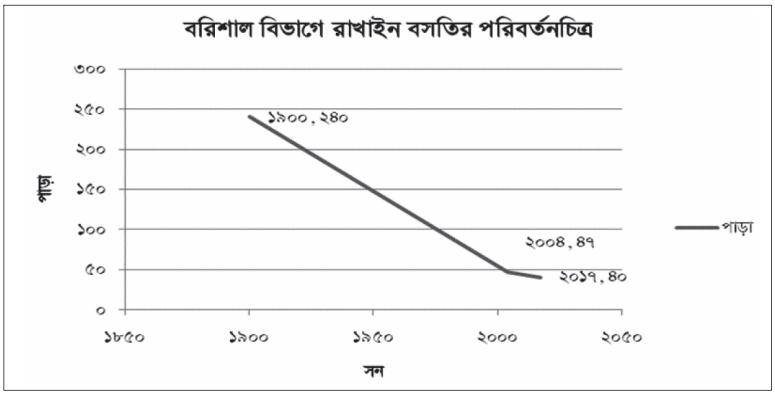

চিহ্নিতকরণের এক ঔপনিবেশিক কায়দা দেশে প্রবলভাবে বহাল আছে। আদিবাসী জনগণকে 'উপজাতি' বলা বা রাখাইনদের 'মগ' নামে চিহ্নিত করা। এ প্রসঙ্গে রাখাইন জন-ইতিহাস গবেষক মংতাহান বলেন, যে জাতি খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪ শতক থেকে খ্রিষ্টাব্দ ১৮ শতক পর্যন্ত আনুমানিক পাঁচ হাজার বছরের বেশি এক সুদীর্ঘকালের সার্বভৌম রাখাইন রাজ্যের স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই রাখাইন জাতিকে এক বর্বর অশিক্ষিত মানবগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে 'মগ' উপাধিতে ভূষণের দ্বারা ভারতের ইতিহাসশাস্ত্র মহাপণ্ডিতগণ চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন। 'মগের মুল্লুক' নামে কটাক্ষমূলক প্রবাদবাক্য সৃষ্টি করে অকারণে রাখাইন জাতিকে হেয়প্রতিপন্ন করেছে। স্থানীয়ভাবে সরকারি কাগজপত্রে বাংলাদেশের উপকূলের রাখাইনদের সচরাচর 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী', 'সংখ্যালঘু জাতিসত্তা' হিসেবে উল্লেখ করতে দেখা যায় না। অধিকাংশ দলিলে 'রাখাইন সম্প্রদায়'[৭] প্রত্যয়টির ব্যবহার দেখা যায়। মংতাহানের লেখা থেকে জানা যায়, বরগুনার বাজাসং (নলী পয়দা) গ্রামের চক্রাফ্রু চৌধুরী ব্রিটিশ উপনিবেশকালে সরকার থেকে একটি জমিদারি ইজারা নিতে পেরেছিলেন। ১৭৮৪ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বরগুনা ও আমতলী থানায় ৯৩টি রাখাইন গ্রাম ছিল। এর মধ্যে আমতলীতে ৬৯টি এবং বরগুনা থানায় ২৪টি। ১৯০০ থেকে ১৯৪৮ সালে দেশভাগের পর গ্রামসংখ্যা ভয়াবহভাবে কমতে থাকে। আমতলীতে ৪৮টি এবং বরগুনায় ৯টি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৯১ সালে আমতলীতে ১৩টি এবং বরগুনা সদর উপজেলায় ১টি। ১৯৯১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত আমতলীতে ১৩টি এবং বরগুনা সদরে ১টি রাখাইনপাড়া দেখা যায়। ১৭৮৪ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত পটুয়াখালীর গলাচিপা ও কলাপাড়ায় ১৪৯টি রাখাইন গ্রাম থাকলেও ২০০৪ সালে দেখা যায়,

গলাচিপায় মাত্র ৫টি এবং কলাপাড়ায় ২৮টি রাখাইনপাড়ার অবশেষ আছে। ব্রিটিশ উপনিবেশকালে বরগুনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলে রাখাইন জনসংখ্যা প্রায় ১ লাখ হলেও ২০০৪ সালে এসে দাঁড়ায় প্রায় ৪ হাজার ৫০০। ২০০৭ সালের প্রলয়ংকরী সিডরের পর বরগুনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলের রাখাইন জনগণ সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর সিডরবিধ্বস্ত বরিশাল বিভাগের রাখাইন জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন করেছিল। সেই আবেদনপত্রে[৮] তারা জানায়, কালের বিবর্তনে দুই শতাধিক রাখাইনপাড়ার মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৪৬টি পাড়া এবং ৪০ হাজারের অধিক রাখাইনের মধ্যে মাত্র ৫ হাজার টিকে আছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আদিবাসী জনগণের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র উন্নয়ন কর্মসূচির ফ্রেমওয়ার্ক (৩য় পর্যায়) প্রতিবেদনে[৯] উল্লেখ করা হয়েছে, রাখাইনরা পটুয়াখালী, বরগুনা ও কুয়াকাটায় বসবাস করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (২০১১) 'জনসংখ্যা ও গৃহায়ণ' শীর্ষক জরিপ প্রতিবেদন[১০] অনুযায়ী, বরগুনা জেলায় মোট রাখাইন জনসংখ্যা ১ হাজার ৫৯ জন। এর মধ্যে নারী ৫৭৮ এবং পুরুষ ৫৬৫ জন। বরগুনার আমতলী উপজেলায় ১ হাজার এবং বরগুনা সদরে ৫৯ জন রাখাইন জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে আমতলী উপজেলার বড়বাগী ইউনিয়নে ৬৩৫ জন, নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নে ১৮২ জন, সোনাকাটা ইউনিয়নে ১৬৮ জন এবং বরগুনা সদরের বালিয়াতলী ইউনিয়নে ৫৯ জন।

পাশাপাশি পরিসংখ্যান ব্যুরোর (২০১১) 'জনসংখ্যা ও গৃহায়ণ জরিপ' প্রতিবেদনে[১১] পটুয়াখালী জেলার রাখাইনদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ১ হাজার ৩১০ জন। এর মধ্যে গলাচিপা উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে ৮৭ জন, কলাপাড়া উপজেলায় ১ হাজার ২০১ জন, কুয়াকাটা উপজেলায় ১৪৫ জন এবং পটুয়াখালী সদরে ২২ জন। কলাপাড়া উপজেলার কলাপাড়া পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ১১ জন এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ২১ জন, বালিয়াতলী ইউনিয়নে ২৪৬ জন, ধূলাসর ইউনিয়নে ১৮৬, লতাচাপলী ইউনিয়নে ৪৮৩ জন, লাউয়া ইউনিয়নে ১৩ জন এবং মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে ২৩ জন। কুয়াকাটা উপজেলার কুয়াকাটা পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ১০৯ জন এবং টিয়াখালী ইউনিয়নে ৯১ জন। পাশাপাশি পটুয়াখালী সদর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ২২ জন রাখাইন জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে। 'জনসংখ্যা ও গৃহায়ণ জরিপ (২০১১)' অনুযায়ী বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় রাখাইনদের মোট জনসংখ্যা ২ হাজার ৩৬৯ জন। আমরা নিচের সারণিতে (সারণি-৩) দেখার চেষ্টা করব বরিশাল বিভাগের হারিয়ে যাওয়া ও টিকে থাকা রাখাইনপাড়ার অবস্থা।

সারণি : ৩ : সালভিত্তিক বরিশাল বিভাগের হারিয়ে যাওয়া ও টিকে থাকা রাখাইনপাড়ার তালিকা[১২]

এলাকার নাম (বরিশাল বিভাগ)		সালভিত্তিক হারিয়ে যাওয়া রাখাইনপাড়ার নাম		টিকে থাকা
		১৯৪৮	১৯৯২	২০০৪-২০১৭
পটুয়াখালী	কলাপাড়া	মাছাখালী, লুনডা, জি ক্যোয়ান, কংলাঅং পাড়া/কলা পাড়া, তাদ্রাইকুন, মুইচামাশন/ মধুখালী, নাপ্রিকুন, রোয়াক্রীকুন, কানব্রানশে, মনোসেপাড়া, কাপড়া (খাপড়াভাঙ্গ, ঙায়েসেমি পাড়া, নাউতো মাতবরপাড়া, পোউদোনপাড়া, মংফ্রুউপাড়া, ম্রাচাউপাড়া, রানঅংপাড়া, চানথাঅং মাতবুরপাড়া (থয়ক্যো)	নেশাবাড়ী, মরিচবুনিয়া বড়পাড়া, মরিচবুনিয়া আগাপাড়া, সানচাখালী, নিজংপাড়া, ঔটন, নোমাকুন, নোবানঅং, ছোট ডুমাশন, পানজেনফা, লামিঅং রায়মাহের, মংচাউ, চয়নো, রজ, বেমাগাইন, চাকানদো, কাবাইনশন, মংলাঅংফা, সংওয়া রওয়া, রেপুন, তুনথাশন, প্রোয়খংকুন, মাফ্রুসাই রওয়াহং, লাইসেথুন, লেয়াসে নয়াপাড়া, তুনছন রওয়া, কান ব্রেনসে, কানব্রেন ক্রী, নিমাশং, কানকুনি, বলী পাড়া, প্রাইলী খোও, দোখাইপাড়া, আমুইশে কেরানীপাড়া, মংমেপাড়া, ডাংশন, বেবিজ্যা, রওয়াচেকে, চাফংপাড়া, খামংগুন, দ্বৈয়পন, নয়া দ্বৈয়পনপাড়া, নাফ্রুপাড়া, লোপানশং, আচালাউথাপাড়া, নয়া আচালাউথাপাড়া, কায়াচং, চোগুন, তোখামাজং বড়পাড়া, তোখামাজং ছোটপাড়া, ক্রংসে পঞ্চায়েদপাড়া, চাউটং, রাওমা (কুয়াকাটা পুরানপাড়া), চাকানদো, সামফ্রুপাড়া, বিলাতপাড়া, নংফোপাড়া, কালায়েপাড়া, চেয়েগ্রেরা, ফানটিপাড়া, চানথয়অং মাতুব্বরপাড়া, কুনগ্রী, চাজেপাড়া, কুনব্রান, ঙেসুইকুন/মিশ্রীপাড়া, ঙেসুইকুন নয়াপাড়া, ছোট ঙেসুইকুনপাড়া, সংসাজাই, ফাআইশেপাড়া, পুন্নামাপাড়া, টংসেপাড়া	খ্রাওরাদান/ছয়ানীপাড়া, ডুমাশন/বড়সোনাপাড়া, চক্রাফ্রু (নাচানাপাড়া), খেপুপাড়া/কলাপাড়া, খেপুপাড়া নয়াপাড়া, আবাগক্ত/মেলাপাড়া, বৌলতলীপাড়া, ক্রিনখেটশন/বেতকাটা, লেয়াদাই/ বালিয়াতলীপাড়া, কানপানী/সোনাপাড়া, মাফ্রুসেই/পক্ষিয়াপাড়া, আবাদী রাউমাসং/তুলাতুলী, ঔটন/পাঞ্জু পাড়া, ক্রোয়দোশং/মধুপাড়া, প্রোয়ানশে/হারিপাড়া, চিংগ্রীপাড়া, প্রানগ্রী, কেরানীপাড়া/কুয়াকাটা, পঞ্চাপাড়া/কুয়াকাটা, খাজরীবুনিয়া/নায়রীপা, মংথয়পাড়া, অংসানচা/ নয়াপাড়া, থঞ্জুপাড়া, কুচারেশং/ দিওরআমখোলা, ঙেসুইকুন/মিশ্রীপাড়া, উনলাসং/লক্ষ্মীখাল, প্রাতারেসং/আমখোলা, গেন্ডারওয়া/ কালাচানপাড়া

এলাকার নাম (বরিশাল বিভাগ)		সালভিত্তিক হারিয়ে যাওয়া রাখাইনপাড়ার নাম		টিকে থাকা
		১৯৪৮	১৯৯২	২০০৪-২০১৭
পটুয়াখালী	গলাচিপা	গেন্ডারান (চর কুকরী), গংক্রী পাড়া (রাঙ্গাবালী), নয়ামাঝি পাড়া, চিংফ্রুপাড়া, হিংগরী বুনিয়া, সৈজাউ কবিরাজ পাড়া, পাল্সিকাড়া, চানদ্বৈয়চা পাড়া, বাইলাবুনিয়া, জারাইটং, পাউপুফা পাড়া, বুড়ংখা পাড়া, জীতালেন, কাড়াখালী পুরান পাড়া, গাবুনিয়া, ঙাটেনরা, সানখৈবট পাড়া, ছয়নম্বর পাড়া	ফেলাবুনিয়া/বাইশদিয়া, চাচেপাড়া/বাইশদিয়া, ছোট কানকুনীপাড়া, কাপাইক্যোন গোড়াপাড়া, আয়ংফাপাড়া	কাড়াখালী/বাইশদিয়া, কানকুনীপাড়া, মংফ্রুসেইপাড়া, ছাতুনসেইপাড়া, কাপাইক্যোন/ উনত্রিশনং
বরগুনা	আমতলী	নিয়ংওয়েনপাড়া, গানতলীপাড়া, নিয়ংশাইনপেপাড়া, বেথীপাড়া, মাচিংনোপাড়া, দুন্সীপাড়া, ফ্রেলাঅংপাড়া, তাব্রিগুন, মেচাদাই, লেখেট্রেমাপাড়া, মেনীপাড়া, টন্ দেন্পাড়া, কান্ চাউপাড়া, তাওয়েন সং, প্রাসংরওয়া, টনচারাওয়া, ছামরাপাড়া, কাবুপাড়া,	বাইজারা, নিউপাড়া, ফ্রুসেপাড়া, সাদংপাড়া, কিন্দ্রাপাড়া, লামিওপাড়া, ম্রাদোসং, মংমেপাড়া, কাজীখালপাড়া, নোথয়উপাড়া, ম্রাইনাহ রওয়া, তালাপাড়া, হরিণখাল/চন্দোঅংপাড়া, ক্রোন্দানপাড়া, চাফ্রুংপাড়া, ছকীনা বড়পাড়া, এদেকেপাড়া, ত্যানবুন্দো, নেয়ংপানলা, পুনজাখালা, সেউপাড়া, নলবুনিয়া বড়পাড়া, নলবুনিয়া ব্রানপাড়া, নলবুনিয়া ডুপাইনপাড়া, চুয়ানসে কান, পানফুপাড়া, মৌরাবী, চানচাসেপাড়া, ছাইরোকিয়া/ সুইবানপাড়া, পাজড়াভাঙ্গা, লংপ্যে সং, নাথরীপাড়া, নাথোঅংপাড়া, ফুমাসেরওয়া, বড়াইতলী, মংনামাসে	রাউমাসং/গড়ঠাকুরপাড়া, গান্দামা/সওদাগরপাড়া, বেতলীয়/কবিরাজপাড়া, বোধীকুন/লাউপাড়া, সারাকুন/নামিশেপাড়া, তাঁতীপাড়া, খাডাউসং/অংকুজানপাড়া, ত্যুনছোনরওয়া/ আগাঠাকুরপাড়া, মংমিশেপাড়া, মংনামাগ্রী (তালুকদারপাড়া), চিংদন (ছাতনপাড়া), তালতলীপাড়া

এলাকার নাম (বরিশাল বিভাগ)		সালভিত্তিক হারিয়ে যাওয়া রাখাইনপাড়ার নাম		টিকে থাকা
		১৯৪৮	১৯৯২	২০০৪-২০১৭
বরগুনা	তালতলী (বরগুনা থানা)	দাবরুপেরান পাড়া, পালাইপ্রায় মোথেই রওয়া/ ঠোকাপাড়া, বাজাসং চক্রাফ্রু চৌধুরী পাড়া/ নলী পয়দা, বাজাসং গড়া পাড়া, বাজাসং আগা পাড়া, দুপাই রওয়া, ম্রাইনাঃ রওয়া, নিশন বাড়িয়া, পরীর খাল, স্বৈয়টানসং/ লতাকাটা, বানতলী/ বাঁশামত পাড়া, বোধীসং/ পাতাকাটা, বোধীসং/ আগাপাড়া, জীপেনক্রী/ চরপাড়া, আমলতলী	বড়বালিয়াতলী গড়াপাড়া, বড়বালিয়াতলী আগা পাড়া, পালাইপ্রায় গড়া পাড়া, আওয়া রওয়া /ছোট বালিয়াতলী গোড়া পাড়া, সংফিয়া রওয়া/ছোট বালিয়াতলী আড়া পাড়া, নাসেউ রওয়া/তালতলী গোড়াপাড়া, তালতলী আগা পাড়া,	বড়বালিয়াতলী পাড়া

আলাপের এই পর্যায়ে আমাদের দেখা জরুরি বাংলাদেশের রাখাইন জনগণ এবং উপকূলের রাখাইনদের ভূমিসংকট বিষয়ে কী ধরনের গবেষণা বা দলিলের নজির আছে। ড. আবুল বারকাত ও অন্যরা 'উপকূলীয় জীবন-জীবিকার অর্থনৈতিক ঝুঁকি'বিষয়ক এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে[১৩] দেখিয়েছেন, উপকূলীয় অঞ্চলের রাখাইনদের প্রধান বসতি পটুয়াখালী, বরগুনা, আমতলী ও কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ। ভিন্নভাবে রাখাইনদের জীবন-জীবিকার অর্থনৈতিক ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ না করলেও তারা জানিয়েছে, অধিকাংশ রাখাইনই ভূমিহীন এবং দিনমজুরি ও ছোট ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে।

শেখ সালেহ আহাম্মদ (২০১০) 'কক্সবাজার এলাকায় পর্যটনের প্রভাব' শীর্ষক এক বিদ্যায়তনিক সমীক্ষায়[১৪] জানান, রাখাইনরা কক্সবাজার অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন জনগোষ্ঠী। তবে পর্যটন প্রসারের কারণে তারা বর্তমানে 'ক্ষুদ্র' জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ পর্যটক কক্সবাজার আসেন এবং তাঁদের সেবা ও বিনোদনে গড়ে ওঠা বাণিজ্যের কারণে রাখাইনদের ভূমি দখল হচ্ছে। চিয়ান্দা মিঠাছড়ি উচ্চবিদ্যালয় ছিল রাখাইনদের, আজ যা বাঙালিদের দখলে চলে গেছে। বাইতুস শরাফের মতো স্কুল, বাহারছড়া আবাসিক এলাকা রাখাইনদের ভূমি জবরদখল করে তৈরি হয়েছে। বাইল্যাপাড়া ও গোনারপাড়ার জাদিগুলোও দখল হয়ে গেছে।

ড. জগন্নাথ বড়ুয়া 'বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান' শীর্ষক এক প্রবন্ধে[১৫] বলেন, বর্তমান সময়ে কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা অঞ্চলে রাখাইন বৌদ্ধদের বসতি হীন থেকে হীনতর হচ্ছে। এমন সময় আসবে, এসব অঞ্চলে কোনো রাখাইন বৌদ্ধ পরিবারের বসতি থাকবে না, থাকবে না কোনো বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধসংস্কৃতি।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (২০০৪) বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের অবস্থাবিষয়ক এক প্রতিবেদনে[১৬] দেখা যায়, সেখানে একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে এমন 'আপনার বিভাগে গরিব মানুষের দারিদ্র্যের ভেতরের কারণগুলো কী কী?' প্রতিবেদনের একটি অংশে 'অন্যান্য জনগোষ্ঠীর (আদিবাসী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়)' অবস্থা স্পষ্ট করতে বলা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, পটুয়াখালী ও বরগুনার রাখাইনদের হস্তচালিত তাঁত এবং বুননশিল্প ধীরে ধীরে বিলীন হচ্ছে। কারণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নাই, নিরাপত্তহীনতা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং প্রভাবশালী কর্তৃক রাখাইন ভূমি দখল। তরুণ সাংবাদিক বায়েজীদ হোসেন (২০১৬) কক্সবাজারের রাখাইনদের ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পভিত্তিক পেশার মালিকানা বদলে যাওয়ার পেছনে অ-রাখাইন কর্তৃক রাখাইন ভূমি দখলকে একটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।[১৭]

বায়োটেক কনসার্ন নামের একটি বাণিজ্যিক জেনেটিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মো. শহিদুর রহমান ও জাহিদ ইকতিয়ার এবং ঢাকার নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের মো. মাসুদ রানা পটুয়াখালীর রাখাইন ও বান্দরবানের চাকমাদের মোট ১২৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের রক্তনমুনা নিয়ে একটি বংশগতিধারা-বিষয়ক জেনেটিক গবেষণায়[১৮] জানান, উল্লিখিত জনগোষ্ঠীর ভেতর জেনেটিক বংশগতিতে মিল আছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের নারী ও কিশোরীদের অভিযোজন সক্ষমতাবিষয়ক জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির এক 'পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা

পরিকল্পনা' শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাবে[১৯] দেখা যায়, বিষয়টি জানতে সাতক্ষীরার মুন্ডাদের পাশাপাশি তাঁরা বরগুনার বড়বগী ও পটুয়াখালীর লতাচাপলী ইউনিয়নের রাখাইনদের সঙ্গেও সভা করেছেন। সেখানে রাখাইনদের জলবায়ু পরিবর্তনে চরম বিপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করলেও বিস্ময়করভাবে 'ভূমিসংকট' রাখাইনদের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়নি।

রহমউল্লাহ ও অন্যরা (২০১৪) পটুয়াখালীর রাখাইনদের এক জন-উদ্ভিদ বিবরণে মাত্র ১৫টি গাছের জন-উদ্ভিদ বিবরণ দিয়েছেন। রাখাইনদের কাছ থেকে পূর্বসম্মতি নেওয়ার বিষয়টি গবেষণা[২০] প্রবন্ধে উল্লেখ করলেও কোনো গাছের নামের ক্ষেত্রে রাখাইন নাম ব্যবহার করেননি এবং বারবার রাখাইনদের একটি 'বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সানজিদা হক পটুয়াখালীর কুয়াকাটার গোড়া আমখোলা রাখাইন আশ্রয়ণকেন্দ্র ও অভিযোজনবিষয়ক এক বিদ্যায়তনিক গবেষণায়[২১] জানান, আশ্রয়ণকেন্দ্রে রাখাইনদের ঐতিহ্যগত গৃহনির্মাণরীতি মানতে হবে। এটি উপকূলীয় দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম। গোড়া আমখোলার উদাহরণ টেনে তিনি দেখান, এখানে ১০৭টি পরিবারের মধ্যে রাখাইন পরিবার ৪৭টি। আগে এখানে ১৫০টি রাখাইন পরিবার ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নিরাপত্তাহীনতায় অনেক রাখাইন পরিবার 'আরাকানে' চলে গেছে। ২০১২-১৩ সালের মাঠপর্যায়ের দলীয় আলোচনা থেকে এ তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন।

তথাকথিত মূলধারার গবেষণায় কুয়াকাটা ও কক্সবাজারের বিনোদন বলতে 'রাখাইনদের নাচ-গান ও তাদের বাজারকেও' বোঝায়। পর্যটনের জন্য রাখাইন সংস্কৃতিকে এক 'বিশেষ বিনোদন'[২২] উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। কক্সবাজারের পর্যটনবিষয়ক এক বিদ্যায়তনিক গবেষণায়[২৩] মো. মাসুদুর রহমান (২০১০) জানান, কক্সবাজারের রাখাইন নারী উম্মা রাখাইন ঐতিহ্যগত শিল্পপণ্য দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন ১৯৫৫ সালে এবং আশির দশকে পর্যটনের সঙ্গে এই রাখাইন হস্তশিল্পের একটা যুক্ততা তৈরি হয়। তবে গবেষণাকালীন মো. মাসুদুর রহমান দেখতে পান, রাখাইনদের ঐতিহ্যগত হস্তশিল্পজাত ব্যবসা বাঙালিদের দখল ও নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে এবং একটা বড় বাণিজ্যে রূপ নিচ্ছে। তাঁর গবেষণায় দেখা যায়, রাখাইন প্রবীণজনেরা কোনোভাবেই চান না, রাখাইন সংস্কৃতি বাণিজ্যিকভাবে পর্যটন প্রসারে একতরফা ব্যবহৃত হোক।

অপূর্ব কৃষ্ণ দেব (২০০৯) উপকূলের মৎস্যকেন্দ্রিক জীবনধারা-বিষয়ক তাঁর বিদ্যায়তনিক গবেষণায়[২৪] দেখান, জেলেদের ভেতর ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তা মাছ ধরা থেকে সংরক্ষণে বেশ কিছু পার্থক্য তৈরি করে। মেইনথিন প্রমীলার (২০১৭) একটি লেখা[২৫] থেকে জানা যায়, ১৭৮৪-১৯০০ সালের দিকে বরিশাল

উপকূলীয় অঞ্চলে ৫০ হাজারের ঊর্ধ্বে রাখাইন বসবাস করত। ১৯০০-১৯৪৮ সালে এই সংখ্যা হয় ৩৫ হাজার। ১৯৯০ সালে ৪ হাজার। ২০১৪ সালে কারিতাস বরিশাল অঞ্চলের ইন্টেগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইসিডিপি-রাখাইন) জরিপ অনুযায়ী অত্র উপকূলীয় অঞ্চলের রাখাইন জনসংখ্যা প্রায় ২ হাজার ৫৬১। মোট ২৩৭টি রাখাইন-অধ্যুষিত পাড়া যার মধ্যে পটুয়াখালীর ১৪৪টি (১৭৮৪-১৯৮৪) রাখাইন-অধ্যুষিত পাড়া বা গ্রামের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৩২টি (কলাপাড়া ২৮ + গলাচিপা ৪, ২০১৫ খ্রি.) গ্রাম এবং বরগুনার ৯৩টি (১৭৮৪-১৯৮৪ খ্রি.) রাখাইনপাড়া বা গ্রামের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ১৩টি গ্রাম রয়েছে।

রাখাইনদের ভূমিসংকট নিয়ে সাংবাদিক বিপ্লব রহমান 'রাখাইনরা কেন দেশ ছেড়ে যায়' নামে সচিত্র প্রতিবেদন[২৬] করেছেন। এ ছাড়া পটুয়াখালীর রাখাইনদের নিয়ে মুস্তফা মজিদসহ অনেকেই বিদ্যায়তনিক অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। প্রকাশিত হয়েছে বাঙালি পুরুষের চোখে দেখা রাখাইন জনগোষ্ঠীর 'এথনোগ্রাফ'। রাখাইনদের তাঁত থেকে শুরু করে তাদের ডিএনএ অবধি বাঙালিদের গবেষণার বিষয় হয়েছে। উল্লিখিত গবেষণা, উপাত্ত ও দলিলসমূহ যে দৃষ্টিভঙ্গিই ধারণ করুক না কেন, এসব দলিল প্রমাণ করেছে দেশের উপকূলে আদিসভ্যতা স্থাপন করেছে আদিবাসী রাখাইনরাই। প্রশ্ন হলো, রাখাইনরা কেন নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হলো? ভূমিযন্ত্রণাই কেন রাখাইনদের জীবনের কেন্দ্রনিয়তি হয়ে দাঁড়াল? চলতি আলাপখানি মূলত উপকূলের রাখাইনদের এই ভূমিসংকটকেই বুঝতে চেয়েছে রাখাইন জনগণের ভূমিদর্শন ও ভূমিজীবন থেকে। আর এ কারণেই এক প্রচলিত রাখাইন প্রবাদের সাথি হয়ে আলাপখানি বোঝার চেষ্টা করেছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা, বাঙালি জাত্যভিমান এবং আদিবাসী রাখাইন জীবনের ভূমিপ্রশ্নকে। উপকূলে চলমান অধিপতি উন্নয়ন-বাহাদুরি ও রাখাইন জনগণের ভূমিযন্ত্রণা বুঝতে চলতি লেখায় একটি প্রচলিত রাখাইন প্রবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। উপকূলের রাখাইনদের ভূমিসংকটকে এক প্রচলিত রাখাইন প্রবাদের ময়দান থেকেই বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখাটি উল্লিখিত এলাকার প্রবীণ রাখাইন নারী ও পুরুষদের স্মৃতি-আখ্যানকে মূলসূত্র ধরে এ প্রজন্মের রাখাইনদের ভূমিযন্ত্রণা খোঁজার চেষ্টা করেছে। রাখাইন জনগণ, উল্লিখিত অঞ্চল ও বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নানা দলিল, নথি, প্রত্নস্থল, রাখাইনদের আদি ও দখল হয়ে যাওয়া বসতিস্থল, এলাকার বাঙালি, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকর্মীদের ভাষ্য লেখাটির নানা সূত্র বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একক ও দীর্ঘ সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, অভিযোগ ও তর্ক এবং অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণপদ্ধতির ভেতর

দিয়েই চলতি লেখার তথ্যসমূহ নথিভুক্ত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

কী সেই রাখাইন প্রবাদ?

উপকূলের রাখাইন জনগোষ্ঠীর ভূমিসংকট বুঝতে চলতি আলাপখানি একটি রাখাইন প্রবাদের সাথি হয়েছে। নিম্নবর্গের কথা, আখ্যান, দর্শন, উপস্থাপন নিয়ে নানান তর্ক-বাহাস আছে। গবেষক ডিভাটিন (২০০৯) নিম্নবর্গের এই কথকতার পরিধি ও ব্যাপকতা তুলে ধরে বলেছেন, ঐতিহ্যগতভাবে কথকতা মানবসমাজের রূপকে তুলে ধরে যা সমাজের সদস্যদের আবেগ, চিন্তা, সাংস্কৃতিক ধারাকে আশ্রয় করে বাহিত হয়। সমাজের সব সদস্যের দায়িত্ব হলো, কথকতা ও সামাজিক স্মৃতিকথা থেকে বিস্মৃত না হওয়া, একে সচল রাখা। ব্যাপক অর্থে কথকতা সামাজিক স্মৃতিগুলোকেই বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তি ও চর্চার ভেতর দিয়ে 'সংস্কৃতি' হিসেবে রূপ দেয়[২৭]। 'প্রবাদ-প্রবচন' গ্রামীণ নিম্নবর্গের এমন এক সৃষ্টিশীল উপস্থাপনা যার ভেতর দিয়ে পরিবর্তনের রাজনীতি ও দর্শন নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সব সমাজের মতোই রাখাইন সমাজেও নানাভাবে প্রবাদ-প্রবচনের চর্চা হয়। এটি প্রায় সব সমাজের মতোই এক কাতারে সবার মাঝে সমানভাবে চর্চিত থাকে না। রাখাইন ভাষায় প্রবাদ-প্রবচনকে বলে 'চগর-চগরা'[২৮]। চলতি আলাপখানি রাখাইন ভূমিসংকট বুঝতে এমনি এক রাখাইন চগর-চগরাকে পাঠ করেছে। দেখা যাক, এই রাখাইন প্রবাদখানি আমাদের কী জানান দেয় :

ছেগ্রী ছেকে মানিলীগে, সংগ্রী ম্রংগ্রী টিংলীমে
ত্যেনফো মাহৌ বরাবৌনেহ লাঃলীমে।
আনাউ মাহ ত্বেনফু, আরেহ মাহ ডাঃজা।
ত্বেনফ্যু মাহ মল্যুলীগে চুয়েন ফ্রাইলীমে
ডাঃজাকো নেলো লাঃলী স্যানত্যালীমে।
ক্রেইসে কাঃ তোওয়ান লুসে মোওয়ান
চাপলী ক্যানছাই চোওয়ান মাহ, ম্রো তাম্রো।

(বাংলা অর্থ : যখন চারদিকে বড় বাঁধ নির্মাণ হবে, তখন আশপাশের সব বড় খাল ও নদীনালা ভরাট হয়ে যাবে। এমন হলে সেখানে আর বসবাস করা যাবে না। সেখান থেকে চলে যেতে হবে। জাহাজ নয়, সমুদ্রগামী পালতোলা বড় নৌকায় করে যেতে হবে। পশ্চিমে পাতানো চাটাই আর পূর্বে শাণিত ঢাল-তলোয়ার। শাণিত তলোয়ার-ঢালে পাড়া দিয়ে যাবে তাহলে সুখশান্তি মিলবে। কিন্তু চাটাইয়ের ওপর হেলান দিয়ে আরাম করলে অলস হবে এবং দুঃখ পাবে। ক্যানছাই চোওয়ান নামে দেখো চাপলির এক নতুন নগরে মোরগ ডাকে আর মানুষ আরামে ঘুমায়।)[২৯]

রাখাইনদের ভেতর অনেকেই বিশেষত প্রবীণজনেরা উল্লিখিত এই রাখাইন প্রবাদ-ভাষ্যকে তাঁদের একটি ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশিকা হিসেবে বিশ্বাস করেন। যদিও নতুন প্রজন্মের এই প্রবাদ সম্পর্কে অভিমত[৩০] ভিন্ন। কিন্তু সবাই একমত এই প্রবাদখানি একটি পরিবর্তনকে ইশারা করেছে এবং এর ফলে উপকূল রাখাইনদের আবাসভূমিতে প্রতিবেশগত কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, তা-ও ইঙ্গিত করেছে। সবকিছু মিলিয়ে পুরো পরিস্থিতি যে আর রাখাইন জনগোষ্ঠীর জন্য বসবাসযোগ্য থাকবে না বা থাকছে না, তারও নির্দেশনা এখানে আছে। তার মানে উপকূলীয় রাখাইনরা ঐতিহাসিকভাবেই এ রকম উন্নয়ন-যন্ত্রণা সামাল দিয়েছেন। বাঁধ বা অন্যান্য দখলদারত্বের মাধ্যমে তাঁদের সভ্যতাকে তছনছ করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা উচ্ছেদ হতে বাধ্য হয়েছেন। প্রবাদখানির শেষের দিকে ক্যানছাই চোওয়ান নামের স্থান আছে। এখন বাঙালিরা পটুয়াখালীর এই রাখাইন অঞ্চলের নাম দিয়েছে 'কুয়াকাটা'। বাংলাদেশের উপকূলের রাখাইনদের বসতি স্থাপন ও স্থানান্তরের ইতিহাস বিশ্লেষণেও দেখা যায় পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী দ্বীপ থেকে রাখাইন বসত উচ্ছেদ হয়ে ক্রমান্বয়ে কুয়াকাটার দিকে নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে।

গবেষক ও লেখক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের আগ্রহ ছিল নানা কিছু, জন-ইতিহাস থেকে ভাষার নৃবিজ্ঞান অবধি। প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে তাঁকে নানা সময়ে আদিবাসী জনগণের অধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে দেখা গেছে। তিনিই বাংলাদেশের প্রথম বিচারপতি, যিনি আদিবাসী ভাষাগুলো নিয়ে লিখেছেন। লেখাগুলো প্রথমে দৈনিক *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে প্রথমা প্রকাশন থেকে *বাংলাদেশের নানান ভাষা* নামে বইটি বের হয় ২০১৪ সালে। উল্লিখিত লেখায় তিনি রাখাইন ভাষাকে মারমা ভাষার 'উপভাষা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর লেখাটি *প্রথম আলো*র অনলাইন সংস্করণে প্রকাশের পর একই তারিখে মং হ্লা প্রু পিন্টু একটি মন্তব্য করেন। পিন্টু লিখেন, রাখাইন বলতে আমরা বুঝি একাধারে একটি জাতির নাম, একটি ভাষার নাম এবং সর্বোপরি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাম (১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)। বহির্বিশ্বের কাছে রাখাইনদের পিতৃভূমি 'রাখাইন-প্রে' আরাকান নামে সমধিক পরিচিত। এটি এখন মিয়ানমারের একটি প্রদেশ (রাখাইনপ্রেনে) মাত্র। রাখাইন ভাষায় প্রে মানে রাষ্ট্র আর প্রেনে মানে প্রদেশ। ...এর থেকে সহজেই বুঝে নেওয়া যায় যে, কোনটা উপভাষা আর কোনটা মূল ভাষা, কারা জাতি আর কারা উপজাতি।[৩১]

মূলধারার অনেক গবেষক ও লেখক তাঁদের লেখায়[৩২] বাংলাদেশের রাখাইন জাতিসত্তাকে এক 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য' হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন। অধিপতি

বাঙালির মনস্তত্ত্বে 'রাখাইন' জাতিসত্তার সঙ্গে মিশে থাকে 'মগ জলদস্যুতা' এবং অনেকেই[৩৩] প্রবলভাবে এটি বিশ্বাস করেন যে সমুদ্র উপকূল একসময় এই 'মগ জলদস্যুরাই' শাসন করত ও দখলে রেখেছিল। এমনকি রাষ্ট্রীয় ইতিহাসগ্রন্থনেও রাখাইন জনগণের সঙ্গে মগদের টেনে এনে তাদের দস্যুতা ও লুণ্ঠনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারি তথ্য বাতায়নের[৩৪] ভাষ্যমতে, মোগল যুগে পায়রা নদীতে মগ, পর্তুগিজদের লুণ্ঠন ও অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল। অরণ্য আচ্ছাদিত দুর্গম আমতলী আমপারিট মগ নামের এক মগ দলপতি ইংরেজ সরকার থেকে ইজারা নিয়ে আবাদ শুরু করে এবং তার নামে বরগুনার আমতলীর নাম হয়। দীর্ঘ সময় উপনিবেশিত থাকা ও উপনিবেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সব মিলিয়ে বাঙালি মনস্তত্ত্বে[৩৫] নিদারুণভাবে পশ্চিমের সাদা 'ফিরিঙ্গিদের' সঙ্গে 'মগরাও' একাকার হয়ে যায়। পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজারের গরিষ্ঠভাগ বাঙালি এখনো মনে করেন রাখাইনরা সেই 'কথিত জলদস্যু মগ'। এমনকি রাষ্ট্রীয় দলিল ও প্রশাসনিক নথিতে উপকূলের রাখাইনদের নামের পরে 'মগ' পদবিখানাই যুক্ত আছে। 'মগের মুল্লুক' একটি জনপ্রিয় বাংলা প্রবাদ। একেবারে শিশু বয়সে বাংলা ব্যাকরণ পাঠে এটি শিখতে হয়। মগের মুল্লুক মানে 'যেখানে কোনো আইনকানুন নেই, স্বেচ্ছাচার ও জুলুম বজায় থাকে'। ঢাকায় আদিবাসী জাতির নাম বহন করে বেশ কিছু অঞ্চল আজও টিকে আছে। তেজতুরি বাজার, মণিপুরী পাড়া ও মগবাজার। প্রবীণজনেরা বলে থাকেন 'মগদের' বাজার বসত বলেই নাম হয় 'মগবাজার'। রাখাইন জাতিসত্তাই সেই ঐতিহাসিক মগ কিনা কিংবা 'মগদের' নিয়ে লুণ্ঠনবাজিতার যে কাহিনি প্রায় 'মিথ' হয়ে আছে তা নিয়ে কোনো জোরালো প্রমাণসাপেক্ষ নথি বা বিশ্লেষণ নেই। মান্দিদের 'গারো', লালেংদের 'পাত্র' বা আদিবাসী জনগণকে 'উপজাতি' নামে অভিহিত করার মতো এই 'মগ' বা 'রাখাইন' পরিচয়খানা কোনো ঔপনিবেশিকতা ও অপরত্বের রাজনীতি বহাল রাখছে কি না, এ নিয়েও কোনো আলাপ ধারেকাছে পাওয়া যায় না। চলতি আলাপের সমুদ্র উপকূলীয় রাখাইন জনগণ সেই কথিত 'লুটেরা জলদস্যু' রাখাইন কি না, জানি না। তবে প্রশ্নহীনভাবে এই জনগণ নিজেদের জন্মমাটি ও বসতি অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। স্বাধীন রাষ্ট্রে একের পর এক রাখাইন গ্রাম, ধর্মস্থল, শ্মশান, পুকুর, জমি, খেলার মাঠ, পবিত্র স্থান সবই লুট হয়েছে এবং লুটতরাজ চলছে একেবারে সবার সামনে, রাখঢাকহীনভাবে। এই অবস্থা পটুয়াখালী থেকে কক্সবাজার অবধি। রাখাইন জীবন ও ভূমি লুট করছে কে? নিশ্চয়ই বাঙালি জাত্যভিমান কর্তৃক উপস্থাপিত 'মগ জলদস্যুরা' নয়। তাহলে কে বা কারা? রাষ্ট্র কেন রাখাইনদের ভূমিসংকটের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সব অন্যায় রুখে দাঁড়াচ্ছে না? এসব জানা বোঝার জন্য ঘাঁটাবাছা করতে গিয়েই এই চলতি আলাপখানি ওপরে বর্ণিত এক আদি রাখাইন চগর-চগরার হদিস খুঁজে পেয়েছে।

লেখক ও গবেষক মংবা অং (২০০৩) রাখাইনদের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে এক লেখায় জানান, খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২৫ অব্দ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কালাদান নদীর তীরে গড়ে ওঠা সুসভ্য রাখাইন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও লোকাচার, সংস্কার, বিশ্বাস, সামাজিক পটভূমিকে ভিত্তি করে রচিত সাহিত্যভান্ডারকে যথাযথভাবে প্রকাশনার উদ্যোগ নিলে বিশ্বসাহিত্যভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করা সম্ভব হতো। বিভিন্ন সময়ে উদ্ধারপ্রাপ্ত শিলালিপি, স্মৃতিস্তম্ভ, পুঁথি ও গুহাদেয়ালে উৎকীর্ণ লেখা থেকে ধারণা করা যায়, সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে রাখাইন প্রে তথা আরাকানে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের সাহিত্যিকগণ ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহার করতেন। খ্রিষ্টীয় ৬০১ সালে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক চেতনা আর ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে রাজকুমারী চপ্রেঞোর (সুবর্ণ দেবী) 'ছিংকেঙমিংটঙ' বিরহ গীতিকাখানি রাখাইন সাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়। ৭৬৮ সালে ধম্মজেয়ার লেখা 'লেটঅছেং' গীতিকাটিও রাখাইন সাহিত্যের অনন্য কীর্তি। উইধুরা, উইমালা, উককব্যেং, পাইঞাবংশ, সোয়েছের মতো দক্ষিণাঞ্চলের রাখাইন সাহিত্যিকেরা ১৭ শতকেই নিজ ভাষায় সৃষ্টি করে গেছেন অমর সাহিত্য। চলতি সময়ে উ তান সিয়েন, সাউ তুন ও, উসিট মং, মং থান ওয়ে, ক্যথিংঅং, মংউসাং, উক্যথিন, অংথিংমং, মংছেনচীং (মংছিন), মংহ্লা প্রু, তাহান, উএনু, অংক্যচিন, উহ্লামং, উবাচং, উসিট মং, মংছালু লেখকেরা বাংলা-ইংরেজি এবং কেউ কেউ রাখাইন ভাষাতেও লেখালেখি করেছেন।[৩৬] বাংলাদেশের রাখাইন লেখকদের লেখায় স্পষ্ট হয়েছে দেশের উপকূলে রাখাইনরাই প্রথম সভ্যতা গড়ে তুলেছিল এবং চর্চা করেছে এক অবিস্মরণীয় রাখাইন সংস্কৃতি।

কক্সবাজারের রাখাইনদের বৌদ্ধ বর্ষবরণ অনুষ্ঠান থুংগ্রান উৎসবকে পর্যালোচনা করে থান থুন (২০১৫) তাঁর এক বিদ্যায়তনিক গবেষণায়[৩৭] দেখান, বাংলাদেশের রাখাইন ও মিয়ানমারের রাখাইন জনগণ একই সাংস্কৃতিক ধারা বহন করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের রাখাইন জাতিসত্তা একই রকম ভূমিসংকটকে সামাল দিয়ে চলেছে। অনেক বলেন, বাংলাদেশের রাখাইনরা বিলুপ্তপ্রায় সভ্যতার অংশ।[৩৮] দিনে দিনে বাংলাদেশে রাখাইনদের জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। কিন্তু রাখাইনদের জমি ও বসতি দখল হয়ে যাচ্ছে। পটুয়াখালী জেলায় ৪০ বছরে রাখাইনদের জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার থেকে চার হাজারে নেমে এসেছে।[৩৯] পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় সাত হাজার রাখাইন পরিবার ছিল, এখন আছে এগারো শ।[৪০] আদিবাসী আন্দোলন ও মানবাধিকারকর্মীরা নানা সভায় অভিযোগ[৪১] করছেন, 'বরিশাল অঞ্চলকে রাখাইনশূন্য করার চেষ্টা চলছে'।

রাখাইনদের ভূমিসংকট নিয়ে *প্রথম আলো*কে[৪২] বরগুনা জেলা রাখাইন সমাজকল্যাণ সংস্থার সদস্যসচিব খেমলাং বলেছেন, সত্তরের দশকেও তালতলী এলাকার মোট আবাদি জমির ৯০ শতাংশ ছিল রাখাইনদের। কিন্তু এখন ১০ শতাংশও নেই। ভূমি জটিলতার কারণে রাখাইন ও বাঙালির সৌহার্দ্য নষ্ট হচ্ছে। তালতলী ইউনিয়নের উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা খে খেনু রাখাইন ও বরগুনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আবদুল আলিম *প্রথম আলো*কে জানান, রাখাইন-বাঙালিদের ভূমিবিষয়ক জটিলতা দীর্ঘদিনের।[৪৩] বাঙালি কর্তৃক রাখাইন ভূমি দখলের যাবতীয় পরিসংখ্যানকে আড়াল করে অপর দিকে রাষ্ট্রের তথ্য বাতায়ন প্রচার করছে রাখাইন জনগোষ্ঠীর ভেতরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অভাব আছে। সরকারি তথ্য বাতায়নের ভাষ্যমতে, বরগুনার আমতলী উপজেলায় আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ কম। ফলে এক একটি বাড়ি বেশ খোলামেলা জায়গা নিয়ে তৈরি হয়। অধিকাংশ পরিবার অনেক ভূমি নিয়ে বাস করে। ঘন গাছপালা আচ্ছাদিত ও পরিখাবেষ্টিত এসব বাড়ি সাধারণত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রবণতার অভাব দেখা যায়।[৪৪] অথচ এ অঞ্চলের রাখাইন জনগণ দাবি করে, তারা নানা প্রতিকূলতার ভেতরেও প্রায় দুই শ বছর বাঙালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ সহাবস্থান করে আসছেন।[৪৫] মাঠপর্যায়ে গবেষণাকাজের সময় অনেক বাঙালি মুসলিম ও হিন্দু পরিবারকে পেয়েছি যারা রাখাইনদের ভূমিতেই বংশপরম্পরায় রাখাইন পরিবারের অনুমতিতে বসবাস করে আসছে এবং আবার অনেকে রাখাইনদের দেওয়া জমি নানাভাবে নানা কৌশলে জোর করে নিজেদের দখলে রেখেছে।

আবারও আমাদের সেই রাখাইন প্রবাদখানি স্মরণে আনা জরুরি। যেখানে চারদিকে বাঁধ দিয়ে বসতি অঞ্চলকে রাখাইনদের জন্য সংকটাপূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই বাঁধ কি কেবলই এক শারীরিক অবকাঠামো, নাকি ঘটমান সব সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা?

উপকূলের রাখাইনদের ভূমিসংকটকে অনেকেই জোর করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের চশমায় দেখতে চান। এমনকি এখন প্রশ্নহীনভাবে যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন। ভূমিসংকট সমাধানের জন্য রাখাইনরা ভূমি অফিসে গেলে তাদের জানানো হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে রাখাইনদের ভূমির দলিল ও কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি জেলা প্রশাসকদের[৪৬] কাছ থেকেও দুর্যোগের ফলে ভূমি অফিসের রেকর্ড নষ্ট হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে হরহামেশাই দুর্যোগে ভূমি রেকর্ড নষ্ট হওয়ার তথ্য দিয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এদিক দিয়ে বেহাত ও জবরদখল হওয়া জমিটি ফেরত পেতে রাখাইনরা ভূমির

দলিল ও কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয় এবং এভাবেই একসময় রাখাইনদের জমি দখলদারের হয়ে যায়। রাখাইনরা দেশের সমুদ্র উপকূলে বসবাস করে এবং এলাকাগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগে তছনছ হয়ে যায় এবং আবারও জীবন জেগে ওঠে। দেখা গেছে খুব কম দুর্যোগের ফলেই রাখাইনরা তাদের বসতি ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। এটি বুঝতে উপকূল অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাখাইনদের ভূমি স্থানান্তরের কিছু প্রেক্ষাপট বোঝাও জরুরি। নানা সময়ে এই অঞ্চল দুর্যোগে লন্ডভন্ড হয়েছে, আবারও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে রাখাইন বসতি অঞ্চলগুলোও প্লাবিত হয়। অনেক মানুষের মৃত্যু হয়, অনেক কিছুর সঙ্গে ঘরে থাকা জমির রেকর্ডও ভেসে যায়। কিন্তু আপনাদের কি বিশ্বাস হয় এই ভূমি রেকর্ড আর কোথাও নেই? রাষ্ট্র বা জনগণের (বিস্ময়করভাবে এটি সব সময় ঘটে কেবল আদিবাসীদের ভূমির ক্ষেত্রেই) ভূমি রেকর্ড সব হারিয়ে যেতে পারে? কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই ঘটনাকেও স্থানীয় সরকারি অফিসগুলো কাজে লাগিয়ে রাখাইনদের সঙ্গে মিথ্যাচার করে এবং বলে সব ভূমি রেকর্ড ১৯৬২-৬৩ সালের জলোচ্ছ্বাসে হারিয়ে গেছে।

মোহাম্মদ তারেক হাসান সমুদ্র উপকূলীয় রাখাইনদের ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়া-বিষয়ক লোকজ জ্ঞানকে উদাহরণ টেনে তাঁর এক গবেষণায়[৪৭] বলেছেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় এই জ্ঞান খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং মূলধারায় যুক্ত হওয়া জরুরি। সমুদ্র উপকূলীয় রাখাইনদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার অভিধানটি অবিস্মরণীয়। ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোকে তারা মূলত তিন ভাগে ভাগ করে। রিপ্রিরে, লিমুংডাই ও রিমুংডাই। রিপ্রিরে হলো বড় বন্যা। এর সঙ্গে রাখাইন জীবন খাপ খাওয়াতে অভ্যস্ত। লিমুংডাই হলো তীব্র গতির বাতাসসহ ঝড়। এর সঙ্গেও রাখাইনরা খাপ খাওয়াতে জানে। রিমুংডাই হলো সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস। সিডর, আইলা ও মহাসেনকে তারা লিমুংডাই ও রিমুংডাই হিসেবে চিহ্নিত করে। একসঙ্গে এ দুটি হলে টিকে থাকা অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে উপকূলীয় জীবনের ক্ষতি হয়। ২০০৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত তৈরি করা ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য[৪৮] বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০০৭ সালের মে মাসে আকাশ নামে একটি ঘূর্ণিঝড় হয় এবং ১৫ নভেম্বর সিডর হয়। ১৭ দিন স্থায়ী সিডরে দেশব্যাপী প্রায় ৩৫০০ জন নিহত হয়। ২০০৮ সালে নার্গিস, রেশমি, খাইমু ঘূর্ণিঝড়ের তথ্য পাওয়া যায়। ২০০৯ সালে বিজলী ও আইলা, ২০১৩ সালে মহাসেন, ফাইলিন, হেলেন, লেহার, মাদি, ২০১৪ সালে হুদহুদ, ২০১৫ সালে কমিন, ২০১৬ সালে রোয়ানু, কায়ান্ট, নাডা এবং ভারডার সংঘটিত হয়। ২০১০, ২০১১ এবং ২০১২ সালে কোনো ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়নি। রাখাইনদের বসতি স্থানান্তরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, খুব কম

ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর রাখাইনরা তাদের বসতি ত্যাগ করে পুরো পাড়ার মানুষ অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। এমনকি সাম্প্রতিক সিডর, আইলা বা মহাসেনের মতো প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পরও এমনটি দেখা যায়নি। তবে কিছু ক্ষেত্রে কিছু স্থানান্তর ঘটেছে। বিশেষত যখন জলোচ্ছ্বাসের ফলে পুরো এলাকা জলাবদ্ধ এবং লবণাক্ত হয়ে পড়েছে, তখন রাখাইনরা আগের বসত ছেড়ে নতুন বসতিতে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে। পটুয়াখালীর কলাপাড়ার ৯ নম্বর ধুলাশ্বর ইউনিয়নের বলতুলী পাড়ার আদি রাখাইন নাম বৈতলীপাড়া। বর্তমানে এই পাড়ায় ২৫ পরিবার রাখাইন আছে। জনসংখ্যা ১০০। বর্তমানের মাতবর ওয়্যামং। ১৯৭১ সালে এখানে ৪৫ ঘর রাখাইন ছিল। ১৯৬৫ সালে বড় বন্যা হলেও অনেকে পাড়া থেকে উচ্ছেদ হয়নি, কিন্তু স্বাধীনতার পর বাঙালি কর্তৃক ভূমি দখলের ফলে অনেকেই এলাকা ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

জলাবদ্ধতা এবং লবণাক্ততার ফলে বসতি এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হওয়া সমুদ্র উপকূলের কোনো দুম করে ঘটে চলা প্রতিবেশীয় বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু এটি ঘটছে। দেশের সর্বত্র উপকূল অঞ্চলের কৃষিজমি ও বনাঞ্চল উন্নয়নের নামে এর প্রতিবেশীয় বৈশিষ্ট্য জোর করে বদলে ফেলা হচ্ছে। অপরিকল্পিত উপকূলীয় বাঁধসহ নানা অবকাঠামো নির্মাণ, নদীর উজানে বৃহৎ বাঁধ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প, নদী শাসন, বাণিজ্যিক চিংড়ি ও লবণঘের, প্যারাবন কেটে চিংড়ি চাষ এবং করপোরেট পর্যটন বাণিজ্যের নামে দেশের সব সমুদ্র উপকূলই আজ ক্ষতবিক্ষত। উপকূলের কৃষিজমি ও বসতিগুলো প্রতিনিয়ত জলাবদ্ধতা, ভাঙন এবং তীব্র লবণাক্ততায় আক্রান্ত হচ্ছে। বরিশাল বিভাগের সমুদ্র উপকূলের অনেক কৃষিজমিও দিনে দিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলোচ্ছ্বাসে ক্রমান্বয়ে লবণাক্ত হয়ে পড়ছে। এসব জমি বছরের পর বছর লবণাক্ততার ফলে এক ফসলি বা প্রায় অনাবাদি হয়ে পড়ছে। লবণাক্ততাকে রাখাইন ভাষায় বলে ছংএঁ্যরে। এসব জমিতে আমন মৌসুমে স্থানীয় ধান আবাদ হয়, কিন্তু বোরো মৌসুমে আবাদ হয় না। মূলত উপকূলীয় বাঁধের ফলে জোয়ার-ভাটাকে বাধাগ্রস্ত করার ফলে এসব জমিতে নোনাজল আবদ্ধ হয়ে থাকছে দীর্ঘ সময়। এভাবে উপকূলের অনেক জমির ধরন বদলে যাচ্ছে। জমির এ ধরনের অবস্থাকে রাখাইন ভাষায় বলে 'লে-মলাউ-রা'। স্থানীয়ভাবে এসব জমিকে বলা হচ্ছে 'জমি খিল হওয়া'। উন্নয়ন বাহাদুরির কারণে জমি খিল হয়ে যাওয়াতে আদি বসতি ছেড়ে রাখাইনদের কিছু স্থানান্তর অন্যত্র ঘটছে এখন। তবে রাখাইনদের জলাবদ্ধ, লবণাক্ত খিল জমিগুলোও দখল হয়ে যাচ্ছে।

ওপরের পর্যালোচনায় আমরা আন্দাজ করতে পেরেছি বাঁধ ও দুর্যোগের ফলে একটি এলাকা তার বসবাসের যোগ্যতা হারায়। কিন্তু প্রবাদে কি শুধু এমন সব 'উন্নয়ন বাঁধের' কথাই বলা হয়েছে। যে বাঁধের ফলে আশপাশের সব জলধারা

নদীপ্রবাহ মরে যাবে, তখন আর সেখানে থাকা নিরাপদ হবে না। প্রশ্ন হলো সেই বাঁধ কী? চলতি আলাপ রাখাইন প্রবাদের সেই 'বাঁধকে' রাষ্ট্রের প্রবল বাঙালি জাত্যভিমানেও দেখতে পেয়েছে। যে বাঁধের ফলে উপকূলের রাখাইন জীবনের সব ভূমিগত সাংস্কৃতিক প্রবাহ দীর্ণ চূর্ণ হয়ে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আদি রাখাইন প্রবাদখানির সূত্র ধরেই একটা নতুন নিপীড়নহীন বসতির খোঁজে রাখাইন ভূমিপ্রশ্নকে নানাভাবে হাজির করার মতো সাহসী আজ রাখাইন নারী-পুরুষেরা। চাটাইয়ে শুয়ে থেকে নয়, বরং বৈষম্যের তলোয়ারের কোপ ডিঙিয়ে এক ভূমি-ন্যায্যতার প্রশ্নই দাঁড় করাচ্ছে আজ উপকূলের রাখাইন জনগণ। এ পর্যায়ে আমরা রাখাইনদের ভূমিসংকট এবং বাঙালি জাত্যভিমানী বাঁধকে নানান নথি ও বয়ানে বোঝার চেষ্টা করব।

রাখাইন নামগুলো বদলানো হচ্ছে

সমুদ্র উপকূলের শ্বাপদ সংকুল জংগল আবাদ করে যে রাখাইনরা
এলাকাটি বসবাসযোগ্য করে তুলল তাদের আদিবাসী বলা যাবে না কেন?[৪৯]

উপকূল রাখাইনদের ভাষ্য, বাংলা তাদের মাতৃভাষা নয়। তারপরও তারা বাংলাতে কথা বলেন, বাংলা শিখেছেন, বাংলা ভাষার দাবিতে সংগ্রাম করেছেন। ভাষাসংগ্রামী উস্যুয়ে জন্ম নিয়েছিলেন পটুয়াখালীর এক রাখাইন পরিবারে। এমনকি বাংলায় নিজেদের কিছু এলাকার নাম দিয়েছে উপকূলের রাখাইনরা। যেমন : খাপড়াভাঙ্গা ইউনিয়নের খাপড়াভাঙ্গা ও দ্বারছেঁড়া। মূলত ক্যাপড়া জেদি থেকেই খাপড়াভাঙ্গা নামটি এসেছে। ক্যাপড়া মানে কাপড়। দ্বার মানে দরজা। মূলত কাপড় 'ছেঁড়া' হয় এবং দরজা 'ভাঙ্গা' হয়। কিন্তু রাখাইনরা বাংলাকরণ করায় 'খাপড়াভাঙ্গা' ও 'দ্বারছেঁড়া' হয়ে গেছে। খাপড়াভাঙ্গা এলাকায় ১৮৬৭ সালের দিকে ম্রে ছা চৌধুরী ক্যাপড়াভাঙ্গা জাদি স্থাপন করেন। সেই জাদিতে বিশাল কাপড়ের পতাকা ছিল। এই পতাকা ছিঁড়ে যাওয়ার পর থেকে এই এলাকার নাম হয় খাপড়াভাঙ্গা। প্রতিটি রাখাইন বসতির একটি রাখাইন নাম আছে এবং স্থাননামের একটি ইতিহাস আছে। নিদারুণভাবে রাখাইনদের পাড়া ও বসতিগুলোর নাম পাল্টে ফেলা হচ্ছে।

প্রতিটি রাখাইন গ্রামের একটি আদি রাখাইন নাম আছে। কিন্তু রাখাইন স্থান নামের এই ঐতিহ্যবাহী ধরনটি পাল্টে সব স্থাননাম একতরফাভাবে 'বাঙালীকরণ' করা হচ্ছে। বরগুনার আমতলীর নাম হয়েছে আমপুরি রাখাইনের স্মৃতি থেকে। যেমন : দুই সহোদর ভাই ক্যহ্লাউ এবং খে প্রু রাখাইনের স্মৃতি থেকে কলাপাড়া এবং খেপুপাড়ার নাম হয়েছে। বর্তমানে আমতলীতে কোনো রাখাইন গ্রাম নেই। তালতলী নতুন উপজেলা হওয়াতে এখন বরগুনার প্রায় সব রাখাইন গ্রাম

তালতলীতে পড়েছে। এখানে একসময় ৬৯টি রাখাইন গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭০ সালেও ৪৮টি রাখাইন গ্রাম ছিল। ২০১৭ সালে ১২টি রাখাইনপাড়ার হদিস পাওয়া যায়। বাঙালি ভাষ্যে বলা হয়, তালগাছ থাকার কারণে তালতলী নাম হয়েছে। কিন্তু রাখাইন ভাষ্যে বলে ভিন্ন কথা। রাখাইন ভাষায় এর মানে সীমানা। 'তা'তে এসে যখন বসতি স্থাপন করা হলো তাই 'তা-তলী'। মানে রাখাইনদের নির্দিষ্ট সীমানা। রাখাইন ভাষায় তালগাছকে থাঁ/থাঙা বলে।

বরগুনার তালতলী উপজেলার একটি রাখাইন গ্রামের নাম ছিল জোজিতংব। মানে ঋষিটিলা। গ্রামটি রাখাইনশূন্য করার পর বর্তমানে এর বাঙালি নাম হয়েছে 'জাকিরতবক'। পটুয়াখালীর কলাপাড়া পৌরসভার চইয়াপাড়া গ্রামের নাম এখন উলামানগর। ডংকুপাড়ার নাম রসুলপুর, কালাচানপাড়ার নাম আলীপুর, দোকাসীপাড়ার নাম দোভাষীপাড়া, ফ্যাথিপাড়ার নাম ফাঁসিপাড়া, পুনামাপাড়ার নাম ইসলামপুর। কলাপাড়া কুয়াকাটার এক ঐতিহ্যবাহী রাখাইন গ্রামের নাম ছিল হ্যইছেন পাড়া। ১৯৯১ সালের জনশুমারি কমিউনিটি সিরিজেও এর নাম আছে হ্যইছেন পাড়া। নিদারুণভাবে এ গ্রামটিতে আর রাখাইন নেই, এমনকি নামটি বদলে হয়েছে 'হোসেনপাড়া'। রাখাইন অঞ্চলের নামসমূহ বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রও তা প্রভাবিত করেছে। ২০১২ সালে কলাপাড়া সৈকতে প্রাচীন সমুদ্রগামী যে রাখাইন নৌকা পাওয়া যায়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সেই নৌকার প্রদর্শনীর বিবরণে হ্যইছেন পাড়াকে লিখেছে 'হোসেনপাড়া'। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর রাষ্ট্রের সব নাগরিকের প্রতিষ্ঠান। এই দুই প্রতিষ্ঠান কি এভাবে কোনো স্থাননাম বদলে দিতে পারে? নিচের সারণিতে (সারণি-৪) বরিশাল অঞ্চলের রাখাইন বসতির কিছু স্থাননামের ইতিহাস এবং পরিবর্তনের নমুনা আমরা দেখতে পারব।

সারণি-৪ : বরিশাল বিভাগের রাখাইন বসতি ও স্থাননাম পরিবর্তনের নমুনা

নং	পাড়ার আদি রাখাইন নাম	পাড়ার বর্তমান বাঙালি নাম	ইউনিয়ন/উপজেলা/ জেলা	স্থাননামের বিবরণ
১	বৈতলী	বলতুলী	ধুলাশ্বর ইউনিয়ন, কলাপাড়া, পটুয়াখালী	কোনো খেলায় যখন অনেকগুলো দল থাকে এবং যে দল সেখানে আগে খেলার সুযোগ পায় তাদের রাখাইন ভাষায় বৈতুলী বলে। এই এলাকায় একসময় প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়দের দল ছিল। খেলাধুলায় এলাকার সুনাম ছিল।

নং	পাড়ার আদি রাখাইন নাম	পাড়ার বর্তমান বাঙালি নাম	ইউনিয়ন/উপজেলা/ জেলা	স্থাননামের বিবরণ
২	তাতলী	তালতলী		রাখাইন ভাষায় এর মানে সীমানা। 'তা'তে এসে যখন বসতি স্থাপন করা হলো তাই 'তা-তলী'। মানে রাখাইনদের নির্দিষ্ট সীমানা। রাখাইন ভাষায় তালগাছকে থাঁ/থাঙা বলে।
৩	নাচনা পাড়া	নাচনা পাড়া	টিয়াখালী ইউনিয়ন, কলাপাড়া, পটুয়াখালী	এই এলাকা রাখাইনদের পেকুয়া নাচের জন্য বিখ্যাত ছিল। পেকুয়া নাচ থেকেই এলাকার নাম হয় নাচনা পাড়া। পাড়ার প্রথম মাতবর ছিলেন নাক্রোশি মাতবর।
৪	নি শ্য ই বাড়ী	নিশাইবাড়ী	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	নি শ্য ই রাখাইনের নামে এই এলাকার নাম হয়েছে।
৫	ম্রাইপনিয়া	মরিচবুনিয়া	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	ম্রাই মানে নদী এবং পনিয়া মানে কাছের। ম্রাইপুনিয়া মানে যে গ্রাম নদীর কাছে।
৬	দো-কাসী পাড়া	দোভাষী পাড়া	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	দো-কাসী মানে দাদুর নামে যে পাড়া। দো মানে দাদু এবং কাসী মানে পাড়া।
৭	হুইছ্যেন পাড়া	হোসেন পাড়া	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	হুইছ্যেন রাখাইনের নামে এই পাড়ার নাম হয়েছে।
৮	মাছাখালী	মাছখালী	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	মাছা রাখাইনের নামে হয়েছে।
৯	খ্রাওরাদান	ছয়ানিপাড়া	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	খ্রা মানে ছয় এবং রা মানে শতক। যে জমির দাম ৬০০ তাই এই নাম হয়েছে।
১০	ক্রিনখাওয়া সাং	বেতকাটা	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	ক্রিন মানে বেত, খাওয়া মানে কাটা এবং সাং মানে খাল। বেতকাটার খাল।
১১	খাদ্যা সং রূয়া	অংকুজানপাড়া	নিশানবাড়িয়া ইউনিয়ন, তালতলী, বরগুনা।	খাদ্যা একধরনের ভেষজ গাছ যা কুকুর কামড়ের চিকিৎসায় রাখাইনরা ব্যবহার করে। সং মানে খাল। যে খালের ধারে এই খাদ্যা গাছ বেশি জন্মায় সেই খালের পাশের পাড়াই খাদ্যা সং রূয়া।
১২	জোজিতংব	জাকিরতবক	তালতলী, বরগুনা	জোজিতংব মানে ঋষির টিলা।

নং	পাড়ার আদি রাখাইন নাম	পাড়ার বর্তমান বাঙালি নাম	ইউনিয়ন/উপজেলা/ জেলা	স্থাননামের বিবরণ
১৩	চইয়া পাড়া	উলামানগর	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	চইয়া মাতবরের নামে এই পাড়া হয়েছে।
১৪	ডংকুপাড়া	রসুলপুর	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	ডংকু মাতবরের নামে এই পাড়া হয়েছে।
১৫	কালাচান পাড়া	আলীপুর	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	কালাচান মাতবরের নামে এই পাড়া হয়েছে।
১৬	ফ্যাথিপাড়া	ফাঁসি পাড়া	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	ফ্যাথি মাতবরের নামে এই পাড়া হয়েছে।
১৬	পুনামাপাড়া	ইসলামপুর	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	পুনামা নামে এক রাখাইন নারীর নামে এই পাড়ার নাম হয়েছে।

কৃষিজমি ও বসতভূমি বেহাত হচ্ছে

রাখাইনদের কৃষিজমি ও বসতভূমি বেদখলের ক্ষেত্রে এলাকার ভূমির ধরন ও কৃষিজমি বর্গাপ্রথার নিয়মগুলো আমাদের বোঝা জরুরি। উপকূলীয় রাখাইনদের ভূমিবিন্যাস রীতি অনুযায়ী ভূমির তিনটি স্তর। নিচু জমিকে আন্নি লে, মাঝারি জমিকে আমরে/আম্রালে এবং উঁচু জমিকে আমরেক্রি বা রোয়ারহা বলা হয়। আমরেক্রি জমিনে মূলত ঘরবাড়ি, ধর্মস্থল, শ্মশান, খেলার মাঠ, গোলগাছের বাগান, বিনোদনস্থল, গৃহস্থালি বাগান, পুকুর এসব থাকে। অনেক সময় উঁচু জমিনে মহিষের ঘাস বা ম্রে চাষ হয়। আমরে জমিনে প্রুমাচা কাউঞিয়া (সাদা বিনি) ও মিমাকাউঞিয়া (লাল বিনি) ধানগুলো ভালো হয়। আন্নি জমিন একেবারেই কৃষিজমি। রাখাইনদের সবচেয়ে বেশি বেদখল হয়েছে আমরেক্রি ও আমরে জমিন। কারণ এই কৃষিজমিগুলোই বাঙালিদের কৃষিকাজ করার জন্য উপযুক্ত। বিশেষত সেচনির্ভর রাসায়নিক কৃষির জন্যই এই জমিগুলো বাঙালিদের প্রধান নিশানা হয়েছে।

রাখাইন ভূমি বেদখলের পেছনে এলাকার জমি বর্গার বিষয়টিও জড়িত। পটুয়াখালী ও বরগুনা অঞ্চলের রাখাইন গ্রামগুলোতে তিন ধরনের কৃষিজমি বর্গাপ্রথা প্রচলিত। রাখাইনরা মূলত বাঙালিদের কাছেই জমি বর্গা দিয়ে থাকে। বর্গা দেওয়া জমিগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত টাকা পরিশোধ-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বর্গা জমিগুলো বাঙালিদের কাছে বিক্রি করতেও বাধ্য হয় রাখাইনরা। তিনটি বর্গাপ্রথার ভেতর রাখাইনরা খাড়া পাট্টা বেশি চলে এবং তারপর নিখাউতি।

ক. খাড়া পাট্টা : ৭ বছরের জন্য জমি চাষের জন্য বর্গা দেওয়া হয়। এখানে একবারে ৭ বছরের জন্য ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

খ. নিখাউতি : এটি অ্যাগ্রিমেন্ট নামেও পরিচিত। এটি একেবারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নেওয়া হয় এবং যত দিন না টাকা শোধ করা যায়, তত দিন ওই জমি বর্গাকারী চাষ করবেন।

গ. একসনা : প্রতিবছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রতি

কানি জমির জন্য ২২ হাজার টাকা এক বছরের জন্য।

রাখাইনদের ভূমিসংকট ঘিরে তৈরি হয়েছে মামলা ও হামলার নানা ঘটনা। বরগুনার তালতলীপাড়ার টিঅ্যান্ডটি এলাকার মিজ হ্লাচাং জানান, ২০১৪ সালে একদল ভূমিদস্যু রাতের মধ্যে ঘর নির্মাণ করে তাদের ১.৫০ একর জমি দখল করে নেয়। ভূমি দখলের সময় গভীর রাতে ভূমিদস্যুরা তাঁর বোন মিজ মাচানহ্লাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন করে। তাঁর পরিবার-পরিজনকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। তালতলী থানায় পুলিশকে ফোন করলেও তাঁদের উদ্ধার করতে বা ভূমিদস্যুদের ধাওয়া করতে সারা রাত কোনো পুলিশ ফোর্স আসেনি। এভাবে রাখাইন গ্রামবাসী তাদের নিরাপত্তাহীনতা ও অসহায়ত্বের কথা মতবিনিময় সভায় তুলে ধরে। তালতলীর ছাতনপাড়ার মিজ খেন খেন জানান যে, তিনি একখণ্ড জমি বিক্রি করেন এক বাঙালির কাছে। কিন্তু ওই ব্যক্তি সেই জমিটা না নিয়ে দখল করে নেয় ভালো মানের আরেকটি জমি। খেন খেন বিক্রি করেছেন ১০ শতক জমি। কিন্তু ক্রেতা বাঙালি ব্যক্তি দখল করেছে ৩০ শতক জমি। এভাবেই নির্বিচারে বেহাত হচ্ছে রাখাইনদের জমি। তালতলী উপজেলার কবিরাজপাড়ার মিজ চিন খেন জানালেন, তাঁর দুই একর জমি ৪-৫ বছর ধরে আবুল খাঁ নামে এক বাঙালি প্রতিবেশীর কাছে একসনা বন্ধকি (অগ্রিম বর্গা) দিয়ে আসছেন। কিন্তু গত বছর থেকে সেই বাঙালি তাঁদের বন্ধকি বাবদ কোনো টাকা না দিয়ে ভোগদখল করছেন। একদিন তাঁর স্বামীসহ মিজ চিন খেন আবুল খাঁয়ের কাছে গিয়ে বন্ধকির টাকা চাইলে আবুল খাঁ উল্টো তাঁদের পিটিয়ে মেরে ফেলার অথবা তাঁদের এক নম্বর আসামি করে থানায় মামলা করার হুমকি দেন।

বরগুনার তালতলী উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের এক প্রাচীন রাখাইন গ্রামের নাম খাদ্যাসং রুয়া[৫০]। খাদ্যা নামের এক ভেষজ গাছ এই পাড়ার খালের ধারে বেশি জন্মাত বলে এই নাম হয়েছে। বাঙালিদের কাছে গ্রামটি এখন অংকুজানপাড়া নামে পরিচিত। তবে বাইরে থেকে আসা বাঙালি[৫১] যারা রাখাইনদের জায়গা 'দখল' করে বসবাস করছে তারা গ্রামটিকে ডাকে 'অংকুজপাড়া'। এই গ্রামে বর্তমানে ১৫ পরিবার রাখাইন, ১০ পরিবার বাঙালি মুসলমান ও ৪ পরিবার বাঙালি হিন্দু বসবাস করছে। এই পাড়াতে কেউ বয়স্ক ও বিধবা ভাতা পাননি। এই পাড়ার রাখাইনদের পেশা কৃষি এবং ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প। পাড়াটি আদি রাখাইন বসত হলেও ১৯৯৮ সাল থেকে বহিরাগত বাঙালি মুসলমানরা এখানে বসবাস শুরু করে। নয়া বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের ভাষ্য, ২০০৭ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর এই গ্রামে সবচেয়ে বেশি বাঙালি অভিবাসন ঘটেছে। অংকুজানপাড়ায় নয়া বসতি স্থাপনকারী মো. আফজাল হোসেনের ভাষ্য[৫২], ১৯৮০ সালে বরগুনা সদরের ডালভাঙ্গা থেকে তিনি প্রথম এই রাখাইন গ্রামে আসেন এবং রাখাইনদের বাড়িতে

কাজ করতেন। তিনি নিজেকে দিনমজুর হিসেবে পরিচয় দেন। তবে যে জায়গায় বসবাস করছেন তা একটি আদি রাখাইন পুকুর দখল করে করা। বাঙালি হিন্দুদের ভেতর এই এলাকায় প্রথম বসতি স্থাপন করেছে গান্ধী শীলের পরিবার।[৫৩] বর্তমানে ৪ পরিবার বাঙালি হিন্দু আছে। রমণী শীল ও মায়ারানী শীলের পরিবার ২০১২ সালে চট্টগ্রামে গার্মেন্টসের কাজ নিয়ে চলে গেছে।

খাদ্যাসং রুয়া বা অংকুজানপাড়ার বর্তমান মাতবর চোথায়ফ্রু[৫৪] এবং তাঁরা বেশ অবস্থাসম্পন্ন পরিবার ছিল একসময়। চোথায় প্রু মাতবর (৮০) ও উচিংসে মগনী পরিবার শতাধিক বছর ধরে এখানে বসবাস করছে। চোথায় প্রুয়ের মায়ের নাম লানি প্রু মাতবর এবং বাবা চাংলাউ মাতবর। বরগুনার তালতলীর সোনাতলী ইউনিয়নের লাউপাড়াতে জন্ম। বিয়ের পর ১৯৬৫ সালে স্ত্রী উচিংসের বাড়ি অংকুজানপাড়াতে চলে আসেন। উচিংসের মা উয়েমা মগনী এবং বাবা মংচালা তালুকদার। পারিবারিক উত্তরাধিকার হিসেবে উচিংসে সাড়ে তিন কানি[৫৫] জমি পেয়েছেন। ১৯৮৬ সালে ছাতু পাড়া নদকে রাখাইন থেকে ৫ একর ৩২ শতক এবং পাসে রাখাইন থেকে ৫ একর ৩২ শতক জমি কেনে চোথায় প্রুর পরিবার। সব মিলিয়ে চোথায় প্রুর পরিবারের ২০ একর কৃষিজমি থাকলেও বাঙালিদের মাধ্যমে দখল হয়েছে প্রায় ৭ কানি জমি। চোথায় প্রুদের মালিকানাধীন তালতলী উপজেলার অন্তর্গত ৪১ নম্বর ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজার ১২.৩৭ একর জমি সানু খন্দকারের নেতৃত্বে প্রতিবেশী ১০ জন বাঙালি জাল দলিলের মাধ্যমে দখলের পাঁয়তারা করছে। ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তালতলী থানার এসআই মো. আসাদুর রহমানের এক তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজার ৩১.৩৭ একর জমি বহু বছর আগে থেকে মনচালা মগ গং ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ উপযোগী করে তাঁর নামে রেকর্ডভুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা উচিনসে মগনী ওই জমি ওয়ারিশসূত্রে মালিক হন। উচিনসে মগনীর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী চোথায় প্রু ও দুই মেয়ে ওই জমির মালিক হন। কিন্তু ওই জমি সানু খন্দকারের নেতৃত্বে ১০ জন বাঙালি ২০০০-০১ সালে ভূমি বন্দোবস্ত কেস নং-১২৮৫ (আম) এবং একই সালে বন্দোবস্ত কেস নং-১৩৭৬ (আম) ও ১৩৩৮ (আম) মূলে জাল দলিল প্রদর্শন করে মালিকানা দাবি করে। এ-সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনো পক্ষ তাদের নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না মর্মে প্রশাসন ও আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও দখলদার বাঙালিরা ঘরবাড়িও নির্মাণ করেছে। এভাবেই আজ জাল দলিলের মাধ্যমে ভূমিদস্যুরা রাখাইনদের জমি জবরদখল করে চলেছে।

কেবল চোথায় প্রু নন, এভাবে এই পাড়াসহ রাখাইন সব পাড়ার ক্ষেত্রে এভাবে প্রশ্নহীন ভূমি ছিনতাই ঘটছে। খাদ্যা সং রুয়ার মাথানচিংদের পারিবারিক

জমি (জমির পরিচয়: জেএল নং-৪৪, মৌজা-বড়বগী, এসএ খতিয়ান-৭২৪, আরএস নং-৮, দাগ নং-৬৭৩)[৫৬] থেকে এক একর সম্পত্তি বড়বগী ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত ভূমি অফিসকে দান করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯০৯ সালে ছাতনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জিকস কর্তৃক নির্মিত ভবনের সঙ্গে মাথানচিংদের অবশিষ্ট ৫০ শতক জমি থেকে ৯ শতক জমি যুক্ত হয়। বাকি ৪১ শতক জমি ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁরা নানা সময় প্রশাসন বরাবর আবেদন করেন। এর সঙ্গে ৬৩৭ নম্বর দাগের ১৬.৩৩ শতক ভূমিরও উত্তরাধিকার দাবি করেন। মোট ৫৭.৩৩ শতক পৈতৃক ভূমি ফেরত পেতে বারবার আবেদন জানিয়েও কোনো ন্যায়বিচার পাচ্ছে না মাথানচিংদের পরিবার। এমনকি মাথানচিংয়ের স্বামী গবেষক মংতাহানও জবরদখল হয়ে যাওয়া তাঁর ১১ একর পৈতৃক জমি (জমির পরিচয়: পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলী ইউনিয়নের লতাচাপলী মৌজায় সিএস খতিয়ান-৫৬, এসএ খতিয়ান-৬১৪, দাগ নং-৩২৬৪ এবং ৩২৬৫)[৫৭] ফেরত পেতে বারবার প্রশাসনকে জানিয়ে আসছেন। এ প্রসঙ্গে প্রশাসন থেকে মংতাহানের জমি ফেরত দেওয়ার জন্য জবরদখলকারীদের একটি নোটিশও[৫৮] জারি করে প্রশাসন ১৯৯২ সালে। এ নিয়ে নানা মামলা হামলাও হয়। মামলায় জমির বৈধ মালিক মংতাহানের পরিবার প্রমাণিত হওয়ায় ১৯৮৯ সালে সরকার কলাপাড়া উপজেলা রাজস্ব অফিসারকে মংতাহানের ১১ একর জমি তাদের পরিবারকে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশও[৫৯] দেয়। কিন্তু কিছুই হয় না। আবারও সরকারি তদন্ত[৬০] হয় এবং তদন্তে প্রমাণিত হয় মংতাহানের দাবি করা জমি আ. মালেক, আ. রশিদ ও আ. লতিফ বেপারিরা ভোগদখল করছেন। ভোগদখলের বিপরীতে তাঁরা সরকারি তদন্তদলকে কোনা বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি।

এমনকি জমির খাজনা নিয়মিত পরিশোধ করেও নিজ জমিতে রাখাইনরা থাকতে পারছে না। বালিয়াতলী ইউনিয়নের সোনাপাড়ার মং সি উ ৮ শতাংশ ৬৬ একর জমির নিয়মিত খাজনা দিলেও তিনি জমিতে যেতে পারছেন না। স্থানীয় কাদের মিস্ত্রি, আতাহার, আজাহার ও শাহ আলম মোল্লা নামের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ওই জমি ভোগ করছেন। কৃষিজমি না থাকায় রাখাইনদের অন্যের জমিতে কাজ করতে হচ্ছে।[৬১] মানবাধিকারকর্মী মেইনথিন প্রমীলার সূত্র উল্লেখ করে লেখক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার মঙ্গল কুমার চাকমা (২০১৭) তাঁর এক লেখায়[৬২] বলেছেন, এ পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে কারিতাস নামের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান রাখাইনদের ২৯২টি মামলার ৭৮টিতে রায়ের মাধ্যমে ৬৭৪ একর জমি উদ্ধার করতে সহযোগিতা করেছে। রাখাইনদের সব জমিই ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারসূত্রে বাহিত হয়। নিদারুণভাবে পটুয়াখালী ও বরগুনার রাখাইনরা স্বাধীনতার পর নিজেরা বলার মতো জমি কিনতে পারেনি। বাধ্য হয়ে রাখাইনরা

নিজেদের ভেতর জমি ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করছে। জানা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলের সব রাখাইন পরিবারেই ভূমি নিয়ে কোনো না-কোনো মামলা আছে। উপকূলীয় রাখাইন ভূমিযন্ত্রণা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ২০০০ সাল থেকে এই ভূমিসংকট দূরীকরণে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ভূমি আদালত এবং স্বতন্ত্র ভূমি কমিশন গঠনের দাবি তুলেছে রাখাইন জনগণ।

পবিত্র পুকুরের রক্তজল

আমরা মাথিনকে চিনি একটি কূপের মাধ্যমে। মাথিন রাখাইন নাকি প্রেমের কারণে এই কূপে ঝাঁপ দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের অধিপতি ইতিহাসগ্রন্থনের কায়দা আমাদের কখনো জানায়নি যে প্রতিটি রাখাইন জনপদে পানি ব্যবস্থাপনার বিশেষ বিজ্ঞান হিসেবে পুকুর ও কূপ থাকে। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এখনো সমতার দৃষ্টিতে রাখাইন জীবনের দিকে তাকায়নি। অথচ রাখাইন জাতি নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে এই বাংলাদেশের বৈচিত্র্য। পালতোলা নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার বিজ্ঞান কৌশল থেকে শুরু করে সমুদ্র উপকূলে বসতি নির্মাণের দারুণ সব কারিগরির জন্ম দিয়েছে রাখাইনরা। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস আর প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবিলা করার নানা কৌশল উপহার দিয়েছে রাখাইন জনগণ। সামুদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, তাঁতশিল্প থেকে শুরু করে রাখাইন জনগণের সংস্কৃতি দেশকে অনন্য করেছে। উপকূল অঞ্চলে লবণাক্ততা ও পানীয় জলের অভাবকে মোকাবিলা করে রাখাইনরা পুকুর ও কূপ খনন করে পানীয় জল সংরক্ষণকে এক ঐতিহ্যবাহী চর্চায় পরিণত করেছে। প্রতিটি রাখাইনপাড়ায় পানীয় জলের পুকুরটি পবিত্র ও পাবলিক/রিজার্ভ পুকুর হিসেবে সংরক্ষিত হচ্ছে যুগের পর যুগ। কোনো কোনো পুকুরের বয়স দেড় শ কি দুই শ বছর। এসব পুকুরের জল শুধু মানুষ ও প্রাণীর পানীয় জলের জন্য। যেমন বেতুলিয়া রেকা নামের পুকুরটি এক ঐতিহ্যবাহী পবিত্র পুকুর। বরগুনার তালতলী উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নের বেতুলিয়া (কবিরাজপাড়া) পাড়ায় এর অবস্থান। ৭০ শতক আয়তনের এই পুকুরটি বাঙালিরা দখল করে ফেলছে। এ নিয়ে ১৯৫৯ সাল থেকে দরবার চলছে। পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার দিয়াড় আমখোলা গ্রামের পুকুরটিও দখল হয়ে গেছে। কালাচানপাড়া, থঞ্জুপাড়া, লক্ষ্মীপাড়া, নায়রীপাড়ার রাখাইনদের পবিত্র পুকুরগুলো জবরদখল করে বাঙালিরা সেখানে মাছ চাষ করছে এবং ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে। উপকূল অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট তীব্র। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুকুর দখল। এটি সরাসরি রাখাইনদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে টিকে থাকার ক্ষেত্রে তীব্র চাপ তৈরি করেছে। এলাকায় পানীয় জলের সংকট একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। রাখাইনদের পানি ব্যবস্থাপনার

লোকায়ত সংস্কৃতিকে গুরুত্ব না দিয়ে দিনে দিনে তাদের কাছ থেকে নিজেদের পুকুর, কূপ ও ধারেকাছের খালগুলোও কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

বরগুনার তালতলীর সোনাকাটা ইউনিয়নের বেতুলিয়া রাখাইন গ্রামটি এখন কবিরাজপাড়া নামে পরিচিত। মংহ্লা কবিরাজ এই গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামের ঐতিহ্যগত রাখাইন পুকুরগুলো নিমেষে দখল হয়ে গেছে। বিশেষভাবে সরকারি ১ নম্বর খাসখতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত রাখাইন রিজার্ভ পুকুর হয়ে দখল হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ১৭৮১ নম্বর এবং ১৭৮২ নম্বর দাগের অধীন কবিরাজপাড়ার এক ঐতিহ্যগত রাখাইন রিজার্ভ পুকুরের আয়তন প্রায় ৭০ শতক। পুকুরটি রাখাইনদের কাছে বেতুলিয়া রেকা এবং বাঙালিদের কাছে কবিরাজপাড়ার পুকুর নামে পরিচিত। পুকুরটির ১৭৮২ নম্বর দাগের অংশটি মূলত পুকুরে চলাচলের রাস্তা। বাঙালিরা এই পথটি দখল করে রেখেছে। চলাচলের পথ না থাকায় ঐতিহ্যগত বেতুলিয়া রেকাতে রাখাইনদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হয়েছে। পুকুরটি শতবর্ষব্যাপী কেবল খাবার ও পারিবারিক ব্যবহারের কাজে রাখাইনরা সংরক্ষণ করে আসছিল। এমনকি ঐতিহ্যগত রাখাইন খাবার মুন্ডি (একধরনের হাতে বানানো নুডলস) তৈরিতে এমন পবিত্র পুকুরের পানি ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে বাইরে থেকে আসা বাঙালিরা এই পুকুরের চলাচলের রাস্তাসহ কিছু অংশ দখলের জন্য কবুলত করে এবং ১৯৭১-৭২ সালে ভূমি অফিস থেকে তারা কিছু অংশের বন্দোবস্ত পায়। ২০১৪ সালে পুকুরটি নিয়ে রাখাইনদের সঙ্গে বাঙালিদের মামলা হয়। রাখাইনদের আশঙ্কা, যদি পুকুরে চলাচলের রাস্তায় বাঙালিরা বন্দোবস্ত পায়, তবে পুকুরে রাখাইনদের আর কোনো প্রবেশাধিকার থাকবে না। ঐতিহ্যগত পুকুরটিতে নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে মামলা করায় রাস্তা দখলকারী বাঙালিরা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পুনর্মামলা করেছেন।

কবিরাজপাড়ার নিশানবাড়িয়া মৌজার এই পবিত্র পুকুরটি দখল করে বাণিজ্যিক মাছ চাষের পাঁয়তারা শুরু করেছে বাঙালিরা। প্রায় দুই শ বছর ধরে রাখাইনদের ঐতিহ্যগতভাবে সংরক্ষিত এই পুকুরটিকে (পুকুরের বিবরণ : জমির পরিমাণ-০.৭৩ একর, বড় নিশানবাড়িয়া মৌজা, জেএল নং-৪২, দাগ নং-১৭৮১, ১৭৮২) সরকারি ১ নম্বর খাসখতিয়ান দেখিয়ে জলমহাল হিসেবে বিবেচনা করে মাছ চাষ করার জন্য ভূমিদস্যুরা জোরজবরদস্তি করছে, এলোপাতাড়ি পাড় কেটে পুকুরের পবিত্রতা নষ্ট করছে।[৬৩] এ বিষয়ে তালতলীর বগী ইউনিয়ন ভূমি অফিসে উপজেলা প্রশাসন তদন্তের নির্দেশ দেয় ৯/৭/২০১৪ তারিখে এবং ৩/৯/২০১৪ তারিখে ইউনিয়ন ভূমি অফিস তদন্ত করে। তদন্তকারীরা[৬৪] দেখান, পুকুরটি ১ নম্বর সরকারি খাসখতিয়ানভুক্ত জমিতে অবস্থিত এবং রাখাইন সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে এটি ব্যবহার করছে। পুকুরটির উত্তর-পশ্চিম পাড় বিনষ্ট করে কাছেম আলী ও

কাদের ফরাজীরা স্থাপনা তৈরি করেছেন। ওই তদন্ত প্রতিবেদন সাপেক্ষে তালতলী উপজেলা কর্মকর্তা পুকুরবিষয়ক আবেদনকারী মংথিনজোর আবেদনমাফিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।[৬৫] তালতলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ২০১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি কবিরাজপাড়ার পুকুরটি রাখাইন পরিবারের ব্যবহার ও জনস্বার্থে খনন করে চারপাশে বৃক্ষরোপণ ও তারকাঁটার বেড়া দেওয়ার অনুমতি[৬৬] প্রদান করেন।

রাখাইন রীতি অনুযায়ী পবিত্র পুকুরগুলো তাদের ধর্মীয় দর্শন এবং প্রকৃতি সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত। একেক কাজে একক রকম ব্যবস্থাপনার জলাধারের পানি ব্যবহার করার নিয়ম। যখন একটি পবিত্র পুকুর দখল হয়ে বাণিজ্যিক মাছ চাষের কেবল একটা জলাধার হয়ে যায়, তখন রাখাইনদের যন্ত্রণা হয়। এই যন্ত্রণা কেবল ভূমি বা জলাভূমির বাজারি মূল্য দিয়ে বিচার করে চলে না, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজারো বছরের জটিল আত্মিক সম্পর্ক।

উধাও শ্মশান!

রাখাইনদের আদি রীতি অনুযায়ী মৃত্যু-পরবর্তী কৃত্য হিসেবে মৃতের শরীর পাড়ায় তার বাড়িতে বিশেষভাবে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা হতো এবং প্রতিদিন মৃতের স্মরণে নানা কৃত্য-আচার পালিত হতো। এসব রাখাইনকৃত্য এখন আর অনেকটা পালিত হয় না। এ প্রসঙ্গে পটুয়াখালীর গোড়াআমখোলার প্রকৌশলী ম্যাথিউস রাখাইন দৈনিক *সমকাল*কে[৬৭] জানান, এসব পালনের কোনো পরিস্থিতি এখন রাখাইনপাড়ায় নেই। তাঁর বাবা উমং মারা যান ২০১৭ সালের ১০ মার্চ। পাড়ার বাইরে মারা যাওয়ায় তিনি একজন অতিথি হিসেবে গণ্য হন এবং গোড়াআমখোলা শ্মশানে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা নেই। সেটি ভূমিদস্যুরা আগেই দখল করেছে। পরবর্তী সময়ে উমংয়ের শেষকৃত্য হয় তাঁর বাড়ির উঠানে। ম্যাথিউস রাখাইন ১৯৯৩ সালে আদি রাখাইন রীতিতে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন।

কেবল পবিত্র পুকুর বা কৃষিজমি নয়। মন্দির বা ধর্মস্থল নয়। চলাচলের রাস্তা বা ধারেকাছের খাল নয়। মৃত্যুর পর শেষ ঠিকানা রাখাইনদের চানসাইগুলোও জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। রাখাইন ভাষায় চানসাই মানে শ্মশানভূমি। পটুয়াখালীর কলাপাড়ার টিয়াখালী ইউনিয়নের ছয়ানিপাড়ার দেড় শ বছরের প্রাচীন শ্মশান থেকে শুরু করে বরগুনার তালতলী উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের অংকুজান পাড়ার খাদ্যা সং চানসাই শ্মশান দখল হয়ে গেছে রাখাইনদের চোখের সামনে। একই অবস্থা পটুয়াখালীর কলাপাড়া থনজুপাড়া, মিশ্রীপাড়া, দিয়াড় আমখোলাপাড়া, কালাচানপাড়া, তুলাতলী, নয়াপাড়া-বাবলাতলা, সোনাপাড়া, চৈয়পাড়া, হাঁড়িপাড়ার শ্মশানগুলোর ক্ষেত্রেও। বরগুনার অংকুজানপাড়া পরিদর্শনে দেখা যায় যে,

ভূমিদস্যুদের অব্যাহত ভূমি আগ্রাসনের ফলে সংকুচিত হয়ে পড়েছে এই রাখাইন গ্রামের পরিধি। একসময় যেখানে অর্ধশতাধিক রাখাইন পরিবার বসবাস করত, সেখানে বর্তমানে মাত্র ১১ পরিবারের বসতি রয়েছে। অংকুজানপাড়ার শ্মশানভূমি দাহ করার পূর্বে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য সাময়িকভাবে শবদেহ রাখার স্থান মো. ইউনুস নামে জনৈক ব্যক্তি দখল করে বাড়ি নির্মাণ করেছেন। প্রতিবাদ করতে গেলে মো. ইউনুস উল্টো হামলার হুমকি দেন রাখাইন গ্রামবাসীদের। ২৭ হাজার টাকার বিনিময়ে ওই জায়গা তিনি কিনে নিয়েছেন বলে জানান। কিন্তু রাখাইনরা জানান, শ্মশান, দেবালয় সম্পত্তি ইত্যাদি বিক্রি করা যায় না। গ্রাম থেকে শ্মশানে শবদেহ নেওয়ার রাস্তাও ঘেরা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে ভূমিদখলদারেরা।

রাখাইন জনগণ বারবার স্থানীয় প্রশাসন বরাবর দখল হয়ে যাওয়া নিজেদের শ্মশানভূমি ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছে। পটুয়াখালীর টেনসুয়ে রাখাইনের করা এমন একটি আবেদনপত্র[৬৮] থেকে জানা যায়, কলাপাড়া-খেপুপাড়ার অধিকাংশ জমি ক্যলাউ এবং খেপ্যু নামে রাখাইন ব্যক্তি দান করে দিয়ে যান এবং উপজেলার নামকরণও এই রাখাইন ব্যক্তিদ্বয়ের নাম থেকে হয়েছে। অথচ মৃতদেহ সৎকারের জন্য এই উপজেলা সদরে রাখাইনদের আলাদা শ্মশানভূমি নেই। ২০ হাজার জনসংখ্যা থেকে নেমে বর্তমানে কলাপাড়া সদর ও পৌরসভায় ১২টি রাখাইন পরিবার (মোট ৪৬ জনসংখ্যা—নারী ২০, পুরুষ ২২, মেয়েশিশু ২ ও ছেলেশিশু ২) রয়েছে। বিগত দিনে রাখাইনদের জন্য আলাদা শ্মশান ছিল। তা ২৫-৩০ বছর আগেই উপজেলার শহর সম্প্রসারণ ও নানা প্রতিকূলতায় বেদখল হয়ে যায়। বর্তমানে হিন্দুদের আখড়াবাড়ি ও নতুন বাজারে যাওয়ার সংযোগপথে যে কালভার্ট রয়েছে, সেখানেই ছিল রাখাইনদের জন্য আলাদা শ্মশানভূমি। শ্মশানের ওপরই নির্মিত হয়েছে এই কালভার্ট। এখনো সেখানে রয়েছে রাখাইন ভাষায় লিপিবদ্ধ সমাধির অংশবিশেষ। কালাচানপাড়ার ২৭ শতক জমির শ্মশানটি বেদখল হয়ে গেছে অনেক দিন আগে। শ্মশানের ২৩ শতক জমি দখল করেছেন স্থানীয় সোহরাব হোসেন। সড়ক ও জনপথ বিভাগ রাখাইনদের ৪ শতক জমি দখল করে সেতু নির্মাণ করেছে।[৬৯] ২০১৬ সালের ২৮ মার্চ রাতের বেলা পটুয়াখালীর কলাপাড়ার টিয়াখালী ইউনিয়নের ছয়ানিপাড়ার দেড় শ বছরের প্রাচীন শ্মশান সমাধিস্তম্ভ ধ্বংস করে ভূমিদস্যুরা।[৭০] বরগুনার তালতলী উপজেলা সদরের ২০০ বছরের প্রাচীন রাখাইন শ্মশানের ১ একর ৩৩ শতক জায়গা জবরদখল করে সেখানে স মিল দিয়েছেন মো. ইসমাইল হাওলাদার।[৭১]

বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা বন্দর ও মহাজনী উন্নয়ন

রাখাইনরা ঘরকুনো। তাদের ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বিকল্প পেশায় যুক্ত হতে

হবে।
জমির ওপর নির্ভর করে থাকলে রাখাইনদের চলবে না।[৭২]

ওপরের ভাষ্যটি রাষ্ট্রের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির। রাখাইনদের নিয়ে রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক মনস্তত্ত্বই যেন প্রকাশিত হয়েছে ওপরের ভাষ্যে। রাখাইনদের ভূমিসংকটকে আড়াল করে রাষ্ট্র বরং উন্নয়নের নামে শেষ রাখাইন ভূমিটুকুও দখল করতে চায়। আর এ কারণেই আমরা দেখি দেশের উপকূলে বিদ্যুৎকেন্দ্র, বন্দর ও বাণিজ্যিক পর্যটন গড়ে ওঠে। কিন্তু একটি রাখাইন ভূমি দখলেরও বিচার হয় না। বৃহৎ অবকাঠামো, বিদ্যুৎ প্রকল্প কিংবা বন্দরের কারণে দেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গ প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ ও জমি হারাচ্ছে। কিন্তু উন্নয়নের নামে উপকূলের রাখাইন ভূমি হারানোর প্রসঙ্গগুলো অনেকটাই অনালোচিত। পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের এক আদি রাখাইন গ্রামের নাম ছিল ম্রাইবুনিয়া। ম্রাই মানে সমুদ্র মোহনার নদী এবং বুনিয়া মানে কিনার। ম্রাইবুনিয়া গ্রামটিরও অবস্থান ছিল সমুদ্র মোহনার নদীর কিনারে। জলোচ্ছ্বাস ও বড় বন্যায় গ্রামটি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৬৮ সালে গ্রামটি উঠে যায়। ওই সময় গ্রামের মাতবর ছিলেন নাপিঙএ্যা এবং গ্রামে প্রায় ৮০ পরিবার রাখাইন ছিল। পরবর্তী সময়ে ম্রাইবুনিয়ার রাখাইনদের অনেকেই ধানখালী ইউনিয়নে নতুন আবাস তৈরি করে। গ্রামটি বাঙালিদের কাছে মরিচবুনিয়া নাম পেয়েছিল। ২০১৬ সালে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে এই গ্রামের কিছু বাঙালি পরিবার তাদের জমি হারিয়েছে। নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ এবং চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট করপোরেশন (সিএমসি) যৌথভাবে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের ১ হাজার ২ একর ভূমি অধিগ্রহণ করে পায়রা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপের কাজও এগিয়ে নিচ্ছে।[৭৩] ১৩২০ মেগাওয়াটের এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে তিনটি মৌজার মধুপাড়া, গরদখা, মাছুয়াখালী, দাসেরহাওলা, মরিচবুনিয়া, গন্ডামারী, নিশানবাড়িয়া ও চরনিশানবাড়িয়া গ্রামগুলোর প্রায় ১৫ হাজার মানুষ জানমালের ক্ষতির আশঙ্কায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল।[৭৪] কেবল বিদ্যুৎকেন্দ্র নয়, পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় সাবমেরিন কেব্‌লের ল্যান্ডিং স্টেশনের জন্য গোড়াআমখোলার মংচিউ তালুকদারের ১৪ কানি জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। যদিও এখানে বাঙালিদেরও কিছু জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

পায়রা সমুদ্রবন্দর[৭৫] পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নের ছয়ানিপাড়ার রাখাইনদের কৃষিজমি তাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও অধিগ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে বারবার প্রশাসন বরাবর নিজেদের কৃষিজমি সুরক্ষার আবেদন[৭৬] জানিয়েছে তারা। আবেদনপত্রে তারা জানায়, ইটবাড়িয়া মৌজার জেএল নং-৮, ১৮১, ১৮২

ও ২২৯ নং খতিয়ানে রাখাইনদের ১২ একর কৃষিজমি আছে। এই জমি অধিগ্রহণ না করে রাখাইনদের কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহের আবেদন করে তারা। বিষয়টি বোঝার জন্য আমাদের পায়রা সমুদ্রবন্দর ও পাশের ছয়ানি রাখাইনপাড়ার প্রেক্ষাপট হাজির করা জরুরি।

পটুয়াখালীর কলাপাড়ার টিয়াখালী ইউনিয়নের ছয়ানিপাড়াটি[৭৭] গড়ে ওঠে খ্রিষ্টীয় ১৭৬০ সালের দিকে। বর্তমানে গ্রামটির মাতবর গংশে, যিনি গংশে মাতবর নামেই বেশি পরিচিত। মোধুপ্রিমাই (পায়রা) এবং টিয়াখালী ম্রাই (টিয়াখালী) নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা ছয়ানিপাড়া গ্রামটির উত্তর দিকে ছয়ানিপাড়া খাল, যেখানে একটি স্লুইসগেট আছে। পূর্বে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সড়ক, পশ্চিমে গাজীবাড়ি মধ্য টিয়াখালী গ্রাম এবং দক্ষিণে কৃষিজমি ও মোধুপ্রিমাই নদী। রাখাইন ভাষায় মো মানে খুব বৃষ্টিপ্রবণ, ম্রাই মানে নদী। মোধুপ্রিমাই মানে বৃষ্টিপ্রবণ এলাকার নদী। ফ্রু ওয়ে মা ও পৌম মাতবর ছয়ানিপাড়ার পত্তন করেন। তাঁদের সন্তান লুফ্রু মাতবর। লুফ্রু মাতবর ও মামাসি-মেলাফ্রুর চার ছেলে ও দুই মেয়ে। লুফ্রু ও মামাসির দুই কন্যা প্রুমাইয়ে এবং চিলাউয়ে। দুই বোনের ভেতর চিলাউয়ে অবিবাহিত এবং তিনি পারিবারিক আট কানি জমি পেয়েছিলেন, যা বাঙালিরা জোরপূর্বক দখল করেছে। প্রুমাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় পটুয়াখালীর কলাপাড়ার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের মরিচবুনিয়ার গংশে মাতবরের এবং বিয়ের পর তাঁরা ছয়ানিপাড়াতেই বসবাস করছেন। প্রুমাইয়ে ও গংশে মাতবরের পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে। পরিবার থেকে গংশে মাতবরের পুত্র সাত একর কৃষিজমি পেলেও কন্যা মামাএ এখনো কোনো জমি পাননি। পৌও মাতবর যখন ছয়ানিপাড়ার প্রধান ছিলেন, তখন এখানে ৬৫ পরিবার রাখাইন ছিল। ২০১৭ সালের মার্চে দেখা যায় ১০ পরিবার কিন্তু ঘরসংখ্যা ৭। মোট জনসংখ্যা ৩০ জন। এর ভেতর নারী ১৩ জন, পুরুষ ১৭ জন, শিশু দুজন এবং প্রবীণ পাঁচজন। তবে একজন নারী চিলাউয়ে কেবল বয়স্ক ভাতা পান। গ্রামে কোনো বিধবা নেই। গ্রামে লেবনটু ও মংচোর পরিবার মাছ ও কুচিয়া শিকার করে। এরাই গ্রামের জেলে পরিবার, তবে তাদের কোনো জেলে কার্ড নেই। গ্রামে প্রাপ্তবয়স্ক সবার জাতীয় পরিচয়পত্র আছে। ছয়ানিপাড়া থেকে খালপাড় হয়ে পাশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসতে হয়। এখান থেকে এ পর্যন্ত দুজন মেয়ে ও তিনজন ছেলে মোট পাঁচজন এসএসসি পাস করেছে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে স্নাতকোত্তরে অধ্যয়নরত। মাচান নামের একজন নারীশিক্ষক নিয়োগের নিবন্ধন পরীক্ষা দিয়েছেন। গ্রামে একজন দাইমা ও একজন কবিরাজ আছেন। গ্রামের মানুষের ১১টি চুঁয়ে (মহিষ), ২টি শূকর, ১৫টি গরু, ৪০টি ছাগল আছে এবং প্রতি পরিবারই হাঁস-মুরগি পালে। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরে এই গ্রাম পুরোটাই তলিয়ে যায় এবং রাখাইনরা আবার সবকিছু গড়ে তোলে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ছয়ানিপাড়ার

রাখাইন ভূমি অধিগ্রহণ শুরু হয় নানাভাবেই। ২০১৪ সালে রাখাইনদের ১০ কড়া (৩৩ শতক) জায়গা নিয়ে স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রামের উত্তরে ছয়ানিপাড়া খালে একটি স্লুইসগেট তৈরি করে। খালের ধারে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক পবিত্রস্থল, রাখাইন ভাষায় বলে 'চোয়ঁসাবা'। তিন শতক এই পবিত্রস্থলে ৪টি প্রাচীন চোয়াঁবা (করঞ্জা) ও ১০টি জাবলংবা (খেজুরগাছ) গাছ আছে। গ্রামের মানুষ এই পূজাস্থলে মানত ও দৈনন্দিন নানা পূজাকৃত্য পালন করে। এ ছাড়া বছরে চৈত্রসংক্রান্তিতে সাংগ্রেংপোওয়ে, আশ্বিন পূর্ণিমায় ওয়াজআ এবং শ্রাবণ পূর্ণিমাতে ওয়াসো উৎসব আয়োজিত হয়। পায়রা বন্দরের জন্য ছয়ানিপাড়ার ১০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। এর ভেতর ৫ একর আম্রালে বা মাঝারি উঁচু জমি এবং ৫ একর আন্নিলে বা নিচু জমি। সব জমিনই কয়েক ফসলি জমি। এখানে আমন ও বোরো মৌসুমে ধান হয়, রবিশস্য ফলে এবং মহিষ চরে। গ্রামে একটি প্রাচীন কিয়াংঘর বা মন্দির ছিল। পায়রা বন্দরের জমি অধিগ্রহণ শুরু হলে ২০১৫ সালে মন্দিরটি গ্রামের ভেতর পুকুরপাড়ে এনে এখন অস্থায়ীভাবে তৈরি হয়েছে।

পায়রা বন্দরের জন্য ছয়ানি রাখাইনপাড়ার বৌদ্ধমন্দির পর্যন্ত সরিয়ে একেবারে ঘরের কাছে নিতে হয়েছে। এতে চারদিকে গ্রামটি ছোট হয়ে এসেছে। কেবল আয়তনে ছোট নয়, ছয়ানিপাড়ার চারদিকে উন্নয়নের যে বাহাদুরি চলছে তার ভেতর আত্মপরিচয় ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোনো রাখাইন গ্রামের টিকে থাকা বিপজ্জনক। ছয়ানিপাড়ার বেড়িবাঁধসংলগ্ন রাখাইনদের জমি দখল করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী তিন ভাই গাজী শামীম, গাজী সুমন ও গাজী রিয়াজ ঘর নির্মাণ করছে। ছয়ানিপাড়ার প্রধান চিংদামো এই জরবদখলের বিরুদ্ধে কলাপাড়া থানায় মামলা করলেও থেমে নেই ঘর নির্মাণের কাজ। পায়রা বন্দর ও বন্দর সংযোগ সড়কের জন্য রাখাইনদের ১০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭.৬৯ একর জমি বাঙালি ভূমিদস্যুরা তাদের মালিকানাধীন বলে আদালতে মামলা করেছে। তাই অধিগ্রহণকৃত নিজ জমির ক্ষতিপূরণ ভোগ করা নিয়ে রাখাইনরা আশঙ্কায় আছে। বন্দর নির্মাণ এবং পরবর্তী সময়ে বন্দর কার্যক্রমের জন্য রাখাইনরা আশপাশের জমিতে কৃষিকাজ বা নিজেদের উৎপাদন কীভাবে করবে বা আদৌ কৃষি এসব জায়গায় হবে কি না, বা বন্দরের জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা কেমন হবে কিংবা আদৌ এক বৃহৎ বন্দরের সামনে এক ছোট্ট রাখাইন গ্রাম টিকতে পারবে কি না, এই প্রশ্ন ছয়ানিপাড়াতে বারবার ঘুরেফিরে আসে।

একদিকে বৃহৎ পায়রা বন্দর এবং অন্যদিকে এক ছোট আদিবাসী প্রাচীন রাখাইন গ্রাম। এটি বন্দর বনাম আদিবাসী গ্রামের কোনো তর্ক নয়। এটি রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন দর্শনের মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। এটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র এবং শ্রেণিচেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। হয়তো একটি বন্দর একটি রাষ্ট্রের জন্য অনেক

বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে। কিন্তু এর ভেতর কীভাবে কোনো এক প্রাচীন আদিবাসী রাখাইন গ্রাম একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, এটিও নিশ্চয়ই মাতৃদুনিয়ায় টিকে থাকার প্রশ্নে এক মৌলিক জিজ্ঞাসা। ছয়ানিপাড়ার খালের ধারের প্রাচীন 'চোয়াঁসাবায়' প্রতিবছর চৈত্রসংক্রান্তিতে সাংগ্রেংপোওয়ে, আশ্বিন পূর্ণিমায় ওয়াজআ এবং শ্রাবণ পূর্ণিমাতে ওয়াসো উৎসব আয়োজিত হতো। নানান জায়গার মানুষ আসত। রাখাইনদের পাশাপাশি বাঙালি মুসলিম, হিন্দু কত মানুষ। মেলা বসত এবং নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। পায়রা বন্দর নির্মাণের পর থেকেই এর আয়োজন যেন থেমে গেছে। ২০১৭ সালে শেষ হয়েছে ১৩৭৮ মগী সন। রাখাইন পঞ্জিকামতে ছয়ানিপাড়াতে বৈশাখের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত পানিখেলা হতো আগে দারুণ জাঁকজমকভাবে। ১৩৭৯ মগী সনে কেবল নিয়মরক্ষার্থে পানিখেলা হয়েছে। সেই উৎসব ও আয়োজনের সব আমেজ একেবারেই যেন চুরমার হয়ে গেছে।

দেম্রিংগো ঙারো পাথমা লারে

বাঙালিদের সঙ্গে ভূমি নিয়ে রাখাইনদের মামলা-হামলাই কেবল নয়, তৈরি হয়েছে এক দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব ও সংঘাত। এ নিয়ে রক্ত যেমন ঝরে, হয় বিতণ্ডাও। বরগুনার তালতলীর মংথান চানের[৭৮] দাবি বাঙালিরা তাঁদের জমি দখল করে অন্যায়ভাবে ভোগ করছে। অপরদিকে বাঙালিরা এর কোনো উত্তর না দিলেও তাঁকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মংথানের মতো ভূমি হারানো রাখাইনরা খেপে গিয়ে চিৎকার করে রাখাইন ভাষায় বলে, দেম্রিংগো ঙারো পাথমা লারে (আমরা এখানকার প্রথম বসতিস্থাপনকারী)।

বরগুনার জেলা প্রশাসকের কাছে এলাকার রাখাইন জনগণ ২০০২ সালে দাবি জানায়, রাখাইনদের বৌদ্ধমন্দির ও বিহারগুলো থেকে শতাধিক বৌদ্ধমূর্তি চুরি ও অন্যত্র পাচার হতে থাকলেও অদ্যাবধি কোনো প্রতিকার হচ্ছে না।[৭৯] কিন্তু তারপরও অন্যায়ভাবে বৌদ্ধমন্দির ও রাখাইন গ্রাম থেকে চুরি ও ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে মূর্তি ও স্মারক। ২০০৮ সালে বরগুনা জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে পটুয়াখালী-বরগুনা জেলায় বসবাসরত আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানে রাখাইন সম্প্রদায়ের খাসখতিয়ানভুক্ত জমি রাখাইনদের মধ্যে বিধিমোতাবেক বিতরণ, দুষ্টচক্র যেন রাখাইনদের জমি থেকে ফসল কেটে না নিতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রাখাইনদের বৌদ্ধমূর্তি চুরি বন্ধ করার নির্দেশ জারি করে একটি প্রজ্ঞাপন[৮০] জারি হয়। এই সরকারি নির্দেশের মাত্র দুই বছর পরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বরগুনা সফরকালে তালতলীর রাখাইন জনগণ তাঁকে জানায়, 'রাখাইন সম্প্রদায় একটি অনগ্রসর ক্ষয়িষ্ণু জনগোষ্ঠী'।[৮১]

রাষ্ট্রে কোনো জাতি যখন নিজেদের 'অনগ্রসর' আর 'ক্ষয়িষ্ণু' হিসেবে পরিচয় করায়, নিশ্চয়ই এটি কিছু জরুরি রাজনৈতিক বার্তা জানায়। রাষ্ট্র কেন সেই বার্তা গুরুত্ব দেয় না, এটিই বিস্ময়কর! কেন রাখাইন জনপদে এখনো এই ক্ষয়িষ্ণুতা এবং অনগ্রসরতা আরও তীব্র ও অসহনীয় হয়ে উঠছে? তালতলীর কবিরাজপাড়ার রাখাইন নেতা ধনু শ্যের বক্তব্য যুক্ত করে আশিক হোসেন লিখেছেন[৮২], জায়গাজমি বেদখল হওয়ার কারণে অনেক রাখাইনই এলাকা ছেড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা আরাকান চলে গেছে। এ ধরনের পরিসংখ্যান ও বিবরণ নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে আঘাত করে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নচিন্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

পটুয়াখালী ও বরগুনা অঞ্চলে রাখাইন ভূমির বড় অংশই দখল হয়েছে বাঙালি বলপ্রয়োগে। অথচ এই ভূমিখেকোরাই একদিন সর্বস্বান্ত হয়ে পিরোজপুর, বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালীসহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে রাখাইনদের কাছে এসে আশ্রয় ও কাজ চেয়েছিল। রাখাইনদের জমি ও বাড়িতে কাজ করে আশ্রয় পেয়েছিল। আজ এই বাঙালিরাই রাখাইনদের নিজ ভূমি থেকে নানান 'ছলচাতুরী' করে রাখাইনদের ভূমিচ্যুত ও আশ্রয়হীন করছে। রাখাইনরা লাগাতার এই ভূমি ছিনতাইয়ের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান আন্দোলন গড়ে না তুললেও জিইয়ে রেখেছে টানটান ভূমি জিজ্ঞাসা। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ সর্বত্রই আছে রাখাইন জাতির টগবগে রক্ত। উস্যুয়ে রাখাইন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের একজন অন্যতম সংগঠক। অথচ রাষ্ট্র রাখাইন ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি আজও। এটি স্মরণ রাখা জরুরি, মাতৃভাষা টিকে থাকার অন্যতম শর্ত ভাষার অবিচ্ছিন্ন চর্চা ও বিকাশ। আর এটি টিকে থাকে ভূমি, জল, উৎপাদনের সঙ্গে মিলেমিশে। ভূমি ছিনতাই হলে ভাষাও হারিয়ে যায়। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে কত বিশ্ববিদ্যালয় আর সড়ক ও সেতু নির্মিত হয়েছে। ভাষাসৈনিক উস্যুয়ের নামে একটি স্থাপনার নামও আমরা চিন্তা করিনি। আজ নিজ ভূমি থেকে উদ্বাস্তু ও বিতাড়িত হয়ে কত রাখাইন দিনমজুর নিরুদ্দেশ, তার কোনো হদিসও রাখেনি রাষ্ট্র। বিস্ময়কর হলো নিরন্তর উচ্ছেদ ও বঞ্চিত হলেও রাখাইনরা কখনোই রাখাইন আত্মপরিচয় ও রাখাইন মনস্তত্ত্ব থেকে বিস্মৃত হয়নি। এমনকি রাখাইনদের হুটহাট করে যেকোনো পেশা ও উৎপাদনেও জড়িয়ে পড়ার নজির কম। ড. মুস্তাফা মজিদের লেখা থেকেও জানা যায়, চারদিকে নদী, খাল, সাগর থাকলেও প্রথম দিকে রাখাইনরা মাছধরাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তাদের কেউ কেউ কক্সবাজার অঞ্চলে মাছ ধরাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে।[৮৩]

বাংলাদেশে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী দ্বীপে প্রথম রাখাইন বসত গড়ে ওঠার নানা তথ্য জানা যায়। রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পটুয়াখালীর সভাপতি ইয়ং সিং দ্য *ইন্ডিপেনডেন্টকে*[৮৪] জানান, ১৭৯৪ সালের দিকে ৫০টি

নৌকায় করে রাখাইনদের ১৫০ পরিবার প্রথম চর কুকরিমুকরিতে[৮৫] আসে। মুদ্রিত এই রাখাইন জনগণের অভিবাসনের ইতিহাসটি দুই শ বছরের প্রাচীন, কিন্তু রাখাইনদের মৌখিক বয়ানে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা রাখাইন সভ্যতার নজির আছে। রাঙ্গাবালী দ্বীপে আগমন এবং রাঙ্গাবালী দ্বীপ থেকে ক্যানছাই চোওয়ান বা কুয়াকাটায় স্থানান্তর এটিই কেবল বাংলাদেশে রাখাইনদের বসতিস্থাপনের চিত্র নয়। আমাদের চিন্তাকে সেই রাখাইন প্রবাদের মতো আবারও নানা প্রবাহ ও ধারায় বিন্যস্ত করা দরকার। রাখাইন প্রবাদের মতো আমাদেরও প্রশ্ন করা দরকার, রাখাইন ভূমিসংকটকে আমরা কীভাবে দেখব? চাটাইয়ে শুয়ে নাকি তলোয়ারের কোপ ডিঙিয়ে?

চলতি আলাপে উল্লিখিত রাখাইন প্রবাদের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যদি কোনো এলাকা বসবাসের উপযোগী না থাকে, তবে ওই এলাকা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে হবে। রাখাইনদের স্থানান্তরের ইতিহাসে নদীপথ, সমুদ্রপথ ও স্থলপথের বিবরণ নানাভাবে জড়িয়ে আছে। রাখাইনদের বসতিস্থাপনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, রাখাইনরা কীভাবে সমুদ্র পাড়ি দিল? এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সমসাময়িককালে খুঁজে পাওয়া এক সমুদ্রগামী নৌকার হদিস আমাদের কাছে রাখাইনদের উপকূল অঞ্চলে বসতিস্থাপনের ইতিহাসে কিছু মৌলিক জিজ্ঞাসা যোগ করতে পারে। সমুদ্রসৈকতে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননের[৮৬] ভেতর দিয়ে দেশের প্রথম উদ্ধারকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নৌকাটি রাখাইনদের, আরব বণিক না পর্তুগিজদের এ নিয়ে একটা তর্ক আছে। শাল, গর্জন নাকি ওকগাছের কাঠ দিয়ে এটি নির্মিত, এ নিয়েও নানা মত। যদিও বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখতে পেয়েছে নৌকাটি জারুল কাঠের বানানো। প্রশ্ন উঠেছে, নৌকাটি কত আগের এবং কাদের? একটি পক্ষের মতে, এটি রাখাইনদের[৮৭] নৌকা এবং এ রকম নৌকা দিয়ে আরাকান থেকে রাখাইনরা এ অঞ্চলে এসেছিল। তবে কেউ বলেছেন, এটি আরব বণিকদের বা পর্তুগিজদের তৈরি। নৌকাটির বয়স এক শ পঞ্চাশ থেকে আড়াই শ বছর ধারণা করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে এই নৌকার সুরক্ষা ও সঠিক ইতিহাস কেবল বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস নয়, রাখাইনদের জন্যও জরুরি। এ রকম এক প্রাচীন নৌকাকে ঘিরে সুইডেনের ভাসা জাদুঘরের মতো করে নয়, কুয়াকাটার নৌকাটির ঐতিহাসিক উপস্থাপনে স্থানীয় রাখাইন জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামত জরুরি হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, নৌকাটির সঙ্গে রাখাইনদের সম্পর্ক আছে কি না? এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা জরুরি। তবে খুঁজে পাওয়া এই কাঠের নৌকার বিষয়ে রাখাইন প্রবীণজনের স্মৃতি ও মৌখিক বয়ান জানায়, কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে পাওয়া প্রাচীন নৌকাটি রাখাইনদের ব্যবহারের নৌকা হতে পারে। তবে তা হয়তো সমুদ্র উপকূলে

ব্যবহারের জন্য বা সমুদ্রমোহনা ও বড় নদীতে ব্যবহারের জন্য হতে পারে। নৌকায় ব্যবহৃত কাঠ, নৌকার গড়ন, দড়ির বুনন, স্থানান্তর ও জলপথের স্মৃতিকথা, এবং নৌকায় ধানের উপস্থিতি থেকে প্রবীণজনেরা এই ধারণা করছেন। রাখাইনদের কেউ কেউ মনে করছেন, এই নৌকা দিয়ে রাখাইনরা মিয়ানমারের আরাকান ও বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে চলাচল করেনি। হয়তো রাখাইনরা পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী থেকে কুয়াকাটায় এমন নৌকা স্থানান্তর করেছিল। রাখাইনরা যে রকম নৌকায় চেপে মিয়ানমারের আরাকান থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের চর কুকরিমুকরি এসেছিল, সেই সময়কার নৌকাগুলোর ধরন এবং নির্মাণশৈলী ছিল খুঁজে পাওয়া এই কাঠের নৌকা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে কোনো গাছের কাঠ নয়, ব্যবহৃত হয়েছিল একধরনের বুনো পাহাড়ি বেত। যাকে রাখাইন ভাষায় বলা হয় নাবেহ ক্রিং। বাংলাদেশের উপকূলের রাখাইনদের ভেতর এ রকম নৌকা বুনন কারিগর এখন কেউ আছেন কি না, জানা যায়নি। এই নৌকার সঙ্গে রাখাইনদের সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত না হলেও নৌকাযোগে এক বসতি থেকে আরেক বসতিতে স্থানান্তর বারবার এটিই প্রমাণ করে যে, রাখাইনদের নানা সময়ে আগের বসতি ছেড়ে আরেক নয়াবসতির খোঁজে যেতে হয়েছে। এটি হাজার বছর ধরেই চলছে। চলতি আলাপে উল্লিখিত প্রবাদেও সেই প্রমাণই উপস্থিত।

হম্ম্যা তাখালে মেপ্রে

সংখ্যালঘু হওয়া পাপ। সংখ্যালঘু হওয়া অভিশাপ।
রাখাইনরা নিজেদের সংখ্যালঘু হিসেবে হেয়প্রতিপন্ন করতে করতে শেষ হয়ে যায়।[৮৮]

আবারও আরেক রাখাইন কথা। হম্ম্যা তাখালে মেপ্রে। মানে চিহ্ন কখনোই মোছে না। রাখাইনরা বিশ্বাস করে, দুনিয়াতে কোনো চিহ্ন তৈরি করলে তা কোনোভাবেই মুছে ফেলা যায় না। তার কোনো না কোনো দাগ থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালি জাত্যভিমান কিন্তু রাখাইন চিহ্ন সব মুছে দিতে চায়, অস্বীকার করে। এটি কেবল ভূমিদখল নয়, মনস্তাত্ত্বিকভাবেও তা নানাভাবে উগরে দেয়। এই অংশের শুরুতে একজন জনপ্রতিনিধির ভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি মনে করেন, রাখাইন হয়ে জন্ম নেওয়ার কারণে একধরনের হীনম্মন্যতার দরুন মূলত রাখাইনরা আজ নিঃস্ব ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। রাখাইনদের ভূমিদখলের যাবতীয় অন্যায়কে আড়াল করার এটি এক অধিপতি রাজনৈতিক কায়দা। বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ রাখাইন ভূমির নাম প্যাঙওয়া। মানে হলুদ ফুলের দেশ। কক্সবাজারের রামুর রাখাইন নাম প্যাঙওয়া। ক্যহ্লাউ এবং খেপউ দুই রাখাইন ভাইয়ের নামেই আজকের কলাপাড়া ও খেপুপাড়া। ক্যানছাই চোওয়ান আজকের কুয়াকাটা। রাজধানী ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের

নাম মগবাজার। রাখাইন জনগণ দেশের উপকূলে সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। এই চিহ্ন জোর করে মুছে ফেলা যাবে না। ৬০ বছরের চান চান একজন রাখাইন কৃষক। তাঁর জন্ম পটুয়াখালীর কলাপাড়ার লতাচাপলী ইউনিয়নের গোড়াআমখোলাতে। তাঁর মা ম্যা মা প্রু এবং বাবা চা মি স্যে। চান চান জানান, তিনি শৈশব থেকেই গোড়াআমখোলাকে একটি রাখাইনপাড়া দেখে বড় হয়েছেন। ২০০১ সালেও এখানে ৪০ ঘর রাখাইন ছিল। পরবর্তী সময়ে সরকারিভাবে এখানে আশ্রয়ণ প্রকল্প শুরু হলে বাইরে থেকে আরও ২০-২৫ পরিবার এখানে আসে। সরকারিভাবে এখানে ৩০টি পরিবারের জন্য টিনের ঘর করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এখানে পূর্বের পাড়া ও আশ্রয়ণ প্রকল্প মিলিয়ে মোট ৪০ পরিবার রাখাইন আছে।

৮১ বছরের চিংমং একজন রাখাইন বংশীবাদক ও কৃষক। বর্তমানে তিনিও চান চানের মতো গোড়াআমখোলা আশ্রয়ণ প্রকল্পে তিন কন্যা, দুই পুত্র, স্ত্রীসহ বসবাস করছেন। তাঁর মা মেওয়ার জন্ম ছয়ানিপাড়ায় এবং বাবা লাব্যুর জন্ম ছয়ানিপাড়ার কাছে। ছয়ানিপাড়ায় জলোচ্ছ্বাসের কারণে পুরো এলাকা কোনো বেড়িবাঁধ না থাকায় লবণাক্ত হয়ে পড়ায় চিংমংয়ের পরিবার তুলাতুলীপাড়ায় চলে যায়। চিংমংয়ের জন্ম পটুয়াখালীর কলাপাড়ার দুলেশ্বর ইউনিয়নের তুলাতুলীপাড়াতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তুলাতুলীপাড়া থেকে তাঁরা উচ্ছেদ হয়ে কলাপাড়ার খাপড়াভাঙা ইউনিয়নের রূপপাড়াতে চলে যান, সেখানে প্রায় ১২ বছর ছিলেন। তুলাতুলীপাড়ায় ৪৫ পরিবার রাখাইন ছিল, মুক্তিযুদ্ধের সময় সবাই উচ্ছেদ হয়ে যায়। এখন আর সেখানে কোনো রাখাইন নেই। রূপপাড়াতে থাকার সময়ও কয়েকবার বড় বন্যা হয়। বন্যার ফলে রাখাইনরা এই পাড়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময়ে বাইরে থেকে বাঙালিরা এই পাড়াটি দখল করে। শেষ ১২ পরিবার রাখাইনও রূপপাড়া ছেড়ে চলে যায়। ১৯৮০ সালে তারা গোড়াআমখোলা চলে আসে। তখন পাড়ার মাতবর ছিলেন না মি স্যে মাতবর। তখন ৪০ পরিবার রাখাইন ছিল গোড়াআমখোলাপাড়ায়। ১৯৮২ সালে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করে বাঙালিরা এই পাড়ার জমি দখল করতে থাকে। বাধ্য হয়ে চিংমং অন্য অনেকের সঙ্গে মিয়ানমারের মংডুতে চলে যান। মংডুতে মংথান চিংয়ের পরিবার থেকে গেলেও চিংমংসহ অন্যরা আবার নিজ দেশে ফিরে আসেন। ২০০১ সালে সরকারিভাবে আশ্রয়ণ প্রকল্প হওয়ার পর গোড়াআমখোলাতে চিংমং একটি ঘর পান। তবে ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরে তাঁদের আবারও বসতবাড়ির ক্ষতি হয়। রাখাইন সংস্কৃতির এক অন্যতম রীতি হলো নিজ শরীরে স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করা। ম্যা থোঁড়ে নামের একধরনের প্রথাগত উলকি আঁকার ভেতর দিয়ে এটি করা হয়। চিংমংয়ের ডান হাতে তাঁর কৈশোরে তুলাতুলীপাড়াতে ম্যা থোঁড়ে আঁকা হয়। তাঁর হাতে ন্যাজিপ্যাঁ ও চৌসের প্রতীক আঁকা আছে। ন্যাজিপ্যাঁ সমুদ্রের বালিয়াড়িতে

জন্মানো একধরনের বুনো গোলাপ এবং চৌসে হলো ঝোপঝাড়ে বাস করা মৌটুসি পাখি। এই পাখি ও ফুলের চিহ্নই চিংমংকে একজন রাখাইন পুরুষ হিসেবে বিশেষ পরিচয় জানান দেয়। এমনকি তাঁর জন্ম ও বসবাস এলাকা সবকিছু নির্দেশ করে। চিংমংয়ের জন্মমাটি থেকে শুরু করে নানান সময়ে তাঁর বসবাস এলাকাগুলো আজ রাখাইনশূন্য হয়েছে। রাখাইন ভূমি থেকে রাখাইনদের উচ্ছেদ হতে হয়েছে। চিংমং তাঁর ভূমিসংকটের খতিয়ান বয়ান করলেও ডান হাতের ম্যাথোঁড়ে স্মৃতিচিহ্নকে গর্ব নিয়ে সামনে তুলে ধরেন। তাঁর ভাষ্য, জোর করে সব মুছে ফেলা যায় কিন্তু চিহ্ন কখনোই মুছে ফেলা যায় না। চলতি আলাপখানি আবারও সেই রাখাইন প্রবাদকে স্মরণ করছে। এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, বরিশাল বিভাগের রাখাইনদের ভূমিসংকটের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলোই হলো প্রবাদে বর্ণিত 'বাঁধ'। ভূমিদখল, উপকূলীয় বাঁধ, অধিগ্রহণ, রাষ্ট্রীয় অবহেলা, জাতিগত নিপীড়ন, বাঙালি জাত্যভিমান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাখাইন সংস্কৃতির প্রতি উদাসীনতা, রাজনৈতিক বাহাদুরি, বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প সবকিছুই আজ রাখাইনদের বসতির বেঁচে থাকার প্রাণপ্রবাহগুলোকে হুমকিতে ফেলছে। প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। এ কারণেই এখনো এক বসত থেকে আরেক বসতিতে রাখাইনদের প্রশ্নহীন উচ্ছেদ ও স্থানান্তর ঘটছে।

বরিশাল অঞ্চলের রাখাইনদের ভূমিসংকটকে আড়াল করার সব প্রাতিষ্ঠানিক এবং জাত্যভিমানী কায়দাকে প্রশ্ন করছে এবং রাখাইন ভূমিজীবনের ন্যায়বিচার প্রার্থনা করছে। রাখাইনরা জানে, চারদিকের প্রবল আঘাত আর যন্ত্রণায় একসময় আদিবসতিগুলো তার চেহারা ও বৈশিষ্ট্য হারায়। তখন আদিবসত থেকে স্থানান্তরিত হতে হয় আরেক নয়াবসতির খোঁজে। তবে এই স্থানান্তর প্রশ্নহীন ঘটে না। প্রবাদে স্থানান্তরপ্রক্রিয়ায় রাখাইন জীবনের সক্রিয়তাকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একদিকে চাটাই এবং আরেকদিকে তলোয়ারের কোপ। একদিকে প্রশ্ন ও লড়াই এবং আরেকদিকে অন্যায় সয়ে প্রশ্নহীন নিরুদ্দেশ। বরিশাল বিভাগের রাখাইন জনগণ ভূমিসংকট প্রশ্নে জিইয়ে রেখেছে এক অবিনাশী প্রতিরোধ। জরুরি হলো, আমরা কী কায়দায় এই প্রতিরোধে শামিল হব কিংবা একে ধারণ করার চেষ্টা করব। রাখাইন জীবনের ভূমিচিহ্নগুলো আরও টগবগ হয়ে উঠবে চলতি আলাপে। এই আশায় এখানে ইতি টানছে।

ঋণস্বীকার : বরিশাল অঞ্চলের রাখাইনদের ভূমিসংকটকে বোঝার জন্য এই জ্ঞানভাষ্য বহনকারী রাখাইন জনগণের কাছে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। বিশেষ করে চলতি আলাপখানি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বরগুনা ও পটুয়াখালীর প্রবীণ ও তরুণ রাখাইনজনেরা এবং নানাভাবে সংশ্লিষ্ট সবার কাছেই চলতি আলাপখানি আজন্ম ঋণী। কেবল রাখাইন মানুষের স্মৃতি, নথি, দলিল, দর্শন বা বিশ্লেষণ নয়, চলতি আলাপখানি লেমুজি, সিজমু, প্রু মা চা কাউহ্নিয়া, রি উন বে, মো হেঁ, মুন্ডি,

লাইত, কজয়সি, উমায়ত লেতাউ, খ্রাইসাঁইন্তি, গ্রাইংখতি, নবিউবেন লেতাউ, কয়ঁজে নাপ্পি, ক্রেত, ডাইন, চাথফমু, মি মা কাউহিয়া, কেমবি, পাডগাতি লেস্যু, নব্যিউফু লেসউ, কেন্না, মেছেল্ল্যম, চংরংছ্রি, ফ্রেতি, খ্যাজি, খারাস্যাঁইতির মতো বৈচিত্র্যময় রাখাইন খাদ্যরীতির কাছে ঋণী। চলতি আলাপে উপস্থাপিত সব তথ্য একতরফা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হলে বরিশাল অঞ্চলের রাখাইন জনগণ মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের আইনি লড়াই করার অধিকার রাখেন।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. এটি মো. সুলতান হাওলাদারের ভাষ্য (৭৫)। পায়রা নদীর এই প্রবীণ জেলের সঙ্গে ঢাকা থেকে তালতলী যাওয়ার পথে 'সুন্দরবন-৫' লঞ্চে আলাপ হয়। বাড়ি-খেপুপাড়া, টিয়াখালী ইউনিয়ন, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। তিনি জানান, খেপুপাড়া আগে রাখাইন-অধ্যুষিত ছিল। তাঁদের মতো কিছু হাওলাদার বংশ ছিল আদি বাঙালি মুসলিম পরিবার। ছিল কিছু বনেদি বাঙালি হিন্দু পরিবার। মা-গুরসে আরা ও বাবা-হাশেম হাওলাদার। তাঁর দাদার নাম সাদের হাওলাদার ও পইদাদার নাম মইদন হাওলাদার। সুলতান হাওলাদারের মতো এলাকার অনেক বাঙালির কাছে 'রাখাইনরা' এখনো 'বার্মিজ' নামে পরিচিত।

২. বিস্তারিত জানতে দেখুন: Bangladesh Population and Housing Census 2011: Community Report: Zila: Barguna, July 2013, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পৃ. ১২।

৩. বরগুনা, পটুয়াখালী ও কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইনদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এই হিসাব করা হয়েছে। এখানে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান কারিতাস-বরিশাল অঞ্চলের রাখাইন জরিপ থেকেও তথ্য নেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই হিসাব করা হয়েছে।

৪. বিস্তারিত জানার জন্য বরগুনার তালতলীপাড়ার মংতাহানের (৭৬) লেখাটি পড়ুন। লেখাটির শিরোনাম 'পটুয়াখালীর রাখাইন'। এটি একটি অপ্রকাশিত রচনা এবং মংতাহানের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, এর কিছু অংশ প্রকাশিতও হয়েছে। ২০১৭ সালের ১৮ মার্চ মংতাহান লেখাটি ফটোকপি করে আমাকে দেন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, পটুয়াখালীর ১৪৪টি এবং বরগুনার ৯৩টি রাখাইনপাড়ার নামের তালিকা তৈরি। চলতি আলাপেও মংতাহানের সেই তালিকা প্রধান সূত্র হিসেবে যুক্ত হয়েছে। কৃষিজীবী পেশার সঙ্গে জড়িত থাকলেও মংতাহান একজন গুরুত্বপূর্ণ গবেষক ও লেখক। মংতাহানরা বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের আদিবসতিস্থাপনকারী। তাঁর মায়ের নাম-লা মা প্রু ও বাবা-প্রু থা উ। মংতাহানের জন্ম পটুয়াখালীর কুয়াকাটার লতাচাপলী ইউনিয়নের গোড়াআমখোলা গ্রামে। বিয়ের পর ১৯৬৫ সালে তিনি শ্বশুরবাড়ি এলাকা বরগুনার তালতলীর বড়বগী ইউনিয়নের তালতলী রাখাইনপাড়ায় চলে আসেন এবং বর্তমানে এখানেই বসবাস করছেন। মংতাহানের দাদুর নাম প্রু লা উ এবং প্রু লা উয়ের বাবার নাম চাথন হালদার। এঁরা পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীর সাত্রংপাড়া ইউনিয়নের বড়বাইশদিয়াতে ছিলেন। সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে কুয়াকাটার গোড়াআমখোলায় চলে আসেন। বড়বাইশদিয়া গ্রামে তাঁদের ৪৩ একর জমি নিয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে মামলা চলছে। বৈবাহিকসূত্রে তিনি তাঁর স্ত্রী মা থান চিংয়ের পারিবারিক জমিরও মালিকানা পেয়েছিলেন। মা থা চিংয়ের বাবার নাম মং চিং

তালুকদার এবং মায়ের নাম মা বউ। মা বউ উত্তরাধিকারসূত্রে ৩২ একর জমি পেয়েছিলেন তালতলীপাড়ায়। মা বউ থেকেই মা থান চিং পেয়েছেন জমির উত্তরাধিকার। সেখানকার ২৫ একর জমি বাঙালিরা নানাভাবে কিনে নেয়। কিন্তু বাকি ১৫ একর জমি বাঙালিরা জোর করে দখল করে রেখেছে এবং এ নিয়ে মামলা চলমান। মংতাহানের জন্মগ্রাম গোড়াআমখোলার তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ১১ একর জমিও বাঙালিরা দখল করে রেখেছে এবং তা নিয়েও মামলা চলছে। প্রতিদিন নিজেদের পারিবারিক জমিগুলো দখল হচ্ছে আর এ নিয়ে নানান হামলা, মামলা সামাল দিতে গিয়ে তিনি গবেষণা ও লেখালেখিতে সম্পূর্ণ সময় ও মনোযোগ দিতে পারছেন না। নিরবচ্ছিন্ন সময় পেলে তিনি উপকূলের রাখাইনদের সংস্কৃতি ও প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে চান বলে জানান।

৫. বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী ও ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে নাগরিক প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খান, দৈনিক *সমকাল*-এর প্রতিবেদক রাজীব নূর, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য-বিষয়ক গবেষক ও লেখক পাভেল পার্থ, দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এর প্রতিবেদক তানভীর আহমেদ, *নিউ এজ*-এর প্রতিবেদক ইমরান হোসেন ইমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সহসভাপতি সোনা রাণী চাকমা, মানবাধিকারকর্মী রওশন মাসুদা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক দীপায়ন খীসা, ফিল্ম মেকার লতা আহমেদ প্রমুখ।

৬. রাখাইনদের ভেতর কিছু ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও কৃত্যমূলক উপস্থাপন আছে, সেখানে অনেক ধরনের অভিনয় হয়। সেই অভিনয়রীতিকে রাখাইন ভাষায় বলে 'হাইনসাউঙরে'। কিন্তু সরকারি অফিস যখন 'অভিনয়' বলে সেটির অর্থ মূলত মিথ্যা কথা ও ছলাকলা বোঝায়। সরকারি অফিসের এই 'অভিনয়' শব্দটি রাখাইনদের ভাষাবিজ্ঞানে অনুপস্থিত বলে রাখাইনরা সরকারি অফিস থেকে প্রাপ্ত এই অভিজ্ঞতাকে বোঝাতে বাংলা 'অভিনয়' শব্দটিই ব্যবহার করে। কবিরাজপাড়ার কৃষক সিংথেন (৫৫), কৃষক মংথিন জ (৫০) ও তালতলীর তাঁত ব্যবসায়ী সানসান (৪৫) এই বিরূপ অভিজ্ঞতাকে বয়ান করেছেন। নিজের জমির অভিযোগ জানাতে গিয়ে তালতলীর মাচাংহ্লাকে (৪৫) সরকারি অফিস শারীরিকভাবেও আক্রমণ করেছে। এমনকি এই শারীরিক হামলারও কোনো বিচার হয়নি।

৭. দেখুন : রাখাইন সম্প্রদায়ের সমস্যা-সম্পর্কিত সভা প্রসঙ্গে কলাপাড়া উপজেলা প্রশাসন প্রেরিত পত্র, পটুয়াখালী, স্মারক নং-০৫-স :প্র/২১/নৃ : জনগোষ্ঠী/২০০২-০৩/২৬, তারিখ-১২/১/২০০৩।

৮. সূত্র : সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বরাবর সিডর আঘাতে বিধ্বস্ত বরিশাল বিভাগের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলো ত্বরিত সমাধানের দাবিপত্র, ২৫ জুন ২০০৮।

৯. বিস্তারিত দেখুন : Indigenous Peoples Framework 1, Primary Education Sector Development Program 3 (PEDP III): ADB TA NO. 7169-BAN, December 2010, Prepared by Project Management Office Directorate of Primary Education Mirpur-2, Dhaka-1216, p-8.

১০. বিস্তারিত জানতে দেখুন : Bangladesh Population and Housing Census 2011: Community Report: Zila: Barguna, July 2013, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

১১. বিস্তারিত জানতে দেখুন : Bangladesh Population and Housing Census

2011: Community Report: Zila: Barguna, July 2013, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পৃ. ৩৪৯।

১২. বিস্তারিত জানার জন্য বরগুনার তালতলীপাড়ার মংতাহানের (৭৬) পূর্বোক্ত লেখাটি পড়ুন। লেখাটির শিরোনাম 'পটুয়াখালীর রাখাইন'। এটি একটি অপ্রকাশিত রচনা এবং মংতাহানের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, এর কিছু অংশ প্রকাশিতও হয়েছে। ২০১৭ সালের ১৮ মার্চ মংতাহান লেখাটি ফটোকপি করে আমাকে দেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর সঙ্গে ২০১৭ সালের মার্চ মাসে আলাপ করে ওপরের সারণি-৩ হালনাগাদ করা হয়েছে।

১৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন : Abul Barkat, Shafique uz Zaman, Mir Nahid Mahmud and Muhammad Shahadat Hossain Siddiquee, 'Economic Risk Assessment Report Of The Coastal Livelihoods', CDMP, Environmental conservation management consultants Ltd (ECOMAC) in association with PRIP trust and Uttaran, Bangladesh, p-13

১৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন : Sheikh Saleh Ahammed, 2010, 'Impact of Tourism in Cox's Bazar, Bangladesh', Study report of Master in Public Policy and Governance Program, Department of General and Continuing Education, North South University, Bangladesh, p-49.

১৫. বিস্তারিত জানতে পড়ুন : ড. জগন্নাথ বড়ুয়া, ২০১৪, 'বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান', ক্লিক করুন : /http://nirvanapeace.com/buddhism-philosophy/buddhism-science/878

১৬. বিস্তারিত জানতে দেখুন : IMF Country Report No. 04/279, August 2004, Bangladesh: Poverty Reduction Strategy Paper Status Report, International Monetary Fund, p. 8

১৭. দেখুন : Bayezid Hossain, 2016, Change of Business Trends and Ownership in the Rakhine Community and its Implications: A study on the Cox's Bazar Context. This study was with a fellowship named Increasing Access to Justice for the Marginalized and Socially Excluded Equality & Community Justice Fellowship, BLAST and RIB, Dhaka, P-22.

১৮. বিস্তারিত জানতে দেখুন : Md. Sahidur Rahman, Ikhtiar Zahid, Md. Masud Rana, 2008, Phylogenetic Analysis of Rakhain Tribe of Patuakhali District, Bangladesh, In: *Journal of Ethnobiology*, ক্লিক করুন : https://ethnobiology.org/phylogenetic-analysis-rakhain-tribe-patuakhali-district-bangladesh। আদিবাসীদের সম্মতিহীন এ রকম আরও অনেক জেনেটিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নজির আছে। বান্দরবানের ম্রো, খিয়াং, খুমি, তঞ্চঙ্গ্যাদের শরীরের রক্ত নিয়ে এ রকম আরও একটি গবেষণা জানতে দেখুন : G. N. N. Sultana, R. Begum, M. Asaduzzaman, T. Ahmad, and M. Akhtar, 2015, Genetic Analysis of Y-Chromosome 17 STR in Four Indigenous Populations from Bandarban. *Biores Commun.* 1(1)| আরও দেখুন : Gazi NN,

Tamang R, Singh VK, Ferdous A, Pathak AK, et al. (2013), Genetic Structure of Tibeto-Burman Populations of Bangladesh: Evaluating the Gene Flow along the Sides of Bay-of-Bengal. *PLoS On*e 8(10): e75064. doi:10.1371/journal.pone.0075064

১৯. দেখুন : UNDP, 'Enhancing Women and Girls Adaptive Capacity to Climate Change in Bangladesh', Annex VI (b) – Environmental and Social Management Plan Green Climate Fund Funding Proposal.

২০. বিস্তারিত দেখুন : Arpon Chakraborty Joy, Promit Das, Zasharatul Islam, Rubaiya Jahan Priya, Md. Neaz Pervez, Md. Imtiaz Hossain Nahid, Rifat Ara Islam and Mohammed Rahmatullah, 2014, 'Ethnomedicinal plants of Rakhain tribal communities of two areas of Patuakhali district, Bangladesh', In: *J. Chem. Pharm. Res., 2014, 6(11):550-555*

২১. বিস্তারিত জানতে দেখুন : Sanjida Hoque, 2014, 'A Study of Adaptation Measures Practiced in Coastal Areas of Bangladesh in Response to Sea Level Rise', Thesis submitted for Master of Urban and Regional Planning, Department of Urban and Regional Planning, Bangladesh University of Engineering and Technology.

২২. দেখুন : Md Bellal Hossain, 2013, 'Tourism destination Marketing : Case Study-Kuakata Sea Beach, Bangladesh', Thesis for Degree Programme in Tourism, Centria University of Applied Sciences.

২৩. বিস্তারিত দেখুন : Md. Masudur Rahman, 2010, Exploring The Socio-economic Impacts of Tourism: A Study of Cox's Bazar, Bangladesh. This Thesis submitted to the Cardiff School of Management in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Cardiff School of Management University of Wales Institute, Cardiff Colchester Avenue, Cardiff, UK, CF23 9XR, p-233.

২৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন : Apurba Krishna Deb, 2009, 'Voices of the Fishantry: Learning on the Livelihood Dynamics from Bangladesh', A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate Studies of the University of Manitoba in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, In Natural Resources and Environmental Management, Natural Resources Institute, Clayton H. Riddell Faculty of Environment, Earth and Resources, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.

২৫. এই অংশটুকু নেওয়া হয়েছে মানবাধিকারকর্মী ও আদিবাসী সংগঠক মেইনথিন প্রমীলার একটি লেখা থেকে। পড়ুন : মেইনথিন প্রমীলা, ২০১৭, 'বরিশাল অঞ্চলের রাখাইনদের ভূমি এবং সম্পদে অধিকার : বর্তমান প্রেক্ষিত ও করণীয়', ২০১৭ সালের ১৬ মার্চ লেখক এটির ফটোকপি সরবরাহ করেন। এটি ভিন্নভাবে প্রকাশিত হলেও আমাদের কাছে একটি তারিখবিহীন লেখাই সরবরাহ হয়েছে বলে এটি 'অপ্রকাশিত' হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে,

আমতলী, বরগুনা। মেইনথিন প্রমীলার সঙ্গে যোগাযোগ করে লেখাটি পড়া যেতে পারে: promilapromi@yahoo.com

২৬. বিপ্লব রহমানের সচিত্র প্রতিবেদনটি সাপ্তাহিক *অবসর* প্রকাশনায় এপ্রিল-মে ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়। লেখাটি প্রসঙ্গে লেখক মুক্তমনা ব্লগে একই শিরোনামের একটি লেখায় জানান, রাখাইনদের দেশত্যাগ মূলত ঘটছে বাঙালিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে। উল্লিখিত প্রতিবেদনটিই বাংলাদেশে প্রকাশিত এ-সম্পর্কিত প্রথম প্রতিবেদন। যদিও লেখক সেখানে কক্সবাজারের চকরিয়া এবং বিশেষ করে প্রাচীন রাখাইন গ্রাম হারবাংয়ের অভিজ্ঞতাকে বিশেষভাবে বিস্তৃত করেছেন।

২৭. Florda Devatine, 2009, Written tradition, oral tradition, oral literature, fiuriture, Translated by Kareva Mateata-Allain, In: *Shima: The International Journal of Research into Island Cultures*, Volume 3 Number 2, 2009

২৮. পটুয়াখালীর কুয়াকাটার দিয়াড় আমখোলা গ্রামের মংম্যা এবং মহিপুরের মংঅংলুয়েন। যাঁরা বিস্তর সময় নিয়ে আমাকে রাখাইন চগর-চগরা বিষয়ে বুঝিয়েছেন। ২০ মে ২০১৭।

২৯. বিস্তারিত জানার জন্য বরগুনার তালতলীপাড়ার মংতাহানের (৭৬) লেখাটি পড়ুন। লেখাটির শিরোনাম 'পটুয়াখালীর রাখাইন'। উল্লিখিত রাখাইন প্রবাদখানি মংতাহান ২০১৭ সালের ১৯ মার্চ আমার বিশেষ অনুরোধে আমার খেরোখাতায় রাখাইন বর্ণমালা, বাংলা হরফে রাখাইন ভাষা ও বাংলাতে লিখে দেন। মংতাহানের নিজের প্রবন্ধের ভেতর উল্লেখিত প্রবাদ আর আমার খাতায় তাঁরই লিখে দেওয়া প্রবাদখানির ভেতর কিছু ব্যাকরণগত ভিন্নতা আছে। আমার খাতায় তিনি লিখেছেন, '...আরে মা দা: জা আনোইমা ত্যেনফ্যু। ত্যেনফ্যুমা মলুলীকে ক্যেওয়েন্ ফ্রাইলীমে। দাঃজাকো নেলোলাঃলী মানচালীমে।' বাংলাটি তিনি এভাবে লিখেছেন, '...পূর্বে তলোয়ার কোপ, পশ্চিমে চাটাই। চাটাইয়ে শুইবে না, গোলাম হইবে। তলোয়ার কোপ ডিঙিয়ে যাও, সুখী হইবে।' প্রচলিত প্রবাদ, আখ্যান, কিসসা বা এমনকি গীতও সময়, ব্যক্তি এবং অঞ্চলভেদে নানা ব্যঞ্জনা ও ভিন্নতা পায়। খনার বচন কিংবা ধামাইল গান নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

৩০. এই প্রবাদ নিয়ে রাখাইন নতুন প্রজন্মের সঙ্গে আলাপকালে বরগুনার তালতলী ডিগ্রি কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী দোলা ওয়েন এই ঐতিহাসিক প্রবাদকে বিশ্বাস করেন না বলে জানান। তিনি বলেন এই 'কুংসংস্কার' ঠিক নয়। আমি এ রকম বিষয়টি শুনিনি। রাখাইনরা চারপাশের চাপে এবং পরিবেশ বদলে যাওয়ার কারণেই বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করছে। রাখাইনদের দেশত্যাগে বাধ্য করানো হচ্ছে। যখন দোলা ওয়েনসহ প্রবীণ রাখাইনদের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক প্রবাদ নিয়ে আলাপ হয়, তখন দোলা ওয়েনসহ নতুন প্রজন্ম জানায়, ঐতিহাসিক রাখাইন প্রবাদের আলোকে বর্তমানের রাখাইন ভূমিসংকটকে পাঠ করা যায়। তরুণ প্রজন্ম জানায়, তারা এই প্রচলিত রাখাইন প্রবাদটির মর্ম চলমান ভূমিযন্ত্রণাকে বুঝতে খতিয়ে দেখেনি।

৩১. দেখুন: মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, 'রাখাইন', *প্রথম আলো*, ১৮/২/২০১৩ (অনলাইন সংস্করণ)। এমনকি মং হ্লা প্রু পিন্টুর মন্তব্যটিও সেখানে আছে।

৩২. এ প্রসঙ্গে অনেক ধরনের লেখালেখি আছে, যার অধিকাংশই এথনোগ্রাফিক রচনা বা সাধারণ বিবরণ। দেখা যেতে পারে: M. Majid, 2005, *The Rakhaines*, Mowla Brothers, Dhaka; A. M. Khan, 1999, *The Maghs: a Buddist*

Community in Bangladesh, University Press Limited, Dhaka; Hoque, 2006, 'The role of radio in the sustanable livelihodds of indigenous peoples: a case study of the Rakhains and the Garo people of Bangladesh', MA thesis, University of Tromso; A. A. Biswas, 2007, 'Life cycle, beliefs and rituals of the Rakhains of Belkata in Bangladesh', *Journal of Rural Development*, Vol. 1, No. 2, p. 1-8.

৩৩. দেখুন: এন এম হাবিব উল্লাহ, ১৯৯৫, *রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা। লেখক ও প্রকাশক দাবি করেছেন, এটি রোহিঙ্গাদের নিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বই।

৩৪. সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনলাইনভিত্তিক তথ্যসেবা 'তথ্য বাতায়ন' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, ক্লিক করুন: http://amtali.barguna.gov.bd/node/505288/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE। ৩০ জুলাই ২০১৭ সর্বশেষ এই ওয়েবসাইট ভিজিট করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

৩৫. পটুয়াখালী, বরগুনা ও কক্সবাজার অঞ্চলে দখল হওয়া প্রাচীন রাখাইন বসতি বা রাখাইন বসতির আশপাশে বসবাসকারী অনেক প্রবীণ-নবীন বাঙালি মুসলিম পুরুষদের সঙ্গে লেখকের নানা সময়ে আলাপকালে সেসব বাঙালি জানান, একসময় মগেরা ছিল অত্যাচারী, ডাকাতি করত। তারা অনেক জায়গাজমির মালিক হয়। আজ তারা সম্পত্তিহারা হয়েছে। কেউ মদ খেয়ে হারিয়েছে, কারোটা কিছু দখলও হয়েছে। এখন তাদের শক্তি নাই বলে 'রাখাইন' নাম রাখছে। যখন থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গারা আসতেছে, তখন থেকেই এই মগেরা রাখাইন নামটাকে আরও প্রচার করছে। এখন সবাই রাখাইন, এখন তারা উপজাতি আর আদিবাসী অধিকারও দাবি করে। একটা গরিষ্ঠভাগ জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষ্য যদি এমন হয়, তবে নানা কারণেই কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে একটা বহুমাত্রিক ও বহুপাক্ষিক আলাপ তোলা জরুরি। এমনতর দৃষ্টিভঙ্গি 'ঔপনিবেশিক', 'সাম্প্রদায়িক', 'বৈষম্যমূলক', 'নেতিবাচক' না 'ঐতিহাসিক' এ রকম তর্কে যাওয়ার কোনো সূত্র বা বিবরণ চলতি আলাপের নাই। তবে এ ধরনের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তা দেশের জাতিগত বৈচিত্র্য ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক। এটি সাম্প্রদায়িকতা ও নিপীড়ন উসকে দিতে যথেষ্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি ও রাখাইনদের সহাবস্থানে একধরনের অন্যায় দেয়াল শক্ত করে তুলবে। রাখাইনরা আরও বেশি বঞ্চিত ও প্রান্তিক হয়ে উঠবে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমার থেকে রাজনৈতিকভাবে উদ্বাস্তু 'রোহিঙ্গা' জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে প্রবলভাবে প্রবেশের ফলে 'রাখাইন' প্রত্যয়খানির নানান মানেও হাজির হয়েছে। বিশেষত 'রাখাইন থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা' যখন বলা হয় এবং আবার একই সঙ্গে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল থেকে বাঙালি জাত্যভিমানে উদ্বাস্তু ও প্রান্তিক হয়ে যাওয়া বাংলাদেশের 'রাখাইন জনগণ' কোনোভাবেই যে সমার্থক কোনো জাতিগত ধারণা ও প্রত্যয় নয়, এ বিষয়েও আমাদের স্পষ্ট থাকা দরকার।

৩৬. মংবা অং, ২০০৩, *বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা*, প্রকাশক লেখক নিজেই, কক্সবাজার, পৃ. ৪৬-৪৮।

৩৭. দেখুন : Than Tun, 2015, 'Rakhaing thungran in Cox's bazar: celebrating Buddist new year in Southern Bangladesh'. This thesis is presented for the degree of Doctor of Philosophy, The University of Western Australia, School of Social Sciences.

৩৮. দেখুন : দৈনিক *ভোরের কাগজ*, ৩০ মার্চ ২০১৭। আরও দেখুন : Rakhine community people on verge of extinction: activists, September 2, 2015 , *New Age.*

৩৯. দেখুন : কাজী সাঈদের বিশেষ প্রতিবেদন, '৫০ হাজার থেকে ৪ হাজারে নেমেছে : কুয়াকাটার রাখাইনরা নিজ ভূমে পরবাসী', *দ্য রিপোর্ট*, ৯ মে ২০১৪, ক্লিক করুন : http://beta.thereport24.com/article/32722/index.html#sthash.jtofTxXE.dpuf

৪০. দেখুন : *প্রথম আলো*, ১৯ মার্চ ২০১৭।

৪১. দেখুন : দৈনিক *সমকাল*, ২০ মার্চ ২০১৭।

৪২. দেখুন : 'অস্তিত্বের সংকটে দক্ষিণাঞ্চলের রাখাইনরা', *প্রথম আলো*, ৯ আগস্ট ২০১০।

৪৩. দেখুন : 'অস্তিত্বের সংকটে দক্ষিণাঞ্চলের রাখাইনরা', *প্রথম আলো*, ৯ আগস্ট ২০১০।

৪৪. সূত্র : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনলাইনভিত্তিক তথ্যসেবা 'তথ্য বাতায়ন' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, ক্লিক করুন : http://amtali.barguna.gov.bd/node/505288/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE। ৩০ জুলাই ২০১৭ সর্বশেষ এই ওয়েবসাইট ভিজিট করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

৪৫. দেখুন : বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের কাছে প্রেরিত বরিশাল বিভাগের আদিবাসী রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সমস্যাসমূহ আশু সমাধানের দাবিনামাপত্র, ২০/৮/২০০২।

৪৬. জনাব এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকীর বক্তব্য, জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী। ১৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে উপকূলের রাখাইনদের ভূমিসংকট বিষয়ে তাঁর দপ্তরে আয়োজিত এক অনানুষ্ঠানিক সভায় তিনি এসব আলোচনা করেন। তিনি জানান, সরকার রাখাইনসহ সবার উন্নয়ন চায়। আমরা রাখাইনদের কাছ থেকে তাদের ভূমিসংকট বিষয়ে এখনো কোনো দরখাস্ত পাইনি। সমস্যাগুলো তুলে ধরলে আমরা সমাধানের চেষ্টা করব। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভূমি অফিসের অনেক কাগজপত্র ও রেকর্ড নষ্ট হয়ে যায় এবং সব সময় জমির সব কাগজপত্র হালনাগাদও থাকে না।

৪৭. দেখুন : Tareq Hasan, Mohammad. Surviving Cyclones: *The Indigenous Wisdom*, Unnayan Onneshan–The Innovators, Undated report, এটি অনলাইনে পাওয়া যায়, ক্লিক করুন : http:// www.unnayan.org/documents/Climatechange/Surviving_Cyclones_Indigenous_Wisdom.pdf

৪৮. উপকূলীয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়-বিষয়ক উত্থাপিত তথ্যসমূহ জেনেছি পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' অফিস থেকে। এখান থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের ধরন, পূর্বাভাস এবং ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী ক্ষতি নিয়ে নানা তথ্য জানা হয়েছে। এই কেন্দ্রের

ওয়্যারলেস অপারেটর মো. শহীদুল ইসলাম বিস্তারিতভাবে ঘূর্ণিঝড়ের ১০ বছরের একটা বিবরণ জানান। ১৯ মার্চ ২০১৭।

৪৯. সভাপতি, কলাপাড়া প্রেসক্লাব, পটুয়াখালী। ১৯ মার্চ ২০১৭। রাখাইনদের ভূমিসংকট নিয়ে আয়োজিত এক নাগরিক সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য।

৫০. এই গ্রামে দলীয় আলোচনা, সাক্ষাৎকার, দীর্ঘ আলোচনা এবং জমির নানা দলিল ও নথি বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে এই গ্রামের তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে। গ্রামের নানা তথ্য বিশ্লেষণে যাঁরা বিশেষ সহযোগিতা করেছেন : চোথায় প্রু মাতবর (৮০) ও উচিংসে মগনীর পরিবার, কৃষি। ইয়ের চিন (৬৫), পেশা-কৃষি, মা-পুকাই ও বাবা-চালা প্রু। চান মে সো (৩২), তাঁত কারিগর, মা-উচিংসে ও বাবা-চোথায় প্রু। ইচিং প্রু (৬০), কৃষি, মা-উইমা ও বাবা-মংচাহ্লা। অংচিংশে (৭০), কৃষি, মা-উক্যাজা ও বাবা-ম্যনিউ। মংচো (৪৭), কৃষি, মা-মাসেউ ও বাবা-গংশে তালুকদার। মংমং (৪০), কৃষি, মা-প্রুমা ও বাবা-লাথানচিং। লাচান (৪৫), তাঁত কারিগর, মা-চেনইঞচিন ও বাবা-মএচো। চো চিন (৫২), দরজি, মা-নেচিং ও বাবা-নুঁচাউ। ১৭ মার্চ ২০১৭।

৫১. প্রাচীন এই রাখাইন গ্রাম সম্পর্কে জানতে কেবল আদি রাখাইন নয়, নয়াবসতিস্থাপনকারী বাঙালিদের সঙ্গেও আলাপ হয়। খাদ্যাসং পাড়াতে পরিচয় হয় মোসা হাসিনার (৪৫) সঙ্গে। হাসিনার মা-সুফিয়া খাতুন ও বাবা-নাজিম হাওলাদার। তাঁর স্বামী মসিন হাওলাদার মারা গেছেন। বরগুনার কুমড়োখালী থেকে ২০০৭ সালে এই গ্রামে চলে আসেন। হাসিনার ভাষ্য, 'আমরা খ্রিষ্টানদের (স্থানীয় রাখাইনদের বহিরাগত বাঙালিদের অনেকেই খ্রিষ্টান হিসেবে জানে, যদিও রাখাইনরা ধর্মীয়ভাবে বৌদ্ধ) বাড়িতে কাম করে খাই, ডেইলি ২০-২৫ টাকা পাই। তাদের পুকুর থেকে পানি নিই, ডেইলি সাত কলসি পানি। আমরা এগো (রাখাইন) ঘরের কাম করি, থালাবাসন ধুই, কাপড় ধুই, আমরা খুব গরিব, পিন্দনের কোনো কাপড় নাই।' হাসিনা জানান, অংকুজানপাড়াতে বর্তমানে প্রায় ১০ পরিবার বাঙালি মুসলমান (যদিও হাসিনারা নিজেদের বাঙালি নন, মুসলমান বলেই পরিচয় দেন) রাখাইনদের ভূমিতে বসবাস করছেন। এখানকার বাঙালি মুসলমানদের থাকার জায়গা আছে (এই জমিগুলোও রাখাইনদের, রাখাইনদের ভাষ্য এই জায়গা দখল করা হয়েছে কিন্তু বাঙালিদের ভাষ্য রাখাইনরা তাদের থাকতে দিয়েছে) কিন্তু চাষবাসের কোনো ভূমি নেই। বাঙালিদের প্রশ্ন করা হয়, বাঙালিরা নাকি রাখাইনদের জায়গাজমি দখল করছে। এর উত্তরে বাঙালিরা জবাব দেন, 'কী জানি আমরা কী কইতে পারি?' ১৭ মার্চ ২০১৭।

৫২. মো. আফজাল হোসেনের (৫৫) ভাষ্য, দিনমজুর, মা-জমিলা খাতুন ও রোহান উদ্দীন হাওলাদার। ১৭ মার্চ ২০১৭।

৫৩. তথ্যসূত্র : সুকুমার চন্দ্র শীল (৪৮), নাপিত, মা-শেফালী শীল ও বাবা-গান্ধী শীল। সুকুমার চন্দ্র শীলের স্ত্রী পূর্ণিমা রানী শীল (৪০), গৃহব্যবস্থাপক, মা-বকুল রানী শীল ও বাবা-নিশিকান্ত শীল। বাঙালি হিন্দুরাও অনেকে রাখাইনদের বাড়িতে কাজ করেন। কেউ কেউ নাপিত ও বর্গা চাষ করেন। তাঁদের কোনো জমি নেই। তাঁদের ভাষ্য, তাঁরা খাসজমিতে বসবাস করছেন কিন্তু রাখাইনরা জানালেন এই জায়গাও দখলকৃত। ১৭ মার্চ ২০১৭।

৫৪. চোথায়ফু মাতুব্বর এর নামের অনেকগুলো বানান সরকারি নানা নথিতে দেখা গেছে। চোথয়ংফু মাতুব্বর, চোথয়ফ্রু মাতুব্বর। তাঁর ভূমিসংকট বিস্তারিত জানতে এসব নথি ও বিবরণ দেখা যেতে পারে : উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয় আমতলী বরগুনার নোটিশ, স্মারক নং-১২.১৮.০৪০৯.০৩৯.৯৯.০২৪.১৪, তারিখ, ১৮/১০/২০১৫। চোথায়ফ্রু কৃত আমতলী বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বরাবর ফৌজদারি দণ্ডবিধি-১৪৪ ধারামতে,

মামলার নথি, ১০/১১/২০১৫। তাঁর জমির খতিয়ান তৌজি নংসহ। বরগুনা পুলিশ সুপারের কাছে তালতলী থানার এসআই মো. আসাদুর রহমান কর্তৃক প্রেরিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন, সূত্র স্মারক নং-৪২২/ভি, তারিখ ১৩/৮/২০১৫, ৪/৯/২০১৫। পটুয়াখালী জজকোর্টের আইনজীবী আলহাজ মিলন চৌধুরীর আইনগত মতামত প্রতিবেদন, ১২/১/২০১৩।

৫৫. স্থানীয় এলাকার জমির মাপ অনুযায়ী : ১ একর=১০০ শতক, ২ একর ৬৬ শতক=১ কানি এবং ১০ কড়া=৩৩ শতক।

৫৬. সূত্র : বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার ১০ নং বড়বগী ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত ১৩/১/২০০০ সভার কার্যবিবরণী। এতে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান মো. দুলাল ফরাজী, রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বরগুনার সাধারণ সম্পাদক খেন মংলা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তালতলী শাখার সভাপতি মো. ফজলুল হক প্রমুখ। আরও দেখুন : তালতলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর মাতানচিংয়ের আবেদনপত্র, তারিখ ৪/১/২০১৬।

৫৭. সূত্র : জবরদখলকারীদের উৎখাত করে জমাজমির সুষ্ঠু ভোগদখল অধিকার ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা-মোকদ্দমা থেকে অব্যাহতি দান করার প্রার্থনা শীর্ষক পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরিত আবেদনপত্র, ২৫/৮/২০০৩। এই আবেদন করেছেন বরগুনার তালতলীর মংতাহান।

৫৮. দেখুন : জমির দখল বুঝাইয়া দেওয়া প্রসঙ্গে, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। তারিখ-৪/৬/১৯৯২, স্মারক নং-৩৫৪/বিচার, এমপি নং-৭০/৯২।

৫৯. সূত্র : ১৯৮৯ সালের ৬৩ (বিবিধ) নং কেসে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কলাপাড়া কর্তৃক ৩০/৫/১৯৮৯ তারিখে প্রদত্ত আদেশের অনুলিপি। স্মারক নং/পাঁচ/ক/ভুপ্র/অনুমতি/১৫/৮৭-৮৯-৩০১(৫) সংরক্ষিত।

৬০. সূত্র : বাবু তাহানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার উপজেলা ভূমি অফিসের কানুনগো মো. শাহ আলম কর্তৃক তৈরিকৃত তদন্ত প্রতিবেদন। এটি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পটুয়াখালী মহোদয়ের ২৭/৮/২০০৩ তারিখের এস.এ.পটু/সি-১০৫ নং স্মারকের সূত্র অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন কলাপাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর দাখিল করা হয়। তারিখ-৪/৮/২০০৪।

৬১. দেখুন : পটুয়াখালী ও বরগুনার রাখাইন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব হুমকির মুখে, দৈনিক *সমকাল*, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

৬২. মঙ্গল কুমার চাকমা, ২০১৭, 'উপকূল অঞ্চলে রাখাইনদের ভূমি সমস্যা : রাখাইনশূন্য করার এক নীরব গণহত্যা'। উপকূলীয় রাখাইন জনপদে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে তৈরি এই লেখাটি বিস্তারিত পড়তে ক্লিক করুন : http://ipnewsbd.com/news/2045, ২৪ মার্চ ২০১৭।

৬৩. সূত্র : বরগুনার তালতলীর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর কবিরাজপাড়ার রাখাইনদের আবেদনপত্র। পাড়ার পক্ষে আবেদন করেন মংথিনজো, তারিখ-৯/৭/২০১৪।

৬৪. সূত্র : কবিরাজপাড়ার খাসপুকুর-বিষয়ক তদন্ত প্রতিবেদন, স্মারক নং-৯৭/বগী, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, বড় বগী ইউনিয়ন, তালতলী, বরগুনা। ৩/৯/২০১৪।

৬৫. সূত্র : স্মারক নং-উনিঅ/তাল-৭৩৬, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, তালতলী, বরগুনা, ১৬/৯/২০১৪।

৬৬. সূত্র : তালতলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী তোফায়েল হোসেন স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র, ১৫/১/২০১৫।

৬৭. বিস্তারিত পড়ুন : রাজীব নূরের উপকূলের রাখাইনদের ভূমি সমস্যা নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন 'উপকূলের আদিবাসী'। দেখুন : রাখাইনদের রাখাইন থাকার সংগ্রাম, দৈনিক

সমকাল, ২৪ জুন ২০১৭।

৬৮. সূত্র : পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরিত আবেদনপত্র, বিষয় : কলাপাড়া পৌরসভায় রাখাইনদের মৃতদেহ সৎকারের জন্য আলাদা শ্মশানভূমি তৈরির জন্য সরকারি উদ্যোগে জায়গা বরাদ্দ চেয়ে একটি মানবিক আবেদন, তারিখ : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫। এলাকাবাসীর পক্ষে আবেদনটি করেছেন টেনসুয়ে হাওলাদার, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পটুয়াখালী রাখাইন সমাজকল্যাণ সমিতি, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। আবেদনপত্রের অনুলিপি সংসদ সদস্য, পটুয়াখালী-৪ এবং মেয়র, কলাপাড়া পৌরসভাকেও দেওয়া হয়েছে।

৬৯. এ বিষয়ে রাখাইন এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে লেখা প্রকাশ বিশ্বাসের 'নীরবে ক্ষীয়মাণ রাখাইন সম্প্রদায়' পড়তে ক্লিক করুন : http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/30786। এটি আপলোড হয়েছে ৮/৯/২০১৫।

৭০. দেখুন : 'Land grabbers demolish Rakhain graveyard', March 30, 2016 , *The Daily Star.*

৭১. দেখুন : Noman Chowdhury, 'Existence of Rakhine community under threat, Vested quarters grab their lands', 31 August, 2015, *Daily Sun.*

৭২. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী। ১৯ মার্চ ২০১৭। রাখাইনদের ভূমিসংকট নিয়ে আয়োজিত এক নাগরিক সভার প্রধান অতিথির বক্তব্য।

৭৩. দেখুন : পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু, ২৩/৯/২০১৬, www.ntvbd.com

৭৪. দেখুন : বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাতিলের দাবিতে কলাপাড়ায় বিক্ষোভ, দৈনিক *কালের কণ্ঠ*, ১ জুন ২০১৪।

৭৫. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার টিয়াখালী ইউনিয়নে ছয়ানি রাখাইনপাড়ার কাছে ইটবাড়িয়ায় রাবনাবাদ চ্যানেলসংলগ্ন আন্ধারমানিক নদের পাড়ে অবস্থিত বাংলাদেশের তৃতীয় ও দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর। ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর ভিত্তিফলক স্থাপন করেন। ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট সমুদ্রবন্দরটি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। ৫ নভেম্বর পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৩ অনুমোদিত হয়।

৭৬. সূত্র : ছয়ানিপাড়ার রাখাইনদের পক্ষে পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক বরাবর দামো রাখাইনের করা 'ভূমি অধিগ্রহণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আবেদনপত্র'।

৭৭. ছয়ানিপাড়ার প্রায় সবাই উপস্থাপিত তথ্যসমূহ এবং জটিল সব ভূমিবিশ্লেষণ বুঝতে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। বিশেষত প্রবীণ নারী ও পুরুষেরা বিস্তর সময় নিয়ে নানা তথ্যের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন। রাখাইন, বাংলা এবং স্থানীয় বাংলা এই তিনটি ভাষার নানা সংমিশ্রণে সংগঠিত আলাপচারিতা বা সাক্ষাৎকারগুলো আয়োজনে গ্রামবাসীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বিশেষ কিছু দুর্লভ বয়ানের জন্য ছয়ানিপাড়ার নিম্নলিখিত অভিজ্ঞ রাখাইনজনদের চলতি আলাপ জানায় বিশেষ কৃতজ্ঞতা। চিংদামং (দামু), পেশা-কৃষি, মা-ফ্রু মা য়ে ও বাবা-গংশে মাতবর; ফ্রু মা য়ে (৯০), কৃষি, মা-মেলা ফ্রু ও বাবা-লুফ্রু মাতবর; উথিংমং (৬২), কৃষি, মা-সুইন মা ও বাবা-ম্রাথয় মাতবর; সুইন মা (৮৫), কৃষি, মা-উইদ মা ও বাবা-সেমো মাতবর; মামাএ (৫৬), কৃষি, মা-ফ্রুমাএ ও বাবা-গংশে মাতবর; চিলাউ (৯৫), কৃষি, মা-মামাসি ও বাবা-লুফ্রু মাতবর; প্রুমাইয়ে (৮৭), কৃষি, মা-মামাসি ও বাবা-লুফ্রু; গংশে মাতবর (১০০), কৃষি, মা-ফচামা ও বাবা-নি হ্লাএ; প্রুমাইয়ে (৯০), কৃষি, মা-মেলা প্রু ও বাবা-লুফ্রু মাতবর। মাঠ সমীক্ষার সময়কাল : ১৬-২০ মার্চ ২০১৭।

৭৮. মংথান চানের ভূমিসংকট-সংক্রান্ত আরও কিছু নথি দেখুন : বরগুনা অতিরিক্ত জেলা

প্রশাসক (রাজস্ব) বরাবর প্রেরিত মংথান চানের দরখাস্ত, ২১/৬/২০০৪। বরগুনা জেলার সহকারী উকিল মো. ইউনুছ মিয়া কর্তৃক বরগুনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বরাবর প্রেরিত মংথান চান মগের জমি-সংক্রান্ত বিরোধ বিষয় মতামত প্রতিবেদন, ১১/৯/২০১৫। বরগুনা পুলিশ সুপার বরাবর প্রেরিত বরগুনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের অনুসন্ধান প্রতিবেদন, স্মারক নং-৭৭/১/অতি :, ১০/৯/২০০৫।

৭৯. সূত্র : বরগুনা জেলা প্রশাসক মো. আলিমুশ্বানের তালতলী রাখাইন এলাকায় আগমন উপলক্ষে স্মারকলিপি, ৫/১১/২০০২।

৮০. সূত্র : পটুয়াখালী-বরগুনা জেলায় বসবাসরত আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের কতিপয় সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে। স্মারক নং জেপ্রবর/সাধারণ/উ-৩/০৭, ১৯ মার্চ ২০০৮।

৮১. সূত্র : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বরগুনা সফরকালে তালতলীর রাখাইন জনগণ কর্তৃক প্রদেয় শ্রদ্ধাঞ্জলিপত্র, ৬/৫/২০১০।

৮২. পড়ুন : আশিক হোসেন, 'ভূমি দখল : ভিটেবাড়ি ছাড়ছে রাখাইনরা', বিডিনিউজ২৪ডটকম, ১৬/৯/২০১৪

৮৩. রাখাইনদের নিয়ে বেশ কিছু 'এথনোগ্রাফিক' ধাঁচের গবেষণা করেছেন ড. মুস্তাফা মজিদ। বিশেষত রাখাইন মেয়েদের নিয়ে আলোকচিত্রমার্কা অনেকগুলো বইয়ের লেখকও তিনি। তাঁর 'রাখাইনদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত' লেখাটি পড়তে ক্লিক করুন : https://ourdoc.wordpress.com/2013/10/25/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%93/। এই লিংকে প্রবেশ করেছি ১০ মে ২০১৭।

৮৪. দেখুন : Trying times for Rakhain community, *The Independent*, 18 July 2002.

৮৫. উইকিপিডিয়ার সূত্রমতে, ভোলা জেলার একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য চর কুকরিমুকরি। বঙ্গোপসাগরের উপকণ্ঠে মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীর মোহনায় কয়েক শ বছর আগে এই চর জেগে ওঠে।

৮৬. বিস্তারিত দেখুন : 'পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া থানার অন্তর্গত কুয়াকাটা সমুদ্রতটে জেগে ওঠা প্রাচীন সমুদ্রগামী ছোট্ট পালতোলা জাহাজ স্কুনার সংশ্লিষ্ট তথ্য'। এই তথ্যখানি প্যানাফ্লেক্স প্রিন্ট করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের কাছাকাছি একটা টিনের ছাউনির তলায় একেবারে দায়সারা ও অরক্ষিতভাবে রাখা উল্লেখিত প্রাচীন নৌকার সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যদিও এসব তথ্যের একেবারে বাক্যসহ *প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত ১৫ মার্চ ২০১৩ তারিখের একটি প্রতিবেদনের সঙ্গে মিলে যায়। এই বিবরণটি সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর টাঙিয়েছে। ১৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে এর আলোকচিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লিখিত ২০১২ সালের জুনে নৌকাটি নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলেও ২৩/১২/২০১৩ থেকে ১০/১/২০১৩ এবং ১০/২/২০১৩ হতে ২৭/২/২০১৩ প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যম নৌকাখানি উদ্ধার করা হয়।

৮৭. বিস্তারিত দেখুন : *প্রথম আলো*, ১৫ মার্চ ২০১৩ এবং এমনকি এই তথ্য সরকারি ভাষ্যেও আছে।

আঞ্চলিক রাজনীতি

বার্মা পাঠসূত্র

আলতাফ পারভেজ

এক দশক থেকেই বলা হচ্ছিল যে বিশ্ব মনোযোগের অন্যতম ভরকেন্দ্র হয়ে উঠতে চলেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এটা অর্থনৈতিক বিবেচনা থেকে যেমন বলা হচ্ছিল, তেমনি আসন্ন উত্তেজক অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেও বলা হয়েছে। ভূরাজনীতিকদের এই পূর্বকথা ব্যর্থ হয়নি। চীন, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান, বার্মাসহ পুরো এই জনপদে একদিকে যেমন আমরা অর্থনৈতিক উত্থান দেখছি, পাশাপাশি শুরু হয়েছে সম্ভাব্য এক আন্তযুদ্ধ—ধর্ম ও জাতিগত হিংসা-বিদ্বেষ-বৈরিতা। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরো অঞ্চলের উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের এক অযৌক্তিক উপসংহার। অনেক ভূরাজনৈতিক ভাষ্যকার তাই এ-ও বলছেন যে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য উত্তেজক এই অধ্যায়ে প্রবেশ ঐতিহাসিক নিয়তি নির্দিষ্ট হয়েছিল। বস্তুত, এইরূপ পটভূমিতেই বাংলাদেশেও দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস ও সমাজকে নতুন করে অধ্যয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে এবং এইরূপ পঠনপাঠন একেবারে গোড়া থেকে শুরু হওয়া জরুরি। বস্তুত, একটি অঞ্চলের ইতিহাস ও সমাজজীবনের মৌলিক তথ্যগুলো জানা না থাকার কারণে সেখানকার সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের যোগসূত্র ও তার বহু স্তরায়িত জটিল বিন্যাস বুঝতে আজকের পাঠক খেই হারিয়ে ফেলেন। দক্ষিণ এশিয়া অধ্যয়নের সেই শুরুর বিন্দুতে ফিরে যেতেই এখানে তুলে ধরা হচ্ছে 'বার্মা পাঠসূত্র'। এটা হলো দুই কিস্তিতে সমাপ্য বার্মা বিষয়ে এই লেখকের পাঠসূত্রের প্রথম কিস্তি, যেখানে বার্মার ইতিহাস ও সমাজের ১৭টি প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য-বাস্তবতা তুলে ধরা হচ্ছে। আগামী কিস্তিতেও প্রায় অনুরূপসংখ্যক ভুক্তি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে আজকের বার্মার জাতিগত ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হবে।

১. বার্মার সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে টাটমা-ড (Tatmadaw)

স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীকে এই নামে ডাকা হয়। দেশটির সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান এগুলো। তাদের জন্য জিডিপির প্রায় ৩ শতাংশ বরাদ্দ থাকে, যা দেশটির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সম্মিলিত বরাদ্দের চেয়ে বেশি এবং সমগ্র বাজেট বরাদ্দের প্রায় ১৩

শতাংশ। পাশাপাশি দেশটির পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে টাটমা-ডয়ের জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

স্বাধীনতার সময় থেকে এটি গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ-বার্মা আর্মি (BBA) ও দেশপ্রেমিক বার্মিজ ফোর্সগুলোর (PBF-Patriotic Burmese Force) সমন্বয়ে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সাল থেকে। সে সময় এর সৈন্য সামর্থ্য ছিল ১৫ হাজার। আর ৫০ বছর পর ২০০০ সালে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৪ লাখে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লাখ বলে অনুমান করা হয়। গত সাত দশকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে এই বাহিনী মুখ্যত চীনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তবে বর্তমানে ইসরায়েল, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান, জাপান, রাশিয়া, ব্রিটেনসহ আরও কিছু দেশে তাদের সামরিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রও এইরূপ সম্পর্ক হৃদ্য করতে উদ্‌গ্রীব। অন্তত ১৭টি সামরিক সরঞ্জাম তৈরির কারখানা রয়েছে টাটমা-ডয়ের অধীনে।

বর্তমানে বার্মার টাটমা-ডয়ের প্রধান হলেন ১৯৫৬ সালে জন্ম নেওয়া মিন অং হ্লাইয়াং। এই পদাধিকারী সেখানে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্বে থাকতে পারেন। ২০১৬ সালে এই বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়। যদিও দেশটিতে বেসামরিক আমলারা সর্বোচ্চ ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্বে থাকতে পারেন।

১৯৩৭ সালের এপ্রিলে ব্রিটেন বার্মাকে প্রথম পৃথক কলোনি হিসেবে ঘোষণা করে এবং তারপর যে সেনাবাহিনী গড়ে তোলে, তাতে মূলত শক্তি-ভিত ছিল কারেন, চিন ও কাচিনরা। এ সময় ব্রিটিশ-বার্মা বাহিনীতে কারেনরা ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি, যা ২৭ শতাংশ। এরপর ছিল চিন ও কাচিনরা ২২ শতাংশ করে। বর্মনরা এই বাহিনীতে যোগদানে অনাগ্রহী ছিল। পাশাপাশি ব্রিটেনও সচেতনভাবে এই বাহিনীতে মূল নৃগোষ্ঠী বামারদের বেশি রাখতে অনিচ্ছুক ছিল। একই সময় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ বাহিনী (বার্মা ইনডিপেনডেন্ট আর্মি—বিআইএ) গড়ে ওঠে আং সাঙের নেতৃত্বে, (দেখুন, 'ত্রিশ কমরেড') তাতে মূল শক্তি-ভিত ছিল প্রধান নৃগোষ্ঠী বামার। ১৯৪২ থেকে বিআইএ থেকে বিডিএ (ব্রিটিশ ডিফেন্স আর্মি) নাম নেয় এই বাহিনী। ১৯৪৩ সালে এর নাম আবার পাল্টে রাখা হয় বিএনএ (বার্মা ন্যাশনাল আর্মি)। সর্বশেষ জাপানিরা পরাজিত হওয়ার পর স্বাধীনতার সময় থেকে ব্রিটিশ-বার্মা বাহিনী এবং অন্য দেশপ্রেমিক সশস্ত্র শক্তিগুলো নিয়ে প্রাথমিকভাবে ১৫টি ব্যাটালিয়ন শক্তি নিয়ে 'টাটমা-ড' গড়ে ওঠে এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বার্মার প্রায় সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল ও অধস্তন করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে তারা। ১৯৬২ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তারা সরাসরিই দেশটি শাসন করে। এ সময় সামরিক শাসকেরা নিজস্ব ধাঁচের এক 'সমাজতন্ত্র' বাস্তবায়নেও নিয়োজিত ছিল, যার অংশ হিসেবে দেশটির বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ছিল। এসবেরই মিলিত ফল হিসেবে অর্ধশতাব্দী ধরে সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় সব ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাই কোনো না কোনোভাবে জনগণের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও দেশটির অর্থনীতি পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ফলে বার্মার সমাজের আর্থসামাজিক জীবনে সেনাবাহিনীর প্রভাবকে স্থায়ী এক বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়েছে দেশটির স্বাধীনতা-উত্তর অন্তত দুটি প্রজন্ম। এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেশটিতে স্বাধীন নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলের বিকাশ দুর্বল।

আবার টাটমা-ডয়ের প্রধান এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বার্মার স্বাধীনতার পরমুহূর্ত থেকে এটি দেশটির কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। তবে প্রতিবছর ২৭ মার্চ যখন 'আর্মড ফোর্সেস ডে' পালিত হয়, তখন টিভি ও সিনেমা হলগুলোতে এই বাহিনীর শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে এবং বার্মার জন্য তাদের অবদান নিয়ে বিশেষ তথ্যচিত্র প্রচারিত হয়। এই বাহিনীকে শাসনতান্ত্রিক পরিসরে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে কোথাও জবাবদিহি করতে হয় না। কারণ, সর্বশেষ ২০১৫ সাল থেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় (প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও সীমান্ত) সশস্ত্র বাহিনী স্থায়ীভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ ছাড়া টাটমা-ডয়ের কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য দেশটিতে এনডিএসসি (ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি কাউন্সিল) নামে যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জনকেই টাটমা-ডয়ের প্রধান নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

এই বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের বিশ্বাসযোগ্য অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে গত দশকে। যেমন ২০১৭ সালের জুনে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের এক প্রতিবেদনে[১] কাচিন ও শ্যান স্টেটের উত্তরাঞ্চলে স্থানীয় স্বাধিকারকামীদের সঙ্গে যুদ্ধে বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের দায়ে টাটমা-ডকে অভিযুক্ত করে।

টাটমা-ডয়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উত্থাপিত হয় ২০১৪ সালের নভেম্বরে হার্ভাড ল স্কুলের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে।[২] থাই সীমান্ত-সংলগ্ন কারেন এলাকায় তাদের ২০০৫ সাল থেকে পরবর্তী তিন বছরের অভিযানকালের বিভিন্ন ঘটনাবলির জন্য এই অভিযোগ ওঠে। উল্লেখ্য, এইরূপ অভিযোগ ছিল ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যার অভিযোগের অতিরিক্ত।

২. মেজর জেনারেল আং সাঙ ও স্বাধীনতার উষালগ্নে বার্মা

আং সাঙের জন্ম ১৯১৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। মৃত্যু ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই। আং সাঙ বার্মায় জাতির পিতা হিসেবে সম্মানিত। বিশেষ করে, দেশটির মূল জনগোষ্ঠী বামারদের কাছে তিনি আধুনিক বার্মার স্থপতি হিসেবে বিবেচিত হন। বার্মার সেনাবাহিনীরও প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করা হয় তাঁকে।

১৯৩২ সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির মধ্য দিয়ে তাঁর উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামের শুরু। তখন তিনি কমিউনিস্ট আদর্শের অনুসারী ছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী সংসদের সেক্রেটারি হন। তখন এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন উ ন।

১৯৩৯ সালে বার্মার কমিউনিস্ট পার্টিরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তবে পরবর্তীকালে তিনি জাতীয়তাবাদী হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯৪০ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জাপানের সঙ্গে হাত মেলান। ১৯৪৩ সালের ১ আগস্ট জাপান তাঁকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করে বার্মাকে স্বাধীন ঘোষণা করে এবং নিজেরা বার্মায় একটা স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। যদিও এই সরকার ছিল কার্যত তাদের নিয়ন্ত্রণে। এ সময় জাপানের সহযোগিতায় আং সাঙ যে বাহিনী গড়ে তোলেন, তার নাম রাখা হয় 'বার্মা ন্যাশনাল আর্মি'। আং সাঙ পরে জাপানের পক্ষ ত্যাগ করেন এবং ব্রিটিশদের সহযোগিতা গ্রহণের কৌশল নেন। ১৯৪৫ সালের ২৭ মার্চ তিনি ব্রিটিশ সহযোগিতায় জাপানিদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটান। আর ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁকে ব্রিটিশরা বার্মার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করে। এ সময় আং সাঙ দেশটির পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাতে থাকেন। ১৯৪৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি পেংলংয়ে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক এলাকার সমন্বয়ে 'বার্মা ইউনিয়ন' গঠনের পক্ষে সম্মেলন ডাকেন। এতে কারেনরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়নি। এ সময় বার্মায় সংবিধান সভা গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (এপ্রিল ১৯৪৭) আর ব্রিটিশদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াও শুরু হয়। এই নির্বাচন ছিল ব্রিটিশদের অধীনে ভারত থেকে পৃথক হওয়ার পর বার্মায় প্রথম নির্বাচন। ব্রিটিশদের সঙ্গে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এটা একটা পূর্বকরণীয় হিসেবে ছিল। নির্বাচনে আং সাঙের (Anti Fascist People's Freedom League-AFPFL) সংগঠন একচেটিয়াভাবে ভালো করেছিল। আং সাঙের এই সংগঠন ছিল সামরিক ধাঁচের। এদের দ্বারা নির্বাচনী কাজে বাধাগ্রস্ত হয়ে কয়েকটি প্রভাবশালী দল (কমিউনিস্টরাসহ) ১৯৪৭ সালের নির্বাচন বয়কট করেছিল এবং ভোটারের অংশগ্রহণও ছিল ৫০ শতাংশের কম। তবে নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে ধারণা তৈরি হয়েছিল যে স্বাধীনতা-উত্তর বার্মায় আং সাঙের নেতৃত্বেই সরকার গঠিত হবে।

বার্মার স্বাধীনতা পাওয়া এবং তাঁর নেতৃত্বে সরকার গঠনের অন্যতম ব্রিটিশ শর্ত হিসেবে আং সাঙ জীবনের শেষ সময়ে সামরিক জীবন ছেড়ে রাজনীতিবিদ হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করেছিলেন। তবে এ রকম সময়েই ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই শনিবার সকালে রেঙ্গুনে একদল সশস্ত্র ব্যক্তির হাতে আং সাঙ সাত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সহযোগীসহ নিহত হন। এ সময় অন্তর্বর্তী সরকারের বৈঠক চলছিল।

মিয়ানমারে এই দিন এখন শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

আং সাঙের হত্যার ঘটনা ঘিরে আজও অনেক রহস্য অনাবৃত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে আং সাঙ ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলির মধ্যে চুক্তি নিয়ে আং সাঙের সঙ্গে তাঁর কয়েকজন রাজনৈতিক সহযোগীর ভিন্নমতকে এই মৃত্যুর কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়। কিন্তু এ-ও ধারণা করা হয়, তাঁর সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা এই হত্যার পেছনে একটি বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছিল। বিভিন্ন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, তাঁর হত্যাকারী উ সকে (U Saw) সেই সব ব্রিটিশ কোম্পানি অর্থ সহায়তা দিয়েছিল, যারা স্বাধীনতা-পরবর্তী বার্মায় সম্ভাব্য জাতীয়করণ উদ্যোগকে ভয় পাচ্ছিল। অনুসন্ধানে এ-ও দেখা যায়, যে চারটি অস্ত্র দিয়ে আং সাঙকে হত্যা করা হয়েছিল, সেগুলো এসেছিল লন্ডন থেকে। আং সাঙ, উ সসহ যাঁদের দ্বারা নিহত হন, তাঁরা ভেবেছিলেন আং সাঙের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁরা বার্মার রাজনীতিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন এবং দেশটির স্বাধীনতা প্রক্রিয়াও বিলম্বিত করা যাবে। কিন্তু কার্যত তা ঘটেনি। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে দেশটিতে নতুন সংবিধান লিখিত হয় এবং ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতেই তা কার্যকর হয়। ৪ জানুয়ারি বার্মা স্বাধীন হয়। মূলত তখনকার যুগোস্লাভিয়ার সংবিধানকে মডেল আকারে গ্রহণ করে এই সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। তবে সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি ছিল তাড়াহুড়াময়। প্রান্তিক জাতিসত্তাগুলো এ নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল। যদিও এই সংবিধানেও উল্লেখ ছিল যে বার্মার সশস্ত্র বাহিনী পার্লামেন্টের অধীন হবে। সর্বশেষ সংবিধানে যা অপসৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য, উ স স্বাধীনতার পূর্বে একসময় (১৯৪০-৪২) বার্মার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রবল। এ সময় বার্মার উদীয়মান রাজনীতিবিদ ও সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে সমর্থন ও সহায়তার ক্ষেত্রে লন্ডনের এবং ভারতের ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মাঝে অনেক স্ববিরোধিতা ও মতপার্থক্য ছিল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন আং সাঙকে মদদ দিচ্ছিলেন বলে প্রমাণ মেলে। বার্মার সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোও মনে করত, আং সাঙ সম্ভাব্য নতুন রাষ্ট্রে তাদের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে সহানুভূতিশীল। ফলে আং সাঙের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বস্তুত বামারদের সঙ্গে দূরবর্তী জাতিসত্তাগুলোর আপস-রফার শেষ সুযোগটি নষ্ট হয়ে যায়।

১৯৪৮ সালের মে মাসে আং সাঙের হত্যাকারীদের বিচার শেষে ফাঁসি দেওয়া হয়। যদিও এর মধ্য দিয়েই এই হত্যা-সংক্রান্ত সব রহস্যের কিনারা হয়ে যায়নি। আং সাঙের মৃত্যুরহস্য নিয়ে Kin Qung-এর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে, *হু কিলড অং সান?* নামে। উল্লেখ্য, তাঁর কন্যাই হলেন বর্তমান মিয়ানমারের আলোচিত নেত্রী অং সান সু চি। পিতার মৃত্যুকালে যাঁর বয়স ছিল দুই বছর। বিয়ে করার সময় আং সাঙের স্ত্রী খিন চি (Khin Kyi) ছিলেন একজন নার্স, যাঁর সঙ্গে আং সাঙের পরিচয়

হয়েছিল ১৯৪২ সালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রেঙ্গুন হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময়। বিয়ের তিন বছর পর সু চির জন্ম হয়েছিল। খিন চি পরে রেঙ্গুন থেকে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ভারতে বার্মার রাষ্ট্রদূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। দিল্লিতে যে বাড়িতে সু চি ও তাঁরা থাকতেন, সেটাই এখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যালয় ২৪ আকবর রোড।

৩. নে উইন এবং বার্মার সমাজতান্ত্রিক পথপরিক্রমা

নে উইনের জন্ম ১৯১০ সালের ১০ জুলাই। বার্মার ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত সামরিক শাসক তিনি। প্রথমে ১৯৫৮ সালে ইউ নোর নেতৃত্বে দেশটির প্রধানমন্ত্রী হন। পরে ১৯৬২ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিজেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা অধিকার করেন। এ সময় সংবিধান স্থগিত করা হয় এবং দেশটির উদীয়মান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন ঘটে।

তাঁর পারিবারিক নাম ছিল সু মং। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক জীবনে এসে তিনি নে উইন নাম নেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে নে উইন জাপানিদের সহায়তায় আং সাঙসহ সামরিকভাবে প্রশিক্ষিত হন। বহুল আলোচিত '৩০ কমরেড' গ্রুপের সদস্য ছিলেন তিনিও। উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সংগঠক হিসেবে ১৯৪৩ সালে তিনি 'বার্মা ইনডিপেনডেন্ট আর্মির' কমান্ডার ইন চিফ হন। পরবর্তীকালে আং সাঙ যখন দেশটির স্বাধীনতার মুখে সামরিক জীবন ছেড়ে পূর্ণ রাজনৈতিক জীবন বেছে নেন, নে উইন তখনো সামরিক বাহিনীতেই থেকে যান।

ব্রিটিশ বাহিনীর বার্মায় পুনরায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে নে উইন ১৯৪৭ সালের মার্চে তাদের সঙ্গে মিলে কমিউনিস্ট নির্মূলে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। এই অভিযানের নাম ছিল অপারেশন ফ্লাশ।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বার্মা স্বাধীন হয় এবং ১৯৪৯ সালে নে উইন দেশটির সামরিক বাহিনীর প্রধান হন। সুতরাং বলা যায়, তাঁর হাত দিয়েই দেশটির সশস্ত্র বাহিনী গড়ে উঠতে শুরু করে। এ সময় দেশটির বেসামরিক প্রশাসন বহুমুখী উপদলীয় সংঘাতে নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিল। আর নে উইন ক্রমাগত দক্ষিণপন্থী অবস্থান নিচ্ছিলেন। সামরিক অভ্যুত্থানের পর তিনি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দুই বছরের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বার্মার রাষ্ট্রকাঠামোর ফেডারেল চরিত্র বাদ দেন তিনি। যদিও তিনি তাঁর এ সময়কার কর্মপ্রয়াসকে 'সমাজতন্ত্রের বার্মা পথ' হিসেবে অভিহিত করতেন এবং 'বার্মা সোশ্যালিস্ট পার্টি' নামে একটি দলেরও জন্ম হয় (৪ জুলাই ১৯৬২) তাঁর হাত ধরে। কিন্তু কার্যত এই সময় (প্রায় আড়াই দশক) বার্মা বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, চোরাকারবারিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয় এবং একপর্যায়ে বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র ১০টি দেশের একটিতে

পরিণত হয়। বিশেষত, নে উইনের ক্ষমতা দখলের প্রথম ১২ বছর বার্মার অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সবকিছুই রাষ্ট্রীয়করণ করে ফেলা হয়েছিল। এ সময় চীনের মাও সে-তুংয়ের আদলে নে উইনকে কিছুদিন রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমে 'চেয়ারম্যান নে উইন' বলা হতেও দেখা যায় এবং বিষয়টির যথার্থতা তৈরির জন্য The System of Correlation of Man and his Environment (SCME) শিরোনামে একটি তাত্ত্বিক দলিলও প্রচার হতে শুরু করে ব্যাপকভাবে। তবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কাছে নে উইন শাসন ছিল কার্যত তাদের জনপদ ও সংস্কৃতিকে সামরিক ভীতির মাঝে বার্মিজীকরণ মাত্র। আং সাঙের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বামারদের সঙ্গে দূরবর্তী সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মাঝে যে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল, নে উইনের শাসনামলে এসে তা সত্যি হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টি অব বার্মা ছাড়াও কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন প্রথম সশস্ত্র বিরোধিতা শুরু করে এবং তাদের অনুসরণ করে মন, কারেননি, পাও, আরকানিজ ও কাচিনরা। ১৯৬৩ সালে নে উইন সশস্ত্র জাতিগত প্রতিরোধ আন্দোলন নিষ্ক্রিয় করতে Four Cuts কৌশল নেন। এই কৌশলের লক্ষ্য ছিল জাতিগত সংখ্যালঘুদের বেসামরিক বসতিতে সন্ত্রাস তৈরি করে সশস্ত্র সংগঠনগুলোর খাদ্য, তহবিল, গোয়েন্দা কার্যক্রম ও জনবল সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত করা।

বিভিন্ন জাতিসত্তার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়া ছাড়াও নে উইনের শাসনামলে দেশটির চীনাভাষী নৃগোষ্ঠী বিশেষভাবে নিপীড়নের শিকার হয়। চীনাভাষীদের বিরুদ্ধে অনেক দাঙ্গাও উসকে দেওয়া হয় শাসক পরিমণ্ডল থেকে। বিবিধ আর্থসামাজিক সংকটের মুখেই নে উইনের শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৯৮৮ সালে।

এভাবে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি দেশটির প্রকাশ্য নিয়ন্ত্রক থাকেন এবং পরবর্তী ১০ বছরও তিনি অপ্রকাশ্যে থেকে শাসন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতেন। একপর্যায়ে নে উইনকে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে জ্যোতিষীদের ওপর নির্ভর করতে। এ সময় তিনি '৯' সংখ্যার ভক্ত হয়ে পড়েন এবং রাষ্ট্রীয় সবকিছুতে ৯ সংখ্যার প্রয়োগ ঘটাতে গিয়ে এ-ও দেখা যায় যে পুরোনো নোট বাতিল করে রাষ্ট্রীয় কাগুজে নোটগুলোকে ৪৫, ৯০ ইত্যাদি সংখ্যা অনুযায়ী প্রকাশের নির্দেশ দেন। ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে আরেক দফা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

২০০২ সালের ৫ ডিসেম্বর গৃহবন্দী অবস্থায় ৯১ বছর বয়সে বার্মার এককালের এই লৌহমানব মারা যান। ইতিমধ্যে তাঁর উত্তরসূরি সামরিক শাসকেরা দেশটির নাম পাল্টে রেখেছেন 'মিয়ানমার'। মৃত্যুর আগে নে উইনের জন্য একটা বড় ট্র্যাজেডি ছিল এটা দেখে যাওয়া যে তাঁর হাতে বেড়ে ওঠা সামরিক কর্মকর্তারা যখন তাঁরই মেয়ে সান্দার উইনকে (Sandar Win) আটক করেছে সামরিক শাসনের ষড়যন্ত্রের জন্য। সামরিক শাসকের জীবনে নে উইনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হিসেবে

গণ্য করা হতো তাঁর এই কন্যাকে। তাঁর আরেকটি 'অবদান' হলো রেঙ্গুনের নাম পাল্টে ইয়াঙ্গুন করা এবং রাজধানী রেঙ্গুন থেকে নেপিটাতে স্থানান্তর।

৪. '৩০ কমরেড' ও বার্মার স্বাধীনতা

আজকের বার্মা অঞ্চল যখন ব্রিটেনের অধীন ছিল, তখন ঔপনিবেশিক অধীনতা থেকে স্বাধীনতার গোড়াপত্তন করেছিল ৩০ জনের যে ছাত্র গোষ্ঠীটি এবং যার থেকে প্রথমে 'বার্মা ইনডিপেনডেন্ট আর্মি' (বিআইএ) এবং পরে আজকের আধুনিক বার্মার সেনাবাহিনীর সৃষ্টি, তাকেই ইতিহাসে 'ত্রিশ কমরেড' বাহিনী হিসেবে অভিহিত করা হয়।

১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল বার্মাকে ভারত থেকে আলাদা করে একটা স্বতন্ত্র কলোনি ঘোষণা করেছিল ব্রিটিশরা। 'ত্রিশ কমরেড'-এর সংঘবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস মূলত তখন থেকে। তবে এই ৩০ জনের সংঘবদ্ধ হওয়ার আরও কিছু পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। ১৯৩০ সালে রেঙ্গুনে জাতীয়তাবাদী বামার তরুণেরা মিলে 'We Burmans Association' নামের একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিল। স্থানীয় ভাষায় এদের বলা হতো 'Dobama Asiayone' বা 'থাকিন' (গুরু)। ১৯৩৬ সাল নাগাদ এই সংগঠনের সঙ্গে আং সাঙ ও উ নোদের পরিচয় হয়। শেষোক্তরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত বামপন্থী। এঁদের সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে পুরোনো থাকিনদের মাঝে কিছু বিভক্তিও আসে। তবে আং সাঙ ও উ নোদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল 'ত্রিশ কমরেড' সংগঠন। সংগঠনে সবারই ছদ্মনাম ছিল। পরবর্তী জীবনে অনেকেই ওই সব ছদ্মনামেই রাজনৈতিক পরিচিত বহন করতেন। শুরুতে এঁরা মূলত রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়েই গোপনে জমায়েত হতেন এবং ১৯৩৯ সাল থেকে এঁরা ব্রিটিশদের তাড়াতে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ পাওয়ার পথ অন্বেষণ করেছিলেন।

শুরুতে এই বাহিনীর লক্ষ্য ছিল চীনের কমিউনিস্টদের সহায়তা। কিন্তু চীনের ফুজিয়ানের উদ্দেশে রওনা হওয়ার পথেই হাইনান দ্বীপে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় জাপানিদের সঙ্গে এবং জাপানিরা তাঁদের সাহায্য দানের প্রস্তাব করে। এভাবেই বার্মামুখী জাপানি বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সহায়তায় প্রথমে বার্মার বাইরে এই গোষ্ঠীর গোড়াপত্তন ১৯৪১ সালে।

তখন তাঁদের গড় বয়স ছিল ২৪-২৫ বছর। প্রাথমিকভাবে এই গ্রুপ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কাছেই প্রশিক্ষণ নেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে চীনযাত্রা করলেও নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত জাপানিদেরই প্রশিক্ষক হিসেবে পান তাঁরা। জাপান অধিকৃত চীনের একটি দ্বীপে এঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং প্রশিক্ষণ শেষে থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম হয়ে 'ত্রিশ কমরেড' গ্রুপ নিজ দেশে প্রবেশ করে। তখন তাদের নেতা ছিলেন আং সাঙ।

ঐতিহাসিক বিভিন্ন ভাষ্য থেকে জানা যায়, শুরুতে এই গোষ্ঠীর সংখ্যা ৩০ থেকে কিছু কম ছিল এবং প্রশিক্ষণ শেষে তরুণেরা বার্মায় প্রবেশের পূর্বে থাইল্যান্ডের রাজধানীতে এক বাসায় তাঁরা একটি গামলায় সবার শরীর থেকে প্রতীকী রক্ত নিয়ে সেই রক্ত পান করে স্বাধীনতার শপথ নেন। এটা ছিল বার্মা অঞ্চলের যোদ্ধাদের 'thway thauk' নামের একটা পুরোনো প্রথা। ১৯৪১ সালের ২৬ ডিসেম্বর এই ঘটনা ঘটেছিল এবং এভাবেই জন্ম নেয় আজকের বার্মার সেনাবাহিনী। একই বছরের একই মাসে (১৪ ডিসেম্বর) বার্মা ফ্রন্টে জাপান ব্রিটিশদের ওপর আক্রমণ করে। ২৩ ডিসেম্বর রেঙ্গুনের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু হয়। একই সময়ে ত্রিশ কমরেডও পথে পথে নিজেদের যোদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে শক্তি অর্জন করছিল। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি ত্রিশ কমরেড প্রায় ১৮ হাজার সদস্যের এক বাহিনী গঠন করে ফেলে, যদিও তাদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি ছিল। এই বাহিনী যত বড় হচ্ছিল, ততই বার্মাজুড়ে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর (কারেন, কাচিন ইত্যাদি) সঙ্গে তাদের সংঘাত হচ্ছিল। শেষোক্তরা তখনো ব্রিটিশদের সঙ্গে সমঝোতায় আবদ্ধ ছিল।

সুজকি কাইজি (বো মগিউ নামে পরিচিত ছিলেন) নামের একজন জাপানি সামরিক কর্মকর্তা 'ত্রিশ কমরেড'-ভুক্ত তরুণদের ঘিরে বার্মায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির পরিকল্পনা সমন্বয় করছিলেন তখন। বস্তুত, 'ত্রিশ কমরেড'-কে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সামরিক অভিযান পরিচালনার মধ্য দিয়ে জাপানই বার্মার স্বাধীনতাকে বেগবান করেছিল। জাপানের হাতেই বার্মার রাজনৈতিক ইতিহাসের এলিট গ্রুপটির জন্ম। জাপানের সামরিক বাহিনীর যে গোয়েন্দা ইউনিট উপরিউক্ত বার্মা অভিযান সমন্বয় করছিল, তা 'Minami Kikan' নামে পরিচিত ছিল।

১৯৪২ সালের ৯ মার্চ জাপানের বাহিনী রেঙ্গুন প্রবেশ করে এবং ২০ মে তাদের বার্মা দখল সম্পন্ন হয়। আর ইতিহাসের এই সময়ে (১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫) বার্মায় ব্রিটিশ শক্তি জাপান ও স্থানীয়দের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে ভারত সীমান্তের ভেতরে অবস্থান নিতে শুরু করে। আর উল্লিখিত 'ত্রিশ কমরেড'-এর মাধ্যমে আং সাঙের নেতৃত্বে ইতিহাসে নতুন করে স্বাধীন বার্মা প্রতিষ্ঠার সূচনা ঘটছিল। একপর্যায়ে ত্রিশ কমরেড তাদের গ্রুপকে বিআইএ বা বার্মা ইনডিপেনডেন্ট আর্মি নাম দেয়। আং সাঙের পরেই এই বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন লেইয়া। ধারণা করা হয়েছিল, আং সাঙ রাজনীতিতে পূর্ণ সময় দেওয়ার সময় লেইয়া বাহিনীপ্রধানের দায়িত্ব নেবেন। যদিও পরে নে উইনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

উল্লেখ্য, উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামে শুরুতে জাপানের সহায়তা নিলেও ত্রিশ কমরেডরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বুঝতে পেরে দ্রুতই তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে ব্রিটিশদের সহায়তায় জাপানিদের বার্মা থেকে তাড়ায় এবং ইতিহাসে

চতুর্থবারের মতো বার্মা স্বাধীন দেশ হিসেবে পথচলা শুরু করে। এর পূর্বে তিন দফায় বার্মা স্বাধীন ছিল ১০৪৪-১০৭৮, ১৫৩০-১৫৫০ এবং ১৭৫২-১৭৬০ সময়ে।

তবে স্বাধীনতার ওই উষালগ্নে আং সাঙের মৃত্যুর পর 'ত্রিশ কমরেড'-এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দিয়েছিল। উ নো, নে উইন প্রমুখ এক পক্ষে এবং বো ই প্রমুখ ভিন্ন পক্ষে অবস্থান নেন। প্রথমোক্তরা আনুমানিক দুই হাজার সৈনিকের এক বাহিনী নিয়ে রেঙ্গুনে সরকার নিয়ন্ত্রণ করছিল এবং শেষোক্তজনের অনুসারীরা কমিউনিস্ট আদর্শতাড়িত হয়ে বার্মার বিশাল অংশ দখলে রাখতে সক্ষম হয়। রেঙ্গুনের উত্তরের পেগু শহরকে ঘিরে তাদের ছিল বিশাল এক মুক্তাঞ্চল। তবে একপর্যায়ে নে উইনের নেতৃত্বে ১৯৬২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর তারা সামরিক সরকারে যোগ দেয়।

যদিও বর্তমানে বার্মার সামরিক বাহিনী আং সাঙ ও 'ত্রিশ কমরেড'-এর উত্তরাধিকার হিসেবে নিজেদের দাবি করে থাকে। কিন্তু কার্যত ১৯৬০ সালের পর থেকে এই বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ১৯৪৯ সালে নে উইন সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়ার সময় যেসব তরুণ তাঁর অনুসারী ছিলেন তাঁদের দ্বারা। ত্রিশ কমরেডের সর্বশেষ জীবিত সদস্য বো ই ২০১৩ সালের ২৮ নভেম্বর ৯২ বছরে মারা যান।

৫. বার্মায় ব্রিটেনের শাসনের ধারাবাহিক বিস্তৃতি

বার্মা তিনবার ব্রিটিশ আগ্রাসনের শিকার হয়। প্রথমবার ১৮২৪ সালে। দ্বিতীয়বার ১৮৫২ সালে এবং তৃতীয়বার ১৮৮৫ সালে।

প্রথম যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিজয়ী হয় এবং বার্মা আসাম, মণিপুর ও আরাকান হারায়। এই যুদ্ধ শুরু হয় আরাকান ও চট্টগ্রামের মধ্যে সংঘাতকে কেন্দ্র করে। ইতিহাসের এই সময় বার্মার মূল রাজ্য ছিল আভাকেন্দ্রিক। যুবরাজ বাঁধন এই রাজ্য শাসন করছিলেন (১৭৮২-১৮১৭), যাঁকে ইতিহাসে এখন বোধাপায়া নামে উল্লেখ করা হয়। যুদ্ধ শুরু হয় মূলত আসামে আভা রাজার অভিযানকে কেন্দ্র করে। আরাকান এ সময় থেরাবাদা বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাস ছিল। প্রায় ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে বোধাপায়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র থাডো মিন শ এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ১৭৮৫ সালে আভা রাজা আরাকান দখল করে নেয়। ১৮১৭ সালে বোধাপায়ার মৃত্যুর পর তাঁর নাতি বাগিদ অ নতুন রাজা হন। তাঁর নেতৃত্বে ১৮১৯ সাল থেকে আভা রাজবংশ মণিপুর ও আসামে অভিযান শুরু করে। ইতিমধ্যে আরাকানে আভা রাজার অতিরিক্ত করারোপ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮১১ সালে স্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। গেরিলাযুদ্ধ শুরুর পাশাপাশি ৪০ হাজার আরাকানিজ এ সময় পালিয়ে চট্টগ্রাম চলে আসে, যা ছিল ব্রিটিশ অধীনে। এভাবেই একদিকে আরাকান এবং অন্যদিকে আসাম ও মণিপুরে বামারদের

অভিযানগুলোর মধ্য দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে আভা রাজাদের সম্পর্কের অবনতি শুরু হয় এবং ১৮২৪ সালের ৫ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে উভয়ের মধ্যে প্রথম যুদ্ধের সূচনা ঘটায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল যুদ্ধ ছিল এটা। ৫০ লাখ পাউন্ড ব্যয় ছাড়াও প্রায় ১৫ হাজার সৈনিক হারায় এ সময় কোম্পানি। তবে বামারদের কাঠের নৌকাভিত্তিক নৌযুদ্ধের বিপরীতে কোম্পানির স্টিমারভিত্তিক নৌবাহিনী বামারদের হতভম্ব করে দিয়েছিল। ১৮২৬ সালে আভা রাজা আলোচনার প্রস্তাব দেন। যার ফল হিসেবে ২৬ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। এটাই ইতিহাসে ট্রিটি অব ইয়ানদাবো নামে পরিচিত।

ইয়ানদাবো বার্মার ইরাবতী নদীর তীরবর্তী একটি শহর। বস্তুত ইয়ানদাবো চুক্তিতে উপনীত হতে বার্মা বাধ্য হয়েছিল। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শক্তি মণিপুর, আসাম এবং বিশেষভাবে আরাকানের ওপর বার্মার কর্তৃত্বের বিলোপ সাধন করে এবং নিজেদের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল এক যুদ্ধ থেকে নিষ্কৃতি পায়। চুক্তিতে আরাকানকে নির্ধারণ করা হয় ভারত ও বার্মার (কিংডম অব আভার) সীমান্ত হিসেবে। বার্মা এই চুক্তি করলেও তা মেনে চলতে অনিচ্ছুক ছিল। ফলে পরবর্তীকালে বার্মার সঙ্গে ব্রিটিশদের আরও দুটি যুদ্ধ হয়। 'ট্রিটি অব ইয়ানদাবো' অনুযায়ী, বার্মার রাজাকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ব্রিটিশদের ১০ লাখ পাউন্ড অর্থ দিতেও বাধ্য করা হয়েছিল এবং আভার রাজধানী অমরাপুরাতে (বর্তমানের মান্দালের অন্তর্ভুক্ত) কোম্পানিকে দপ্তর খোলার সুযোগ করে দিতে হয়। হেনরি বার্নেকে কোম্পানির প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে অমরাপুরাতে পাঠানো হয়।

এদিকে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত আভা রাজা বাগিদ অ ১৮৪৬ সালে মারা যান। এ সময় অমরাপুরার নীতিনির্ধারক পরিমণ্ডলে ব্যাপক অন্তঃকলহ চলছিল। বাগিদ অর মৃত্যুর পরই তাঁর অত্যন্ত প্রভাবশালী স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা করা হয়। নতুন রাজা থারাওয়াদি ব্রিটিশদের কাছ থেকে বিগত যুদ্ধে হারানো ভূমি পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিলেন। এ সময় কোম্পানি আফগানিস্তান ও চীন সীমান্তে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ছিল। থারাওয়াদি এই সুযোগ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ১৮৪১ সালে তিনি রেঙ্গুনে এক বড় সামরিক মহড়ারও আয়োজন করেন। তাঁর এইরূপ যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পর্কে কোম্পানি অবহিত ছিল। এ সময় থারাওয়াদির মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন পাগান।

পাগান শাসন পরিস্থিতি উন্নত করার চেষ্টা করছিলেন। ১৮৫১ সাল নাগাদ দেখা যায়, রেঙ্গুন বন্দরে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা কঠোর নিয়মকানুনের মুখে পড়ছেন। উত্তেজিত লর্ড ডালহৌসি কলকাতা থেকে দুটি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করেন তার প্রতিবাদস্বরূপ। পাগানকে আবার মাথা নোয়াতে হয়। কিন্তু এ সময় কোম্পানি ক্রমাগত আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে থাকে আভা সরকারের বিরুদ্ধে। এভাবেই শুরু

হয় দ্বিতীয় ব্রিটিশ-বার্মা যুদ্ধ। স্বল্পস্থায়ী এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা ১৮৫২ সালেই পেগু প্রদেশ (বর্তমানের বাগো রিজন) পর্যন্ত দখল করে নেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কোম্পানি একদিকে যেমন চট্টগ্রাম-সন্নিহিত তার ভারত সাম্রাজ্যকে নিরাপদ করেছিল, তেমনি বার্মার সমুদ্র-সন্নিহিত প্রায় পুরো উপকূল দখলের মধ্য দিয়ে সেখানে বাণিজ্যের দ্বার অবারিত করতে সক্ষম হয়। আরাকান ও রেঙ্গুনকে সমন্বিত করে ব্রিটিশরা তাদের অধীনে নতুন এক জনপদ পায়। পরে যার নাম রাখা হয় 'লোয়ার বার্মা' এবং ১৮৫২ সালের ২০ ডিসেম্বরে ব্রিটিশরা তা অধীনে নেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এদিকে দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের মাত্র দুই মাসের মধ্যে পাগান এক প্রাসাদ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে উৎখাত হন। এদিকে পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে বার্মার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে লাওস-কম্বোডিয়া-ভিয়েতনামে ফরাসি আধিপত্যে ব্রিটিশরা নতুন করে উদ্বিগ্ন ছিল। এ সময় আভা রাজবংশ ইউরোপে ব্রিটিশবিরোধী বিভিন্ন দেশ, যেমন ইতালি, ফ্রান্স ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করছিল। এ ছাড়া ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার অনেক নীতিনির্ধারক বার্মার মধ্য দিয়ে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছিলেন। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে 'আপার বার্মায়' ব্যাপক বাণিজ্যিক মুনাফার সন্ধান পেয়েছিলেন, যার জন্য তাঁদের প্রয়োজন ছিল পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। এসবেরই মিলিত ফল ছিল বার্মায় তৃতীয় ব্রিটিশ অভিযান। এটা ছিল কার্যত অজুহাতহীন এক আক্রমণ। এ সময় আভা রাজা ছিলেন পাগানের নাতি থিবো। অভিযানের পূর্বমুহূর্তে তাঁকে বলা হয়েছিল, বৈদেশিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা ব্রিটিশদের কাছে অর্পণের জন্য। স্বভাবত এইরূপ প্রস্তাব ছিল অপমানকর।

১৮৮৫ সালের ১৪ নভেম্বর ব্রিটিশ বাহিনী আপার বার্মার দিকে অভিযান শুরু করেছিল। বলা বাহুল্য, পূর্বোক্ত দুই যুদ্ধে বিধ্বস্ত আভা বংশ দ্রুতই আত্মসমর্পণ করে। প্রায় রক্তপাতহীন এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা পুরো বার্মাই দখল করে নেয়। থিবোকে ভারতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। অমরাপুরা বা মান্দালের পরিবর্তে রেঙ্গুনকে রাজধানী করে ১৮৮৬ সালের শুরু থেকে বার্মা ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার নতুন প্রদেশ হিসেবে যাত্রা করে এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই অবস্থাই বহাল থাকে। ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার অংশ হওয়ার পর রেঙ্গুনে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং বার্মা ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় প্রভিন্সে পরিণত হয়।

১৯৩৭ সালের পর ব্রিটেন 'বার্মা অফিস' নামে পৃথক একটি সত্তা প্রতিষ্ঠা করে। বার্মা ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া থেকে আলাদা হয়। তবে জাপানের অভিযানের মুখে পরবর্তী সময়ে বার্মায় ব্রিটেনের শাসন বিঘ্নিত হতে থাকে। ১৯৪২-৪৫ সময়কালে রেঙ্গুন (বর্তমানের ইয়াঙ্গুন) জাপানিদের অধীনে চলে যায়। ১৯৪৫ সালের মে মাসে ব্রিটিশরা আবার তা উদ্ধার করে।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বার্মা ব্রিটেনের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা পায়। বার্মায় ব্রিটিশ শাসনকালে শ্যান, চিন ও কাচিন এলাকা 'ফ্রন্টিয়ার এরিয়া' হিসেবে প্রশাসনিক পৃথক সত্তা হিসেবে বিবেচিত হতো। ব্রিটিশ দখলদারত্বের পর নতুন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বার্মার অর্থনীতি ও প্রশাসনে ভারতীয়দের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ে।

৬. পেংলং চুক্তি এবং 'নতুন শতাব্দীর পেংলং'

পেংলং মিয়ানমারের শ্যান প্রদেশের একটি শহর। এই শহরেই ১৯৪৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি 'পেংলং সম্মেলন' হয়, যেখানে বামার জনগোষ্ঠীর পক্ষে আং সাঙের সঙ্গে চিন, কাচিন ও শ্যানদের 'ইউনিয়ন' গঠনের চুক্তি হয়। শেষোক্ত এলাকাগুলোকে ব্রিটিশরা 'ফ্রন্টিয়ার এরিয়া' বলত এবং এগুলো পৃথক রাজনৈতিক সত্তা আকারেই ছিল। আর ফ্রন্টিয়ার এলাকার মানুষেরা বামারদের এলাকাকে তখন বলত 'মিনিস্ট্রিয়াল বার্মা' বা 'বার্মা প্রপার'। সামাজিকভাবে এটাকে 'লোয়ার বার্মা'ও বলা হতো।

চিন, কাচিন ও শ্যানদের পক্ষে 'মিনিস্ট্রিয়াল বার্মার' সঙ্গে চুক্তির উদ্যোক্তারা মনে করছিলেন, বামারদের এলাকার অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে এই চুক্তি সম্পূর্ণ অঞ্চলের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করবে।

নয়টি ধারা-সংবলিত এই চুক্তির মাধ্যমে শ্যান, কাচিন ও চিনরা নিজ নিজ প্রদেশে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ বামারদের নিয়ে 'বার্মা রাষ্ট্র' গঠনে সম্মত হয়। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে কার্যত বার্মার অপ্রধান জাতিসত্তাগুলো মূল জাতি বামারদের প্রতিনিধি আং সাঙের ওপর অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদের ভবিষ্যৎ স্বাধিকারের প্রশ্নটি মীমাংসার ভার অর্পণ করে। এই চুক্তির স্মরণেই ১২ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারে 'ইউনিয়ন ডে' হিসেবে পালিত হয়। এই চুক্তি প্রভিন্সগুলোর আর্থিক স্বায়ত্তশাসনেরও নিশ্চয়তা দিয়েছিল এবং এ-ও বলা হয়েছিল যে কোনো প্রভিন্স চাইলে ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যেতে পারবে।

বস্তুত, এই চুক্তি ছিল ১৯৪৭ সালের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে ব্রিটেনে আং সাঙের সঙ্গে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের এই মর্মে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির (Aung San-Attlee Agreement) ফল, যেখানে বলা হয়েছিল বামাররা চিন, শ্যান, কাচিন ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে শুধু তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার স্বাধীনতা পাবে। তখন আং সাঙ বার্মায় গিয়ে অন্যান্য জাতিসত্তাকে বার্মা ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আশ্বস্ত করেন যে এই রাষ্ট্রে তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন থাকবে। আং সাঙ এই মর্মেও তখন স্লোগান তুলেছিলেন যে 'বামাররা এক কিয়াত পেলে, শ্যান বা কাচিনরাও এক কিয়াত পাবে'। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদ সমরূপে বণ্টিত হবে।

আং সাঙের মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী সংবিধান উপরিউক্ত সম্মতি থেকে পরিস্থিতিকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে। ১৯৬১ সালের জুনে আবারও শেষবারের মতো বামার ব্যতীত দেশটির অধিকাংশ জাতিসত্তার প্রতিনিধিরা (জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ যারা) শ্যান স্টেইটের তন জি (Taung Ghi) প্রকৃত একটি ফেডারেল সংবিধান তৈরির লক্ষ্যে আবারও এক দফা সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী উ নো কিছু উদ্যোগও নিতে শুরু করেছিলেন। তবে সামরিক অভ্যুত্থান এই পুরো প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে দেয়।

১৯৬২-পরবর্তী সামরিক শাসক নে উইনের আমল থেকে বার্মা কর্তৃপক্ষ আং সাঙের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকে। আবারও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ২০০৮ সালের সংবিধানে প্রভিন্সগুলোর স্বায়ত্তশাসনমূলক অনেক ক্ষমতা খর্ব করা হয়।

তবে ২০১৬ সালে অং সান সু চি ক্ষমতায় আসার পর বার্মাজুড়ে যুদ্ধরত জাতিসত্তাগুলোর দাবিদাওয়া মীমাংসা এবং নতুন করে শান্তি প্রক্রিয়া শুরুর লক্ষ্যে 'একবিংশ শতাব্দীর পেংলং' নামে এক সম্মেলন ডাকেন। ২০১৬ সালের ৩১ আগস্ট দেশটির রাজধানী নেপিটাতে শুরু হয়ে চার দিনব্যাপী এই নতুন দফা শান্তি আলোচনা চলে। এই সম্মেলন শেষে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। নতুন দফা এই পেংলংয়ে প্রায় ২০টির মতো সংগঠন উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন জাতিসত্তার ক্ষোভ-বিক্ষোভের কারণগুলো তুলে ধরে। তবে আগস্টের এই সম্মেলনেও কয়েকটি শক্তিশালী সশস্ত্র গ্রুপ যোগ দেয়নি, যার মধ্যে ছিল ওয়া আর্মি। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই পেংলং সম্মেলনে মুখ্য বিবাদিত বিষয় ছিল দুটি : সংবিধানে ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার উল্লিখিত থাকা এবং সেনাবাহিনীকে ফেডারেল চরিত্র দেওয়ার প্রশ্ন। স্বাধীনতার পরপর ১৯৪৮ সালের সংবিধানে (দশম অধ্যায়) সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর প্রাধান্যপূর্ণ প্রভিন্সগুলোকে 'ইউনিয়ন' থেকে পৃথক হওয়ার অধিকারের যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ২০০৮ সালের সংবিধানে, তা বাদ পড়েছে এবং সেখানে উল্লিখিত হয়েছে যে 'no part or territory of the Union shall ever secede.'

২০১৭ সালের মে মাসে উপরিউক্ত সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় বৈঠক হয় এবং ২০১৮ সালের মে মাসে তৃতীয় বৈঠকের সময় নির্ধারিত রয়েছে।

বর্তমানে বার্মায় জাতিগত সংখ্যালঘুদের মাঝে দুটি ধারা রয়েছে। একটি ধারা (প্রায় আটটি সংগঠন) বার্মার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রয়েছে এবং অপর একটি ধারা (তিনটি সংগঠন) যুদ্ধরত অবস্থায় রয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংস্কার প্রশ্নে সম্ভাব্য যেকোনো মতৈক্যে উপরিউক্ত দুই ধারাকেই যুক্ত করার অনিবার্যতা রয়েছে।

অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকই মনে করেন, মিয়ানমারে কার্যকর বর্তমান সংবিধান সেনাবাহিনীকে যেরূপ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে, তার ফলে সেনাবাহিনীর

সঙ্গে যুদ্ধরত জাতিসত্তাগুলোকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দিয়ে ১৯৪৭ সালের আদলে নতুন কোনো ইউনিয়ন বা ফেডারেল রাষ্ট্র পুনর্গঠন বর্তমানে খুবই দুরূহ এক চ্যালেঞ্জ। ফলে 'নতুন শতাব্দীর পেংলং'-এর যেকোনো ভবিষ্যৎ আলোচনা এবং তার সফলতা নির্ভর করছে সংবিধানের সম্ভাব্য সফল সংশোধনীর ওপর।

৭. বার্মার সংবিধান ও আন্তজাতি অবিশ্বাসের কারণ

ইউনিয়ন বার্মার প্রথম সংবিধান তৈরি শুরু হয় যখন দেশটি স্বাধীনতার লক্ষ্যে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছিল এবং স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ব্রিটিশদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। ওই সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৪৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। ১৯৬২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর ১৯৭৪ সালের ৩ জানুয়ারি সামরিক জান্তার অধীনে দ্বিতীয় সংবিধান তৈরি হয় এবং ২০০৮ সালের ২৯ মে সর্বশেষ সংবিধানটি 'গণভোট'-এ অনুমোদিত হয় এবং ২০১১ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হয়। তুলনামূলকভাবে ১৯৪৭ সালের সংবিধানই বার্মায় গণতান্ত্রিক পরিবেশে তৈরি হয়েছিল। যদিও ওই সময়ও মূলত একটি দলই (অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট পিপলস ফ্রিডম লিগ—এএফপিএফএল) বার্মার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছিল, কিন্তু তার অধীনে দেশে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা কাজ করছিল।

১৯৪৭ সালের সংবিধানে দেশটির মূল জনগোষ্ঠী বামার অধ্যুষিত এলাকাগুলোর বাইরের অঞ্চলকে জনজাতির পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রভিন্স হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের অনেককে স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি দেয়। মূলত তাদের এই স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতিই বার্মার স্বাধীনতা সম্ভব করেছিল এবং ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে দেশটির গড়ে ওঠার ভিত রচনা করেছিল।

১৯৪৭ সালের সংবিধান অনুযায়ী, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রমে কিছু সংকট তৈরি হয়েছিল বার্মাজুড়ে। একটা হলো বিভিন্ন অ-বার্মার জাতির মাঝে বিচ্ছিন্নতার বোধ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। বামাররা এ সময় সর্বস্তরে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে গেলে একরূপ জাতিগত দূরত্ব তৈরি হয় অন্যদের সঙ্গে। আবার বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার উদ্যোগ নিলে (১৯৬১ সালের ৩১ আগস্ট যা অনুমোদিত হয়) অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মাঝেও (বিশেষ করে খ্রিষ্টান কাচিন এবং রোহিঙ্গা মুসলমান) বিচ্ছিন্নতার বোধ বাড়তে থাকে। এ রকম পরিস্থিতির সুযোগ নেয় সেখানে নে উইনের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী। ১৯৬২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সামরিক বাহিনী কোনো সংবিধান ছাড়াই দেশটি শাসন করে স্বঘোষিত এক বিপ্লবী কাউন্সিলের মাধ্যমে।

১৯৭৪ সালের সংবিধান উপরিউক্ত কাউন্সিল কর্তৃকই তৈরি হয়। পুরোপুরি একদলীয় এবং সামরিক আবহে বার্মার একটা 'সমাজতান্ত্রিক দেশ' হিসেবে রূপান্তর

ঘটাতে দ্বিতীয় এই সংবিধান তৈরি হয়। এই সংবিধানের অধীনে যে নির্বাচন হয়, তাতে জেনারেল নে উইনের কাছ থেকে নে উইনের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়! কার্যত, সামরিক বাহিনীর শাসনই তখনো চলতে থাকে। ২০০৮ সালের শেষোক্ত সংবিধানও তৈরি হয় মূলত সশস্ত্র বাহিনীর প্রভাবাধীন। তখন সামরিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামোর নাম ছিল SLORC (স্টেইট ল অ্যান্ড অর্ডার রেস্টোরেশন কাউন্সিল)। বর্তমানে ব্যাপকভাবে মনে করা হয় যে দেশটির জাতিগত অবিশ্বাস ও সহিংসতার মূলে রয়েছে SLORC কর্তৃক তৈরি সর্বশেষ ওই সংবিধান। তবে ২০১৭ সালে দেশটির নীতিনির্ধারকেরা আধা আনুষ্ঠানিক এক আলোচনায় জানিয়েছেন অ-বামার সাতটি স্টেইট চাইলে নিজেদের সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। তবে এইরূপ অধিকারের স্বীকৃতি কার্যত এখনো কোনো বাস্তব অর্থ বহন করে না। কারণ, কেন্দ্রীয় সংবিধানে স্টেইটগুলোর মাঝে রাষ্ট্রের রাজস্ব ও ক্ষমতার বণ্টনের বিষয়ে কোনো ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা দেওয়া থেকে বিরত রয়েছে। এইরূ প পটভূমিতেই বার্মাজুড়ে বর্তমান সংবিধান সংশোধনের জোরালো দাবি রয়েছে এবং একেই দেশটির রাজনৈতিক সংস্কারের প্রথম শর্ত হিসেবে মনে করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের সংবিধানের শুরুতে বলা হয়েছিল, বার্মা হবে একটা 'ইউনিয়ন'ভিত্তিক রাষ্ট্র। ১৯৭৪ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রের পরিচয় নির্ধারিত হয়েছিল 'সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হিসেবে। আর সর্বশেষ সংবিধান অনুযায়ী, মিয়ানমার হবে এমন একটা সার্বভৌম জাতি, যা হবে প্রজাতন্ত্র এবং যার প্রথম লক্ষ্য হবে non-disintegration.

সর্বশেষ সংবিধানের দুটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে তথাকথিত 'ইউনিয়ন'-এর একত্বের ওপর জোর দেওয়া হয় এবং বার্মাকে একটা 'জাতি' হিসেবে অভিহিত করা হয় (Myanmar is a Nation)। এই সংবিধান বামার প্রধান কেন্দ্রীয় এলাকাগুলোকে 'রিজন' (সাতটি), মূখ্যত অ-বামার সীমান্ত এলাকাগুলোকে 'স্টেইট' (সাতটি) এবং অন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে (যেগুলো বিভিন্ন রিজন ও স্টেটের মাঝে পড়েছে) 'স্বশাসিত এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত করে। এরূপ এলাকা রয়েছে ৬টি। এ ছাড়া আছে রাজধানী নেপিটা নিয়ে একটি ইউনিয়ন টেরিটরি।

সর্বশেষ সংবিধানে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিসরে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকাকে বৈধতা দেওয়া হয়। এই সংবিধান পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিধান করেছে। এ ছাড়া সীমান্ত, প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অবশ্যই একজন করে সেনা কর্মকর্তাকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের নিয়ম রাখা হয়েছে।

এই সংবিধান এমন বিধানও করেছে যে বিদেশি কাউকে বিয়ে করা হলে বা পিতা-মাতা বিদেশি হলে বা সন্তান বিদেশি নাগরিক হলে কোনো নাগরিক দেশটির প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। মূলত, অং সান সু চির প্রেসিডেন্ট হওয়া বন্ধ করতেই

এই বিধান করা হয়। এ ছাড়া নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে বলা হয়, যাঁদের পিতা-মাতা বার্মার নাগরিক ছিলেন, তাঁরাই দেশটির নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবেন। এর মধ্য দিয়ে বহু মানুষ যে কেবল বার্মার নাগরিকত্ব হারিয়ে ফেলেন তা-ই নয়, অনেকে রাষ্ট্রবিহীন নাগরিকে পরিণত হন। বিশেষত যাঁদের পিতা-মাতার একজন কেবল দেশটির নাগরিক ছিলেন এবং বার্মায় যাঁদের জন্ম। এ ছাড়া নাগরিকত্বের বিষয়টি বর্তমান সংবিধান এমন এক 'আইন'-এর অধীন করেছে, যার মধ্য দিয়ে বার্মা কার্যত পুরো বিশ্বের থেকে পৃথক এক অবস্থান নিয়েছে।

১৯৪৭ সালের সংবিধানে জাতিগত সংখ্যালঘুদের কোনো স্টেইট চাইলে ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে সুযোগ রাখা হয়েছিল, (সংবিধান তৈরির ১০ বছর পর) সর্বশেষ সংবিধানে তার কোনো অবকাশ নেই। তখন মূলত শ্যান ও কারেননি স্টেইটের দাবির মুখে সংবিধানে ওইরূপ বিধান যুক্ত হয়েছিল। তবে কাচিন ও কারেনদের ক্ষেত্রে এমন অধিকার রাখা ছিল না। বর্তমানে কারও ক্ষেত্রেই এমন সুযোগ নেই, যা 'পেংলং সমঝোতা' অবস্থান থেকে বড় ধরনের এক বিচ্যুতি।

৮. বার্মার শাসনকাঠামো এবং বামার জাতিগত প্রাধান্যের স্বরূপ

দীর্ঘ সামরিক শাসন শেষে বার্মায় এখন আনুষ্ঠানিক অর্থে নির্বাচিত পার্লামেন্টই দেশ শাসন করছে। তবে পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের মাঝেও দেশটির শাসন কাঠামোতে সশস্ত্র বাহিনীর প্রবল আধিপত্য লক্ষণীয়। সামরিক শাসন থেকে 'গণতান্ত্রিক শাসন'-এ উত্তরণকালে নতুন উপসর্গ যেটা যুক্ত হয়েছে, শাসনকাঠামোতে 'বৈধ'ভাবেই বামারদের আধিপত্যও যুক্ত হয়েছে। ফলে ১৯৪৮ সালে দেশটি যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে বামারদের স্বাধীনতা এবং অন্য জাতিসত্তাগুলোর পরাধীনতা। ব্রিটিশ শাসনামলে (১৮২৪-১৯৪৮) পরিস্থিতি ছিল উল্টো। তখন ব্রিটিশরা বামার এলাকাগুলোতে সরাসরি শাসন করলেও অন্যান্য জাতিসত্তার প্রান্তিক এলাকাগুলোতে ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন।

আপাতদৃষ্টিতে বার্মার শাসনকাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট। তিনি রাষ্ট্রের প্রধান, সরকারেরও প্রধান। প্রেসিডেন্টের অধীনে একটা মন্ত্রিপরিষদ দেশের নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাদের অধীনে রয়েছে সাতটি 'অঞ্চল' (রিজন নামে পরিচিত), সংখ্যালঘু জাতিসত্তা প্রধান সাতটি স্টেইট এবং একটা 'ইউনিয়ন টেরিটরি'। স্টেইট ও রিজনগুলোতে প্রেসিডেন্ট একজন করে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ দিয়ে থাকেন। আগে এঁরা সচরাচর সাবেক সামরিক কর্মকর্তা হতেন; বর্তমানে শাসক দলের নেতারাই সুযোগ পাচ্ছেন। স্টেইট ও রিজনগুলোতে নিজস্ব প্রতিনিধিসভাও আছে। তবে কার্যত দেশটির নির্বাহী ক্ষমতা অনেকাংশেই কেন্দ্রীয়ভূত।

বার্মার পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। পার্লামেন্টের ৭৫ ভাগ সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত। অন্যরা সেনাবাহিনীর সদস্য।

পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ 'আমোথা হুলুথো'তে মূলত বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধিরা থাকেন। এর সদস্যসংখ্যা ২২৪। বিভিন্ন রিজন ও স্টেইট থেকে ১২ জন করে নির্বাচিত হয়ে আসেন। অর্থাৎ আরও স্পষ্ট করে বললে, বার্মার ৭টি স্টেইট থেকে এবং ৭টি রিজন থেকে ১২ জন করে মোট ১৬৮ জন এখানে নির্বাচিত হয়ে আসেন আর বাকি ৫৬ জন থাকেন সেনাসদস্য। ফলে দেখা যায়, সদস্যদের মধ্যে বামারদেরই তুমুল আধিপত্য। কারণ, রিজনগুলোতে বামারদেরই বাস। আবার সেনাবাহিনী থেকে আসা সদস্যদের মাঝেও বামারদেরই একচেটিয়া আধিপত্য থাকে।

নিম্নকক্ষ 'প্লিথু হুলুথো'তে সদস্যসংখ্যা থাকে ৪৪০। সেখানে সেনাসদস্য ১১০ জন। অন্য আসনগুলোর জন্য সরাসরি ভোট হয়। সর্বশেষ (এবং পূর্বেও) এই পার্লামেন্টেও কেন্দ্রীয় বামার প্রাধান্যপূর্ণ দলগুলোরই আধিপত্য রয়েছে। কারণ, জাতিগত সংখ্যালঘুদের সম্মিলিত কোনো দল নেই। পরে নিম্নকক্ষের সরাসরি ভোটে কেন্দ্রীয় যে দলই বিজয়ী হোক, তা কার্যত বামারদেরই বিজয় সূচিত করে। উপরন্তু এ ক্ষেত্রেও সেনাসদস্যদের উপস্থিতি বামারদের জন্য বোনাস হিসেবে কাজ করে।

বর্তমানে বার্মার কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে অনানুষ্ঠানিকভাবে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা কাজ করছে। যদিও দেশটিতে প্রায় ৯০টির মতো রাজনৈতিক দল রয়েছে, কিন্তু দু-একটি বাদে (যেমন আরাকান ন্যাশনাল পার্টি ও শ্যান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি) অধিকাংশই তারা আঞ্চলিক পরিসরে কাজ করে থাকে। কেবল এনএলডি এবং ইউএসডিপি জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রীয় স্থানটি দখল করে রেখেছে এবং দুটো দলেই মূল জাতিসত্তা বামারদের আধিপত্য। এ ছাড়া এই দুটি দলেই অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা খুব দুর্বল। এনএলডিতে মূলত সু চিই যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম এবং শেষ কর্তৃত্ব ধারণ করেন। আর ইউএসডিপিতে আধিপত্য মূলত সেনা দৃষ্টিভঙ্গির। যদিও দেশটির শিক্ষিত ও সচেতন সমাজের সমর্থন এনএলডির দিকেই রয়েছে এখনো, কিন্তু দেশের রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক কাঠামোর গণতন্ত্রায়ণে দলটির ব্যর্থতা এবং ইউএসডিপিতে সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের পুরোনো আধিপত্যের কারণে দেশটিতে তৃতীয় একটি গণতন্ত্রবাদী দল গড়ে ওঠার জোরালো তাগিদ লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে, ১৯৮৮ সালের ছাত্র আন্দোলনের সংগঠকদের মাঝে অনেকেই ওইরূপ সম্ভাবনার কথা বলছেন। তবে যত দিন সেটা না হচ্ছে, তত দিন ইউএসডিপিকে ঠেকিয়ে রাখতে আঞ্চলিক জাতিগুলোও এনএলডিকেই সমর্থন করতে দেখা যাবে বলে মনে হয়। এ ছাড়া দেশটির রাজনীতিতে নতুন বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বামার জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের (৮৮ শতাংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী)

এমন এক মিশ্রণ, ফলে ভিক্ষু সংঘগুলোও রাজনীতির পরোক্ষ প্রভাবক হয়ে উঠছে। মন এবং ভিক্ষুসংঘগুলো আর্থসামাজিক ভ্যানগার্ড হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে ক্রমাগত, যা রাজনীতি ও প্রশাসনকেও প্রভাবিত করছে। রাজনীতিতে মুসলমান ও জাতিগত চীনাদের প্রতি ঘৃণাও একটা বড় পণ্য হয়ে আছে বার্মায়।

৯. আপার বার্মা (Upper Burma) এবং লোয়ার বার্মা (Lower Burma)

আপার বার্মা এবং লোয়ার বার্মা শব্দগুলো মূলত ব্রিটিশদের চালু করা।

ইরাবতী নদীর সন্নিহিত নিচু ভূমি এলাকা লোয়ার বার্মা হিসেবে চিহ্নিত। ব্রিটিশ শক্তি বার্মায় প্রথম ও দ্বিতীয় দফা যুদ্ধে এই সব অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। প্রধানত দেশটির সর্ব দক্ষিণের এলাকাগুলো লোয়ার বার্মা হিসেবে চিহ্নিত। এয়াওয়াদি, বাগো, রেঙ্গুন, রাখাইন ও মন স্টেইট এবং তানিনতারি এলাকা লোয়ার বার্মার অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্র উপকূলীয় এসব অঞ্চল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে রেঙ্গুনকেন্দ্রিক। সাংস্কৃতিকভাবে এই অঞ্চলের মানুষ এয়ুক থা (auk tha) নামে অভিহিত হন। সংখ্যালঘু জাতিগুলোর মধ্যে মন, কারেন, রোহিঙ্গা, রাখাইন প্রভৃতি সম্প্রদায় লোয়ার বার্মার অধিবাসী।

অন্যদিকে আপার বার্মা মান্দালে, সাগাইং রিজন এবং কাচিন ও শ্যান স্টেইটকেন্দ্রিক। মূলত, আজকের বার্মার কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলই ওই পরিচয়ে উল্লেখিত হয়। এই অঞ্চল মুখ্যত দেশটির প্রধান জাতিসত্তা বামার অধ্যুষিত। যেখানে লোয়ার বার্মাকে অভিহিত করা যায় প্রধানত মন জাতিসত্তা অধ্যুষিত। বার্মিজ ভাষার উচ্চারণের ধরনেও আপার ও লোয়ার বার্মায় কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।

আপার বার্মার কিছু অঞ্চল আবার ফ্রন্টিয়ার এলাকা নামে অভিহিত হয়, যার মধ্যে আছে কাচিন ও শ্যান স্টেইট। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে বার্মা তথা আজকের মিয়ানমারে ঐতিহাসিকভাবে আপার বার্মার বামার জাতিসত্তার নাগরিকদেরই আধিপত্য। তবে লোয়ার বার্মায় ধানের ব্যাপক উৎপাদন তাকে বার্মার খাদ্যনিরাপত্তার অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে রেখেছে। ব্রিটিশ শাসনামলেই লোয়ার বার্মা এশিয়ার প্রধানতম এক ধানভান্ডার হয়ে ওঠে। এ ছাড়া ব্রিটিশ শাসনামলে তুলনামূলকভাবে ভালো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাজধানী হিসেবে রেঙ্গুনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় লোয়ার বার্মা পুরো দেশের মাঝে বিশেষ গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। ১৮৭৭ সালে শুরু হওয়া রেঙ্গুন থেকে বাগোর প্রমি পর্যন্ত রেলপথের প্রসারও লোয়ার বার্মার অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব বাড়িয়েছিল।

এর প্রমাণ হিসেবে দেখা যায়, ১৮৫৬ সালে যখন লোয়ার বার্মায় জনসংখ্যা ছিল ১৪ লাখ এবং আপার বার্মায় ছিল ৩৬ লাখ। ১৯৩১ সালে তা দাঁড়ায় লোয়ার বার্মায় ৭৮ লাখ এবং আপার বার্মায় ৬৮ লাখ।

বার্মার স্বাধীনতাসংগ্রামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল যে ছাত্ররাজনীতির মধ্য দিয়ে, তারও সূতিকাগার ছিল লোয়ার বার্মার রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. মিয়ানমারে 'যুদ্ধবিরতি চুক্তি' ও জাতিগত সংঘাতের ভবিষ্যৎ

মিয়ানমারে ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার সময় থেকেই এ রকম যুদ্ধাবস্থা চলছে। প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কমিউনিস্ট গ্রুপ এবং জাতিগত কারেনরা। এরপর বার্মার মূলধারার শাসকেরা যত বেশি ফেডারেল ব্যবস্থার সংকোচন ঘটিয়েছেন, যুদ্ধের পরিসর ততই বেড়েছে। তবে ১৯৮০-এর দশকে কমিউনিস্ট ধারাগুলো সশস্ত্র সংঘাতের ধরনে পরিবর্তন ঘটিয়ে বিভিন্ন জাতিগত গ্রুপের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। ফলে বর্তমানে মূলত জাতিগত সশস্ত্রতাই বার্মার গৃহযুদ্ধের মূল বৈশিষ্ট্য। এসব গ্রুপের মূল বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক নয়। কোনো কোনো গ্রুপ যেমন স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়ছে, তেমনি কোনো কোনো গ্রুপ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঘিরেও।

বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রায় ২১টি সশস্ত্র সংগঠন বার্মার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অতীতে এবং বর্তমানে যুদ্ধরত ছিল বা আছে। এই রকম সশস্ত্র গ্রুপগুলোর মধ্যে সাধারণভাবে দুটি ধারা বিদ্যমান। একটি ধারায় পুরোনো কমিউনিস্ট আদর্শ ও সশস্ত্র সংস্কৃতির ছাপ বিদ্যমান। এরা মূলত চীন সীমান্তবর্তী শ্যান ও কাচিন এলাকায় সক্রিয়। আর থাইল্যান্ড সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মন, কারেন, কারেননি গেরিলা গ্রুপগুলোর সক্রিয়তা বেশি, যারা মুখ্যত জাতীয়তাবাদী ধাঁচের এবং যাদের প্রতি পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমের বিশেষ সহানুভূতি লক্ষ করা যায়।

সশস্ত্র এসব দলের একাংশের সঙ্গে ২০১৫ সালের ১৫ অক্টোবর একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে দেশটির তখনকার সেনাবাহিনী সমর্থিত সরকার। এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল, চুক্তি স্বাক্ষরের ৯০ দিনের মধ্যে বিভিন্ন জাতিসত্তার সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘাতের বিষয়গুলো নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সংলাপ শুরু হবে। যেসব সংগঠন এই চুক্তি স্বাক্ষর করে, সেগুলো হলো: ১. আরাকান লিবারেশন পার্টি (এএলপি), ২. চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (সিএনএফ), ৩. ডেমোক্রেটিক কারেন বেনিভোলেন্ট পার্টি (ডিকেবিপি), ৪. কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন (কেএনইউ), ৫. কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি—পিস কাউন্সিল (কেএনএলএ—পিসি), ৬. পা-ও ন্যাশনাল লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএনএলও), ৭. রেস্টোরেশন কাউন্সিল অব শ্যান স্টেইট (আরসিএসএস), ৮. অল বার্মা স্টুডেন্ট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এবিএসডিএফ)।

অন্যদিকে এই চুক্তির বাইরে যেসব বড় সশস্ত্র সংগঠন ছিল, সেগুলো হলো: ১. কাচিন ইনডিপেনডেন্ট অর্গানাইজেশন (কেআইও), ২, ইউনাইটেড ওয়া স্টেইট আর্মি (ইউডব্লিউএসএ), ৩. মন নিউ স্টেইট আর্মি, ৪. মিয়ানমার ন্যাশনাল

ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ), ৫. তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ), ৬. আরাকান আর্মি (এএ), ৭. কারেননি ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টি, ৮. শ্যান স্টেইট আর্মি-নর্থ (এসএসএ-এন)। শেষোক্ত সংগঠনগুলো (যেগুলো সাধারণভাবে নামে non-NCA পরিচিত) ২০১৭ সালে এসে নতুন করে রাজনৈতিক সংলাপের ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতি সম্প্রসারিত করার দাবি জানিয়েছে। যুদ্ধবিরতিতে থাকা এবং যুদ্ধবিরতির বাইরে থাকা উপরিউক্ত দুই ধারার প্রধান এক বৈশিষ্ট্য হলো, শেষোক্ত তালিকার অনেক সংগঠন চীন সীমান্তবর্তী ও চীন প্রভাবিত। এদের মধ্যে ওয়া আর্মি হলো সর্ববৃহৎ, যাদের প্রায় ২০ হাজার সদস্যের বাহিনী রয়েছে।

যুদ্ধবিরতিতে অসম্মত সংগঠনগুলোর মধ্যে টিএনএলএ, এএ এবং এমএনডিএএকে বার্মার সশস্ত্র বাহিনীর খুবই অপছন্দ। তাদের যুদ্ধবিরতিতে আহ্বানও করা হয়নি। বার্মার সশস্ত্র বাহিনী বলছে, যুদ্ধবিরতিতে আসতে হলে শেষোক্ত এই তিন সংগঠনকে অস্ত্র সমর্পণ করে আসতে হবে। এই তিনটি সংগঠনের সঙ্গে কাচিন লিবারেশন আর্মির বিশেষ সুসম্পর্ক রয়েছে।

এই দুই ধারার বাইরেও ছোট ছোট কিছু সশস্ত্র সংগঠন রয়েছে বার্মায়, যাদের সশস্ত্র সক্রিয়তা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। তার মধ্য থেকেই ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে নতুন করে দুটি সংগঠন রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। এরা হলো নিউ মন পার্টি এবং লাহু ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন। নিউ মন পার্টি মূলত সক্রিয় থাইল্যান্ড সীমান্তসংলগ্ন এলাকায়। এদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলে বার্মার সঙ্গে থাইল্যান্ডের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সহজ হবে। এই দুই সংগঠনের চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে মোট নয়টি সংগঠন এখন চুক্তিবদ্ধ হয়ে আছে।

এদিকে ২০১৫ সাল থেকে আংশিকভাবে যুদ্ধবিরতি শুরু হলেও এবং নির্বাচনের মাধ্যমে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলেও নতুন পরিস্থিতিতে তাকে ব্যবহার করে জাতিগত সমস্যার সমাধান পেতে কোনো কার্যকর ও ফলপ্রসূ আলোচনা এখনো দৃশ্যগোচর হয়নি বার্মায়। তবে ২১ শতকের পেংলং নামে শান্তি আলোচনার কয়েকটি বৈঠক ইতিমধ্যে হয়েছে।

এসব বৈঠকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, বার্মায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চারটি পক্ষ রয়েছে : সশস্ত্র বাহিনী, বেসামরিক সরকার, যুদ্ধবিরতিতে সম্মত সশস্ত্র গ্রুপ এবং যুদ্ধবিরতিতে অসম্মত গ্রুপসমূহ। উপরিউক্ত চার পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর মনোভাবই শান্তি প্রতিষ্ঠায় মুখ্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। অর্থাৎ তাদের মনোভাবের ওপরই শান্তি আলোচনার সফলতা নির্ভর করছে। ২০১৫ সালে বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় এসে নতুন করে শান্তি আলোচনা শুরু করলেও প্রথম বৈঠকে কথা বলতে না দেওয়ায় ওয়া আর্মির প্রতিনিধিরা সম্মেলন থেকে দ্বিতীয় দিন ওয়াকআউট করে। আর দ্বিতীয় সম্মেলন ব্যর্থ হয়, ইউনিয়ন থেকে জাতিগত

স্টেইটগুলোর বিচ্ছিন্ন হওয়ার থাকবে কি না—এ-সংক্রান্ত বিতর্কে।

১১. মিয়ানমারের প্রাকৃতিক সম্পদ : জাতিগত অনুন্নয়ন, দুর্নীতি ও সংঘাতের এক দুষ্টচক্র

সাতটি নৃতাত্ত্বিক স্টেইট ও সাতটি রিজনের সমন্বয়ে গঠিত মিয়ানমার। আনুষ্ঠানিকভাবে একে বলা হয় 'ইউনিয়ন অব মিয়ানমার।'

সাতটি প্রদেশ হলো চিন স্টেইট, কাচিন স্টেইট, কারেন স্টেইট, রাখাইন স্টেইট, কারেননি স্টেইট, মন এবং শ্যান স্টেইট। স্থানীয় প্রধান নৃগোষ্ঠীর নামে এই স্টেইটগুলোর নামকরণ হয়েছে। এর বাইরের সাতটি প্রশাসনিক এলাকা হলো 'রিজন'।

দেশটির প্রধান নৃগোষ্ঠী হলো বামার (Bamar বা Burman)—যারা পুরো জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ—তাদের বাস মূলত রিজনগুলোতে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতার সংকট ছাড়াও বামারদের সঙ্গে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর জাতিগত সংঘাতের মূলে রয়েছে দেশেটির প্রাকৃতিক সম্পদের হিস্যা ভাগাভাগির প্রশ্নও। একই কারণে এমন অনেক সশস্ত্র গ্রুপও রয়েছে, যারা রাজনৈতিক স্বার্থের চেয়েও প্রাকৃতিক সম্পদে হিস্যা বজায় রাখা এবং মাদক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ রাখতেই সশস্ত্র অবস্থা বজায় রেখেছে।

মিয়ানমারে মূল্যবান পাথর, গ্যাস, তেল, কাঠসহ বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। মূলত এ কারণেই ঐতিহাসিককাল ধরে এই অঞ্চলটি 'স্বর্ণভূমি' নামে অভিহিত হয়। বিগত দশকগুলো বিশ্বের দামি খনিজ রত্নের ৯০ শতাংশ বার্মা থেকে রপ্তানি হতো। গ্যাস রপ্তানিতে বার্মা বর্তমানে বিশ্বে ১১তম স্থানে অবস্থান করছে। গ্যাস মজুতের ক্ষেত্রে বিশ্বে দেশটির অবস্থান অষ্টম। প্রায় ১২ ট্রিলিয়ন গ্যাস মজুত রয়েছে বার্মায়। তেলের মজুত রয়েছে প্রায় ৩ দশমিক ২ বিলিয়ন ব্যারেল। বিশ্বের অন্যতম পুরোনো তেল রপ্তানিকারক দেশ বার্মা। ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশরা প্রথম দেশটি থেকে খনিজ তেল রপ্তানি শুরু করেছিল, যা আজও চলছে। অথচ বার্মা মানবসম্পদ উন্নয়নে অন্যতম পিছিয়ে পড়া দেশ। ১৪৫তম স্থানে অবস্থান তার। এ ক্ষেত্রে এশিয়ায় সবচেয়ে খারাপ ১০টি দেশের তালিকায় রয়েছে বার্মা। একই সঙ্গে দেশটি বিশ্বের অন্যতম প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। এই দুর্নীতির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন চীনের কাঠের চাহিদার বিরাট এক অংশ পূরণ হয় বার্মা থেকে চোরাই পথে যাওয়া বনজ সম্পদ থেকে।

লক্ষণীয় একটা দিক হলো, বার্মার খনিজ সম্পদের ভান্ডারগুলো অনেক ক্ষেত্রেই জাতিগত সংখ্যালঘুদের এলাকাগুলোতে। কিন্তু এই সম্পদ রপ্তানি ও সামগ্রিক রাজস্ব আয় বামার ও অন্যান্য জাতিসত্তার মাঝে কীভাবে বণ্টিত হবে, তা নিয়ে স্বাধীনতার পর থেকেই বিবাদ রয়েছে। বর্তমানে প্রধান নৃগোষ্ঠী জাতীয় সম্পদে অন্যদের চেয়ে

কয়েক গুণ বেশি হিস্যা ভোগ করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে যে আয় হয় তার তথ্যদিও সাধারণ মানুষ খুব কমই জানে। এমনকি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পরও এসব ক্ষেত্রে কোনো স্বচ্ছতা আসেনি। বার্মায় খনিজ আহরণ ও রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত বিদেশি কোম্পানিগুলোও বিনিয়োগ, মুনাফা এবং বার্মাকে প্রদত্ত অর্থ বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করে না। তবে ধারণা করা হয়, কেবল গ্যাস ও মূল্যবান খনিজ রত্ন রপ্তানি থেকেই দেশটি প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার আয় করে থাকে।

বার্মার 'গণতন্ত্রায়ণ'-এ পশ্চিমা দেশগুলোর আগ্রহের মূলে অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে চলেছে দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদকেন্দ্রিক ব্যবসায় ওই সব দেশের করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণের স্বার্থ। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের কারণে দেশটির সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে যে পরিবেশগত ক্ষতি হচ্ছে, সে বিষয়েও বার্মার কেন্দ্রীয় সরকারের মতোই আন্তর্জাতিক করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোও নির্বিকার, যেহেতু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে বার্মার প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে সর্বশেষ দশকগুলোতে সবচেয়ে লাভবান দুটি দেশ ছিল থাইল্যান্ড ও চীন এবং এই দুটি দেশই বার্মার সামরিক বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ মানবাধিকার লঙ্ঘনে সবচেয়ে বেশি শর্তহীন সমর্থন দিয়ে গেছে। ২০১৭ সালে এই লেখা লেখার সময় বার্মায় বামার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংঘাত চলছিল কাচিন ইনডিপেনডেন্ট আর্মির ও ককাং অঞ্চলের এমএনডিএএর। কাচিন স্টেইট হলো বার্মার খনিজ রত্নের প্রধান ভান্ডার আর শ্যান স্টেইটের ককাং অঞ্চল হলো বার্মাকেন্দ্রিক মাদক ব্যবসার মূল ভরকেন্দ্র।

বার্মার প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে সুবিধাপ্রাপ্তিতে স্থানীয় জনগণ কীভাবে পিছিয়ে আছে তার আরেকটি বড় উদাহরণ হলো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোও। বর্তমানে দেশজুড়ে এই রকম অনেক প্রকল্প নেওয়া হলেও (যা স্থানীয় চাহিদার প্রায় তিন গুণ বেশি!) উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রান্তিক এলাকাগুলোতে না গিয়ে মূলত রপ্তানি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পুরোনো সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ থাইল্যান্ড ও চীনের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে ভারত।

উপরিউক্ত বাস্তবতার কারণেই বর্তমানে বামার ছাড়া অন্যান্য জাতিসত্তা, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট প্রভিন্সগুলো বলছে, প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আয়ের ৭০ শতাংশ প্রভিন্স এবং ৩০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে ব্যয় হতে হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদসংক্রান্ত সব প্রকল্প স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে নিতে হবে।

১২. ৮৮৮৮ গণ-অভ্যুত্থান

বার্মায় গণতন্ত্রের দাবিতে ১৯৮৮ সালের জন-আন্দোলনকে ৮৮৮৮ গণ-অভ্যুত্থান নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, ওই বছরের অষ্টম মাস আগস্টের ৮ তারিখে এই আন্দোলনের উত্তাল কর্মসূচিগুলোর সূচনা ঘটেছে। ১৯৪৮ সালে বার্মা ঔপনিবেশিক

শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর এটাই ছিল দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপকতর জন-আন্দোলন।

১৯৬২ সাল থেকে চলে আসা সামরিক জান্তা নে উইনের দীর্ঘ শাসনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছিল বার্মার রেঙ্গুনের ছাত্রছাত্রী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুসমাজ। পরে দেশব্যাপী তা ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯৮৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জেনারেল শ মাঙ (Saw Maung)-এর নেতৃত্বে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্মমভাবে দমিত হয়। এই সামরিক অভ্যুত্থানের দুই-তিন দিনের মধ্যে '৮৮৮৮ গণ-অভ্যুত্থান' স্থিমিত হয়ে পড়ে। সরকারিভাবে ৮৮৮৮ গণ-অভ্যুত্থান দমনকালে প্রায় ১০০ ব্যক্তি নিহতের কথা বলা হলেও এই রকম প্রকৃত সংখ্যা কয়েক হাজার বলে ছাত্রনেতারা দাবি করেছিলেন। এই আন্দোলনকালেই অং সান সু চির আবির্ভাব ঘটে দেশটির রাজনীতিতে। শুরুতে আন্দোলন অহিংস থাকলেও ক্রমে তা সহিংস রূপ নিতে থাকে। বিশেষত ১০ আগস্টের পর থেকে। ২৬ আগস্ট অং সান সু চি এই আন্দোলনে যুক্ত হন। তবে বরাবরই ছাত্র ও ভিক্ষুদের অনেক গোপন সংগঠন দেশজুড়ে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। এই আন্দোলনের মুখ্য ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন মিন কো নাইং, কো কো জি প্রমুখ। ৮৮৮৮ আন্দোলনের প্রধান ভরকেন্দ্র ছিল বামার জনগোষ্ঠীর তরুণসমাজ।

সে সময় বিক্ষোভকারীদের মূল দাবি ছিল নে উইনের পদত্যাগ এবং দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করা। ১৯৮৮ সালের ২৩ জুলাই নে উইন পদত্যাগ করেন বটে। কিন্তু তারপরও পর্দার অন্তরাল থেকে তিনিই ক্ষমতার ভরকেন্দ্র থেকে যান এবং সেনাশাসন অব্যাহত থাকায় বিক্ষোভও চলছিল। নতুন সামরিক জান্তার আবির্ভাবের পর আন্দোলনের সংগঠকেরা অনেকেই দেশান্তরি হন, বাকিরা নিহত বা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ষোভের ভয়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত বন্ধ করে রাখা হয়। সামরিক শাসকেরা তখন স্টেইট ল অ্যান্ড অর্ডার রেস্টোরেশন কমিটি গঠন করে। যে কমিটি পরে ইউএসডিপি নামক রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয়, কিন্তু শাসন কর্তৃত্ব জনগণের কাছে অধরাই থাকে। তবে ১৯৮৮ সালের অন্যতম ফল হিসেবে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে সু চিকে সাধারণ সম্পাদক করে এনএলডি দলটির জন্ম হয়।

গণতন্ত্রহীনতা ছাড়াও ৮৮৮৮ গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি তৈরি করেছিল দেশটির তখনকার ভঙ্গুর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। চার দশকের অধিক সময় ধরে চলতে থাকা সামরিক শাসকদের গোষ্ঠীতন্ত্রনির্ভর 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' বার্মার বাণিজ্যিক কাঠামোকে বাকি বিশ্ব থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। এর মাঝে ১৯৮৭ সালে সরকার হঠাৎ কিছু মুদ্রা নোট নিষিদ্ধ করলে প্রান্তিক এলাকার মানুষের ঘরের সঞ্চয় নষ্ট হয়ে যায়। এ রকম পটভূমিতে একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের পাশাপাশি

বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ৮৮৮৮ গণ-অভ্যুত্থানের জন্ম দিলেও বিরোধী রাজনীতিকেরা সংগঠিত না থাকায় এবং আন্দোলনের অভিমুখ নিয়ে তাঁদের চূড়ান্ত কোনো পরিকল্পনা না থাকার কারণেই মূলত তা ব্যর্থ হয়েছিল। তবে বর্তমানে প্রতিবছরই ৮ আগস্ট দিনটি বার্মায় অনানুষ্ঠানিকভাবে গণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়, যদিও ওই আন্দোলন দমনের নামে নির্বিচারে গুলি ও হত্যার নির্দেশের জন্য কোনো সামরিক কর্মকর্তারই বিচার হয়নি।

এদিকে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে কো কো জি-সহ ৮৮৮৮ অভ্যুত্থানের কয়েকজন সংগঠক 'ফোর এইট পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে কেন্দ্রীয় 'ইউনিয়ন নির্বাচন কমিশন'-এ আবেদন করেছেন তা রেজিস্ট্রি করার জন্য। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক মাস পরও নির্বাচন কমিশন তাদের নাম নথিভুক্ত করেনি। উল্লেখ্য, বার্মায় ৯০টি তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক দল রয়েছে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সেখানে নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দল হিসেবে নাম রেজিস্ট্রি বাধ্যতামূলক। ধারণা করা হয়, ক্ষমতাসীন এনএলডি 'ফোর এইট পার্টি'কে নথিভুক্ত না করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। কারণ, এই দলের প্রসার এনএলডির ভোটব্যাংককে বিভক্ত করবে।

১৩. বার্মার জাতিগত বৈচিত্র্য

বার্মাজুড়ে প্রথম জনশুমারি হয় ১৬৩৮ সালে। আর সর্বশেষ শুমারি হয়েছে ২০১৪ সালে। সর্বশেষ জনশুমারিতে বলা হয়েছে, বার্মায় প্রায় ৫ কোটি জনসংখ্যা রয়েছে। বিস্ময়করভাবে যা পূর্ববর্তী শুমারি থেকে কম! বিভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য কারণে এই হিসাবকে আন্তর্জাতিকভাবে সামান্যই গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। কারণ, রাখাইন, শ্যান, চিন, কাচিন এলাকাসহ আরও কয়েকটি প্রদেশের অনেক নাগরিক ও উদ্বাস্তুদের এই শুমারিতে গণনা থেকে পদ্ধতিগতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরা দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাত কোটি বলে মনে করে থাকেন।

প্রায় ১৩৪টি সরকার স্বীকৃত নৃগোষ্ঠী রয়েছে দেশটিতে। যার মধ্যে বামাররা হলো প্রধান জনগোষ্ঠী। এরপরে গুরুত্বপূর্ণ সাতটি নৃগোষ্ঠী হলো চিন, কাচিন, কায়িন, কায়াহ, মন, রাখাইন ও শ্যান। বার্মায় এই আটটিকে বলা হয় 'প্রধান জাতীয় নৃগোষ্ঠী'। তবে এই পরিচয় যতটা প্রভিন্সভিত্তিক ততটা জাতিগত নয়। অর্থাৎ বামার ব্যতীত অন্য নৃগোষ্ঠীগুলোকে মূলত প্রদেশ বা স্টেইটভিত্তিক পরিচয়ে তুলে ধরা হলেও কার্যত তা সঠিক নয়।

যেমন 'শ্যান'কে প্রধান আট জাতীয় নৃগোষ্ঠীর একটি মনে করা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে শ্যান স্টেইটে রয়েছে প্রায় তিন ডজন ছোট-বড় নৃগোষ্ঠী, যারা সেখানে চার-পাঁচটি ভাষায় কথা বলে। একইভাবে 'কাচিন' বলে যে জাতিসত্তার উল্লেখ করা হয়,

সেটা আসলে কাচিন স্টেইটে বসবাসকারী ১২টি নৃগোষ্ঠী। 'চিন' স্টেইটে রয়েছে একইভাবে অন্তত ৫৩টি জনগোষ্ঠী।

সংখ্যার হিসাবে প্রধান জাতিগোষ্ঠী বামাররা প্রায় ৬৮ শতাংশ বলে দাবি করা হয়েছে সর্বশেষ শুমারিতে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে শ্যান ও কারেনরা—যথাক্রমে ৯ ও ৭ শতাংশ করে। প্রধান জনগোষ্ঠী বামাররা বার্মিজ ভাষায় কথা বলে। এটা বার্মার দাপ্তরিক ভাষাও বটে। বামাররা থেরাবাদা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। দ্বিতীয় প্রধান জনগোষ্ঠী শ্যানরা মূলত থাকে শ্যান ও কাচিন স্টেইটে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তারাও। শ্যানদের ভাষা থাই ও লাও ভাষার সমগোত্রীয়। শ্যানদের সংখ্যা ৫০ লাখ বলে অনুমান করা হয়। বার্মা ইউনিয়নের প্রথম প্রেসিডেন্ট *Sao* Shwe Thaik ছিলেন একজন শ্যান। নে উইনের আমলে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কারাগারে।

শ্যানদের পরই সংখ্যার হিসাবে বার্মায় কারেনদের অবস্থান। কারেনদের বাস মূলত লোয়ার বার্মায়—বিশেষ করে কারেন ও কায়াহ স্টেইটে। কারেনও মূলত অনেক নৃগোষ্ঠীর একটা সম্মিলিত পরিচয়বোধক শব্দ। কারেনদের দাবি, তাদের সংখ্যা ৫০ লাখের কাছাকাছি। এদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মিল রয়েছে মূলত তিব্বত ও মধ্য এশীয় জনগোষ্ঠীর। থাইল্যান্ডেও কারেন জনগোষ্ঠী রয়েছে। কারেনদের মাঝে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান—উভয় ধর্মাবলম্বী রয়েছে। সর্বশেষ শুমারিতে দাবি করা হয়েছে যে ক্রিশ্চিয়ানিটি বার্মার দ্বিতীয় প্রধান ধর্ম। প্রায় ৬ শতাংশ নাগরিক এই ধর্মের অনুসারী। তবে রোহিঙ্গা মুসলমানদের শুমারিতে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ইসলামেরই দ্বিতীয় প্রধান ধর্ম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রোহিঙ্গা ছাড়াও চায়নিজদের একাংশের মধ্যে বৃহৎ সংখ্যায় ইসলাম ধর্মের অনুসারী রয়েছে। অন্যদিকে কারেন ছাড়াও চিন ও কাচিন জনগোষ্ঠীর মধ্যেও খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী রয়েছে।

বার্মা সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে যে ১৩৪টি জাতিগোষ্ঠীর কথা স্বীকার করে থাকে, তার বাইরে বার্মায় রয়েছে রোহিঙ্গা ছাড়াও 'বার্মিজ চায়নিজ', 'বার্মিজ ইন্ডিয়ান', গুর্খা ইত্যাদি অনেক জনগোষ্ঠী। বার্মিজ চায়নিজ ও ইন্ডিয়ানরা পুরো জনসংখ্যার ৪-৫ শতাংশ হবে বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে চায়নিজরা হবে ১৬-১৭ লাখ এবং ইন্ডিয়ানরা হবে প্রায় ১০ লাখ। এই উভয় জনগোষ্ঠীই মুখ্যত ব্যবসায়ী সমাজের অন্তর্ভুক্ত। বার্মিজ ইন্ডিয়ানরা থাকে মূলত রেঙ্গুন ও মান্দালেতে। এদের মধ্যে হিন্দুধর্মাবলম্বীই বেশি। চায়নিজদেরও প্রভাবশালী অংশ মান্দালেতে থাকে।

১৪. আসিন উইরাথু ও বার্মার রাজনৈতিক 'ভিক্ষু সংঘ'

আসিন উইরাথু (Ashin Wirathu) বহির্বিশ্বে বার্মার সবচেয়ে আলোচিত বৌদ্ধ ভিক্ষু। শুধু তাঁর ঘৃণাসূচক উত্তেজক বক্তব্যের কারণে দেশটিতে কয়েকবার মুসলমানবিরোধী দাঙ্গা লেগেছিল।

২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক *টাইম* ম্যাগাজিন তাঁকে নিয়ে কভারস্টোরি করে। কিন্তু তাঁর উত্তেজক কার্যক্রম থামানো গেছে কমই। তাঁর সর্বশেষ উত্তেজক আচরণ ছিল অং সান সু চির অন্যতম সহযোগী ও খ্যাতনামা মুসলমান আইনজীবী কো নি খুন হওয়ায় ফেসবুকে সমর্থনসূচক বক্তব্য প্রদান।

এরই ফল হিসেবে ২০১৭ সালের ১০ মার্চ থেকে এক বছরের জন্য (১০ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত) আসিন উইরাথুর ওপর প্রকাশ্যে বক্তব্য প্রদানে দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল।

এই সিদ্ধান্ত নেয় বার্মার ভিক্ষুদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থা 'সংঘ মহানায়ক কমিটি (মা হা না)।' দেশটির ৪৭ জন সবচেয়ে সিনিয়র ভিক্ষু এই কমিটির সদস্য এবং এই কমিটি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা। ফলে এই সিদ্ধান্তে যে দেশটির এ সময়কার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতা সু চির সমর্থন রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য এবং উরিয়াথুর ওপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাকে দেখা হচ্ছে ধর্মীয় চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে অং সান সু চির প্রথম বড় ধরনের এক সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে। ২০১৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রেঙ্গুনে অসিন ইসারিয়া নামের একজন প্রভাবশালী বৌদ্ধ ভিক্ষুও আসিন উইরাথুর ওপর আরও আইনগত নিয়ন্ত্রণ আরোপের দাবি জানিয়েছেন।

তবে আসিন উইরাথুকে বার্মাজুড়ে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘগুলোর উদীয়মান রাজনৈতিক প্রভাবের প্রতীক বিবেচনা করা যায়। এই রকম ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদীরা দেশটিতে মুসলিমসহ সংখ্যালঘু ধর্মীয় জাতিসত্তাগুলোর নিপীড়নের ক্ষেত্রে বার্মার সেনাবাহিনীর সহিংসতার অন্যতম সামাজিক সমর্থক ভিত্তি হয়ে আছে। এর বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা ঘটে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে। নেতৃস্থানীয় ভিক্ষুদের সম্মেলনের মাধ্যমে মা বা থা (Ma Ba Tha, বার্মার দেশপ্রেমিক সংঘ) গঠন করে একে প্রাতিষ্ঠানিক করা হয়। আসিন উইরাথুও এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে রয়েছেন। মা বা থা নেতাদের চাপেই ২০১৫ সালে বার্মার ধর্ম মন্ত্রণালয় দেশটিতে আন্তধর্মীয় বিয়ে বিষয়ে নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ নেয় এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়েও আইন প্রণয়ন করে। মূলত দেশটির ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের লক্ষ্য করে এসব আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বার্মার রাজনীতিতে বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রভাব সম্প্রতি সবচেয়ে প্রবলভাবে দৃশ্যগোচর হয়, যখন দেশটির জাতীয় নির্বাচনে এনএলডিসহ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল মুসলমানদের নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে মনোনয়ন দান থেকে বিরত থাকে। এর ফলে জনসংখ্যার ৫ থেকে ১০ শতাংশ হিস্যাধারী হয়েও ২০১৫ সালের নির্বাচনে দেশটির কোনো মুসলমান জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেনি।

১৫. বার্মা-ইসরায়েল সম্পর্ক

বার্মা ও ইসরায়েলের মধ্যে বেশ কিছু মিল আছে। উভয়েরই স্বাধীন অভিষেক ব্রিটেনের কাছ থেকে, ১৯৪৮ সালে। উভয় দেশের যাত্রার মাঝেই লুকিয়ে আছে স্থানীয় অপর জাতি বা জাতিগুলোর বিস্তর দীর্ঘশ্বাসের কারণ। ইসরায়েল যেমন ১৯৪৮ সাল থেকেই ফিলিস্তিনিদের মোকাবিলা করে যাচ্ছে, তেমনি বার্মা কারেন, কাচিনসহ বহু জাতিসত্তাকে মোকাবিলা করছে স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকে। উপরন্তু এ লেখা তৈরির সময় দুই দেশের মধ্যে আরেকটি মিলের দিক হলো, উভয় দেশে এ পর্যন্ত পরস্পরের ২২ জন করে রাষ্ট্রদূত কাজ করেছেন। শেষোক্ত তথ্যটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের অনেক নাগরিকের কাছেই বিস্ময়কর ঠেকে। কিন্তু এটাই সত্য যে বার্মা হলো এশিয়ার প্রথম দেশগুলোর একটি, যারা ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় (১৯৪৯ সালের ৭ ডিসেম্বর)। আর উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯৫৩ সালে।

বর্তমানে ইসরায়েলে বার্মার দূতাবাস রয়েছে তেলআবিবে। আর বার্মায় ইসরায়েলের দূতাবাস রয়েছে ইয়াঙ্গুনে। তবে বার্মা সরকার যেমন চাইছে ইসরায়েল তার দূতাবাস নতুন রাজধানী নেপিটাতে স্থানান্তর করুক, তেমনি ইসরায়েলও চাইছে বার্মা তার দূতাবাস জেরুজালেমে নিয়ে আসুক।

বার্মার গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী উ ন প্রথম ইসরায়েল সফরে যান ১৯৫৫ সালে। বিশ্বজুড়ে চরম একঘরে অবস্থার মাঝে এটাই ছিল ইসরায়েলে কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের প্রথম সফর। এ-ও বিস্ময়কর যে উ ন ছিলেন জওহরলাল নেহরু, সুকর্ণ প্রমুখ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান প্রধান নেতার বন্ধু, যাঁরা ইতিহাসের সেই সময় মূলত ফিলিস্তিনের পক্ষে ছিলেন।

কিন্তু উ ন-র সফরকে ইসরায়েল পূর্ণ সক্রিয়তায় এগিয়ে নিয়ে গেছে ক্রমাগত। নিজ দেশের কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মাঝে উ ন-র বার্মা যে উদারতা দেখিয়েছিল, ইসরায়েলিরা কখনোই সেটার প্রতিদান দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। ১৯৫৯ সালে ইসরায়েলের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট ইজাক বেন-জাভি এবং ১৯৬১ সালে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ন বার্মায় আসেন। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর শেষোক্ত সফরটি সে সময় বিশ্বজুড়ে বিশেষ নজর কেড়েছিল। কারণ, প্রায় ১৫ দিন তিনি সে সময় বার্মায় অবস্থান করেন। এত দীর্ঘ সময় কোনো দেশের রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের অপর একটি দেশ সফরের ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে বেশ বিরল। পরবর্তীকালে গোল্ডা মায়ার থেকে মোশে দায়ান, শিমন পেরেজ পর্যন্ত ইসরায়েলের খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতাদের সবাই তাঁদের কার্যকালে বার্মায় এসেছেন। যদিও দেশটিতে ইহুদিদের সংখ্যা অসমর্থিত হিসেবে এক শয়ের বেশি নয় এবং সেনেগগ আছে মাত্র একটি।

বার্মায় ব্যবসার সূত্রে ভারত থেকে ইহুদিদের উল্লেখযোগ্য হারে আগমন ঘটেছে ব্রিটিশ শাসনামলে। এদের বলা হয় বাগদাদি ইহুদি। মূলত রেঙ্গুনকে ঘিরে ছিল এই ইহুদিদের বসতি। ডেভিড সোফায়ের নামে ১৯৩০-এর দশকে রেঙ্গুনের একজন মেয়রও ছিলেন ইহুদি। তবে জাপানি আগ্রাসনের মুখে ইহুদিদের অনেককে পালাতে হয় এবং পরবর্তীকালে নে উইনের 'সমাজতন্ত্র'কালে এই সম্প্রদায়ের ব্যবসায়-বাণিজ্য অনেকখানি বাজেয়াপ্ত হয়। অথচ ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট (এবং প্রধানমন্ত্রীও) শিমন পেরেজ তাঁর বার্মা সফরের স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন (*ব্যাটেলিং ফর পিস : আ মেমোয়ারস*) নে উইনই তাঁকে বলেছিলেন, 'বার্মার বাইরে ইসরায়েল হলো একমাত্র দেশ, যাকে বিশ্বাস করা যায়।'

তবে ইহুদিদের সংখ্যাল্পতা দিয়ে বার্মা-ইসরায়েল সম্পর্কের শক্তি বোঝা মুশকিল হবে। বরং উভয়ে উভয়কে প্রয়োজনীয় মনে করেছে জাতিগত অসন্তোষ মোকাবিলায় পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য। বিশেষ করে ইসরায়েল আরবদের অধিকৃতদের গ্রামগুলোতে বসতির পাশাপাশি যেভাবে প্রতিরক্ষা কাঠামো গড়ে তুলেছে, সেটাই বার্মা অনুসরণ করতে শুরু করে শ্যান ও কাচিন প্রদেশে। *বার্মা'স সিক্রেট মিলিটারি পার্টনারস* (২০০০) শীর্ষক গ্রন্থে গবেষক অ্যান্ড্রিউ সেলথের দাবি, ১৯৫৪ সালে ইসরায়েল বহির্বিশ্বে প্রথম অস্ত্র বিক্রি করে (৩০টি সুপারমেরিন স্পিটফায়ার ফাইটারস) বার্মাতেই।

এই রকম নানা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রেক্ষাপটেই ৬০ বছর ধরে বার্মার নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে ইসরায়েলের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তারই সর্বশেষ প্রমাণ হলো ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর বর্তমান প্রধান মিন অং লাইও ইসরায়েল সফর করেছেন। ১৯৫৯ সালের পর এটা হলো বার্মার সশস্ত্র বাহিনীর কোনো প্রধানের ইসরায়েল সফর। মূলত বড় ধরনের সামরিক কেনাকাটার বিষয় নীতিগতভাবে চূড়ান্ত করতেই তাঁর এই সফর ছিল বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল ইসরায়েলি দৈনিক *হারেৎজ*। বর্তমানে ইসরায়েলকে বিবেচনা করা হয় বার্মার অন্যতম প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে। *হারেৎজ*-এর সূত্রেই জানা যায় (৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭), মিন অং লাই ইসরায়েল সফরকালে দেশটি অস্ত্র খাতের দুই বড় ঠিকাদার এলবিট সিস্টেমস এবং এল্টা সিস্টেমস-এর সঙ্গেও বৈঠক করে। উল্লেখ্য, আলোচ্য দুটি কোম্পানির মধ্যে প্রথমোক্তটি ১৯৯৭ সাল থেকেই বার্মায় বড় আকারে অস্ত্র ব্যবসায় যুক্ত (*ইরাবতি*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫) এবং বার্মাকে সামরিক ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রযুক্তি মূলত তারাই সরবরাহ করছে। ২০১৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আল-জাজিরার এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখা যায়, বার্মার আর্মড ভেহিকলের ক্ষেত্রে ইসরায়েল দ্বিতীয় সরবরাহকারী এবং আর্টিলারি যুদ্ধাস্ত্রের বিক্রেতা হিসেবে তারা সেখানে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

উল্লেখ্য, মিন অং লাই ছাড়াও অতীত ও বর্তমানের বার্মার নেতৃত্ব যখনই ইসরায়েল সফরে যান, তখনই সেখানে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধিতেও ফুল দিয়ে আসেন।

এদিকে মিন অং লাইয়ের এই সফর শেষেই ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বিভাগের প্রধান মিশেল বেন-বারুচ বার্মায় যান। যদিও অতীতে ইসরায়েল-বার্মা কেউই স্বীকার করত না যে তাদের মাঝে সামরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু বেন-বারুচের সফরের সময়ই বার্মা সরকারের তরফ থেকেই জানানো হয় যে তারা ইসরায়েল থেকে ডোবরা প্যাট্রোল বোটসহ আরও কিছু সামরিক সরঞ্জামের ক্রয়াদেশ দিচ্ছে। বেন-বারুচের সফরের পর ২০১৬ সালের আগস্টে ইসরায়েলের টার আইডিয়াল কনসেপ্ট (TAR Ideal Concepts) সরাসরি তাদের ওয়েবসাইটেই ছবিসহ জানায় যে তারা বার্মার সৈনিকদের কীভাবে সামরিক সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ সহায়তা দিচ্ছে। তবে এসবই হলো বার্মাকে ইসরায়েলের তরফ থেকে দেওয়া সামরিক সহায়তার পুরোনো ধারাবাহিকতা। এ সম্পর্কে বৈশ্বিক পরিসরে প্রথম বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরেছিল ২০০০ সালের ১ মার্চ, ব্রিটেনের জেনস ইন্টিলিজেন্স রিভিউ। এই তদন্ত প্রতিবেদন বিস্তারিত জানায় যে উন্নত বিশ্বের তরফ থেকে অবরোধের মধ্যেও ইসরায়েল কীভাবে বার্মাকে যুদ্ধবিমান থেকে সাধারণ অস্ত্র পর্যন্ত ব্যাপকভিত্তিক সামরিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের সহায়তা দিচ্ছে। একদিকে গণতন্ত্রের আন্দোলন দমন, অন্যদিকে জাতিগত স্বাধিকারযুদ্ধে বিজয়ের জন্য। এই প্রতিবেদন থেকেই প্রথম বিস্তারিত জানা যায় যে বার্মাকে ইসরায়েল গোয়েন্দা তথ্য সহায়তাও দিয়ে থাকে এবং একই প্রতিবেদনে ইসরায়েল কর্তৃক বার্মাকে রাসায়নিক অস্ত্রপ্রযুক্তি প্রদানেরও ইঙ্গিত করছে।

বলা বাহুল্য যে ইসরায়েল ও বার্মা কেউই তাদের সম্পর্কেও এসব দিক নিয়ে ন্যূনতম কোনো আলাপচারিতাও পছন্দ করে না। বরং দুই দেশের নীতিনির্ধারকেরাই বলে থাকেন যে শিক্ষা, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়েই তাঁদের সব সহযোগিতার ভিত্তি এবং তা হবে মাশহাবের মাধ্যমে। ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা 'মাশহাব' (Agency for International Cooperation)—বিশ্বের খুব কম স্থানেই সরাসরি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে—তার মধ্যে বার্মাও রয়েছে। বলা হয়, বার্মায় তাদের ব্যাপকভিত্তিক কর্মকাণ্ড রয়েছে—বিশেষত 'প্রশিক্ষণ' ও 'সামর্থ্য উন্নয়ন'ধর্মী কাজে। 'প্রশিক্ষক' হিসেবে ইসরায়েলের শত শত বিশেষজ্ঞ বার্মায় কাজ করেছেন এবং করছেন বিভিন্ন সময়। পাশাপাশি বার্মার হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রতিবছর ইসরায়েলে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে যায়।

১৬. চীন-বার্মা সম্পর্ক

চীন অঞ্চলের সঙ্গে বার্মা অঞ্চলের সম্পর্ক ঐতিহাসিক নানা উত্থান-পতনময়। কুইং ডাইনেস্টির সময় সম্পর্ক যুদ্ধময় ছিল। বার্মায় ব্রিটিশ শাসনামলের পর থেকে এ ক্ষেত্রে একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থা তৈরি হয়। বার্মায় বিভিন্ন জাতিসত্তার বিপুল চীনা রয়েছে। এদের মধ্যে একদল হলো 'পান সে' নামেও পরিচিত মুসলমান। এরা রয়েছে শ্যান স্টেইটে।

বার্মা হলো প্রথম অ-কমিউনিস্ট দেশ, যে ১৯৪৯ সালে মাওয়ের কমিউনিস্ট বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে চীনকে সমর্থন দিয়েছিল। এই বছরের ১ অক্টোবর মাও নতুন চীনের অভ্যুদয়ের ঘোষণা দেওয়ার ৪৭ দিন পরই বার্মা তাঁকে স্বীকৃতি দেয়। দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯৫০ সালের জুনে। এর আগেই ১৯৫০ সালে উভয় দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি জটিল অবস্থা তৈরি হয়েছিল, যখন মাওয়ের প্রতিপক্ষ কুমিংটাং শক্তির প্রায় দুই হাজার গেরিলা শ্যান স্টেইটে এসে আশ্রয় নেয়। আবার একই সময় বার্মার কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা চীনে আশ্রয় নিয়ে থাকায় বার্মার জন্য দ্বিমুখী সংকট তৈরি হয়েছিল। একদিকে চীনের জাতীয়তাবাদীদের মোকাবিলা করা ও চীনের সঙ্গে পারস্পরিক অবিশ্বাস রোধ এবং নিজ দেশের কমিউনিস্টদের মদদ দানে চীনকে বিরত রাখা।

১৯৫৩ সালে উ ন দুবার চীন সফর করেন এবং চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চৌ এন লাই রেঙ্গুনে আসেন। ১৯৬০ সালে উ ন প্রায় ৪০০ সদস্যের এক প্রতিনিধিদলসহ আবার চীনে যান। এসবেরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের জুনে চীন ও বার্মা একটা সীমান্ত চুক্তিতে উপনীত হয়। পরের বছরই এই অর্থনীতি বিষয়ে অনুরূপ আরেকটি চুক্তি হয়; আর চীনের প্রায় ২০ হাজার ও বার্মার প্রায় ৫ হাজার সৈনিক মিলে শ্যান স্টেইটে চীনের জাতীয়তাবাদীদের ওপর হামলা চালায়। এটাই ইতিহাসে মেকং রিভার অপারেশন নামে পরিচিত।

তবে ১৯৬৭ সালে বার্মায় শুরু হওয়া চীনবিরোধী দাঙ্গা দুই দেশের সম্পর্ককে বেশ নাজুক করে ফেলেছিল। দেং জিয়াও পিংয়ের আমল থেকে এই সম্পর্ক আবার ভালো হতে শুরু করে। চীন এ সময় বার্মার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তার ঐতিহাসিক সমর্থন প্রত্যাহার করতে শুরু করে এবং এখন বার্মার প্রধান মিত্র হিসেবে চীনের কথাই জানে পুরো বিশ্ব। ১৯৮৮ সালের আগস্টে চীন-বার্মা বড় ধরনের বাণিজ্যিক ও সামরিক সম্পর্কের জন্ম দেয় এক চুক্তির মাধ্যমে। উল্লেখ্য, ওই বছরই বার্মায় গণতন্ত্রের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠলে সামরিক বাহিনী নির্মমভাবে তা দমন করে। এ সময় সামরিক জান্তার অধীনে বার্মা সমগ্র বিশ্বে একঘরে হয়ে পড়লেও চীনই মুখ্যত দেশটির শাসকদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে গেছে। ২০১৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আল-জাজিরা তাদের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দেখিয়েছে,

বার্মার বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, আর্টিলারি, আর্মড ভেহিকল এবং মিসাইল সিস্টেমের ক্ষেত্রে কেবল শেষোক্তটি ছাড়া অন্য চারটিতেই প্রায় একচেটিয়াভাবে প্রধান সরবরাহকারী হলো চীন। বার্মার ২৬৪টি এয়ারক্রাফটের মধ্যে ১২০টি ছিল চীনের সরবরাহ। ট্যাংকসহ ৮৮৬টি আর্মড ভেহিকলের প্রায় ৭০০টিই চীন থেকে নেওয়া। ২৭টি নৌ-যুদ্ধযানের চীন থেকে পাওয়া ২১টি। প্রায় একই রকম অবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রেও। এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী ছাড়াও বেইজিং অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন এনএলডির সঙ্গেও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে বিশেষ মনোযোগী।

বর্তমানে যদিও বার্মার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত কিছু গোষ্ঠীর (যেমন শ্যান স্টেইটের উত্তরাঞ্চলে কোকাং জনগোষ্ঠী) প্রতি চীনের পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে তারপরও বার্মা সেনাবাহিনীর সঙ্গে চীনের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কও বহাল আছে বলেই দেখা যায়। ২০০৯ সালে বার্মার সেনাবাহিনী যখন কোকাংদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে, তখন চীনের অভ্যন্তরে এ রকম মনোভাব তৈরি হয়েছিল যে চীন সরকারের উচিত কোকাংদের পক্ষে বার্মায় সামরিক হস্তক্ষেপ করা। শ্যান স্টেইটের চীন সীমান্তবর্তী লাউক্কাই অঞ্চলকে কোকাংদের রাজধানী হিসেবে গণ্য করা হয়। কোকাং প্রভাবিত একটি গেরিলা গ্রুপ হলো মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এমএনডিএএ)।

তবে চীন-বার্মা সম্পর্ক কোকাং অধ্যায়ে আটকে নেই বরং এতে উভয় দেশের বৃহত্তর ভূরাজনীতির ছাপই বেশি। চীন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বার্মাকে প্রায় শর্তহীন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া চীন বার্মার সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক বিনিয়োগকারী। দেশটির প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারিও চীনের সঙ্গে। আরাকানে বার্মার গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে চীন ছিল মুখ্য বিনিয়োগকারী। এই বন্দরে চীনের ৭০ শতাংশ মালিকানা অনুমোদন করেছে বার্মা। এ ছাড়া আরাকান থেকে চীনের ইউনান পর্যন্ত ২ হাজার ৩৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করছে চীন। বার্মায় এ রকম বহু প্রকল্পে চীন সংযুক্ত এখন। স্থলবেষ্টিত চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ইউনান থেকে বঙ্গোপসাগরমুখী সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায়ও বার্মা ব্যাপক চেষ্টারত। এ ছাড়া ভারত মহাসাগরে সরাসরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে চীনের জন্য পাকিস্তানের পরই বার্মার গুরুত্ব। ২০১৭ সাল থেকে আরাকান অঞ্চলে রাখাইন নিধনের মাধ্যমে বার্মা আন্তর্জাতিক পরিসরে নতুন করে কোণঠাসা হওয়ার পটভূমিতে চীন দেশটিকে জাতিসংঘে সমর্থন দেওয়ার বিনিময়ে অধিক হারে সেখানকার অর্থনীতিতে সংযুক্ত হচ্ছে।

তবে দুই দেশের ২ হাজার ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত এলাকার উভয় প্রান্ত জুড়ে থাকা মাদক ব্যবসা চীনের জন্য এক বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে সম্প্রতি। এই সীমান্তেই রয়েছে এশিয়ার বিখ্যাত মাদক উৎপাদক অঞ্চল 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল'।

১৭. আরাকান আর্মি

আরাকান আর্মি (এএ) মূলত আরাকানভিত্তিক একটি সশস্ত্র সংগঠন। ২০০৯ থেকে এদের কার্যক্রম নজরে পড়ছে। ২০১৮ সালে এই লেখা তৈরির সময় বার্মার সেনাবাহিনীর সঙ্গে দেশটির যে দুই-তিনটি সশস্ত্র সংগঠনের যুদ্ধাবস্থা চলছিল, তার মধ্যে আরাকান আর্মিও রয়েছে।

মূলত আরাকান অঞ্চলে বৌদ্ধ রাখাইনদের ঐতিহাসিক অধিকারের জন্য লড়ছে এই সংগঠন। বর্তমানে এই সশস্ত্র দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে থন ম্রাট নইং (Twan Mrat Naing)। এই সংগঠনের রাজনৈতিক শাখা হলো ইউনাইটেড আরাকান লিগ (ইউএলএ)। একই ব্যক্তি উভয় সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন। নাইও থং অং হলেন এই দলের সাধারণ সম্পাদক। ইউএলএ এবং এএ মনে করে, বার্মা আরাকানকে দখল করে রেখেছে এবং তারা হলো ঔপনিবেশিক শক্তি।

রাজনৈতিকভাবে আরাকানভিত্তিক হলেও 'এএ'-এর ক্যাডারদের অবস্থান মুখ্যত কাচিন এলাকায়। সেখানে লাইজা অঞ্চলে এদের সদর দপ্তর। অনেক দিন থেকে ব্যাপক সংখ্যায় প্রশিক্ষণ নিয়েও তারা আরাকানে ঢুকতে পারছে না। তবে রোহিঙ্গাদের বিপুল সংখ্যায় বাংলাদেশে আগমনের পর থেকে এএ-ও তাদের সামরিক অবস্থানে কিছু পরিবর্তন এনেছে বলে জানা যায়। প্রায় চার হাজার যোদ্ধা রয়েছে আরাকান আর্মির। ২০১৫ সালের আগস্টে বাংলাদেশের বান্দরবান সীমান্তে এএ গেরিলাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীদেরও এক বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটেছে বলে এএ দাবি করেছিল। এএ-এর পরিবহনকাজে ব্যবহৃত কয়েকটি ঘোড়া নিয়ে নেওয়া ছিল এই সংঘর্ষের তাৎক্ষণিক কারণ। তবে পরবর্তীকালে এ রকম আর কোনো সংঘাতের খবর প্রকাশিত হয়নি। বর্তমানে চীন, কাচিন ও আরাকানে মাঝেমধ্যেই বার্মার সেনাবাহিনীর সঙ্গে এএ ক্যাডারদের সংঘর্ষ ঘটছে। এ রকম একটি সংঘর্ষস্থল হলো চিন স্টেইটের পালিতওয়া। বান্দরবান সন্নিহিত কালাদন নদের পাড়ের এই স্থানটি বাংলাদেশ-ভারত-বার্মা সংযোগস্থল হিসেবে পরিচিত। এই এলাকায় মূলত খুমি-চিনদের বসবাস। অতীতে আরাকান অঞ্চলে বিভিন্ন সময় এএ-এর সঙ্গে সংঘর্ষকালে বার্মার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা মুসলমানদের তাদের পরিবহনধর্মী কাজে ব্যবহার করত। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে আরাকানের স্বাধীনতা অবসানের ২৩৩তম বার্ষিকীতে দক্ষিণ আরাকানের মারাউক-উ এলাকায় এক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বার্মার পুলিশের হামলার মধ্য দিয়ে পুরো অঞ্চলে এএ-কর্মীদের সঙ্গে সরকারি বাহিনীর সংঘাতপূর্ণ অবস্থা তৈরি হয়েছে। এরপরই ফেব্রুয়ারিতে আকিয়াব এলাকায় প্রায়ই বোমা বিস্ফোরণ হতে দেখা যায়।

উল্লেখ্য, এএ হলো বার্মার আরাকান অঞ্চলের অপর গেরিলা গ্রুপ 'আরাকান লিবারেশন আর্মি' বা এএলএর চেয়ে পৃথক একটি সংগঠন। এএলএ হলো আরাকানের

সবচেয়ে প্রাচীন গেরিলাদল, যারা গড়ে উঠেছিল মূলত কারেনদের সহায়তায়। অতীতে এরা বার্মা সেনাবাহিনীর সঙ্গে অনেক সংঘাতে অবতীর্ণ হলেও বর্তমানে এই সংগঠন যুদ্ধবিরতিতে রয়েছে (২০১৫ সাল থেকে) এবং তাদের সাংগঠনিক অবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল। বার্মার সেনাবাহিনীর রোহিঙ্গা নিধনাভিযানে এএলএর ভূমিকাও সহায়কের। যদিও একদা (গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে) এএলএ এবং রোহিঙ্গা সলিডারিটি সংস্থা (আরএসও) একই সঙ্গে আরাকানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করেছে।

অন্যদিকে এএ এবং এএলএর সম্পর্ক এখন শত্রুভাবাপন্ন। এএ ক্যাডাররা প্রায়ই আরাকান-চিন সীমান্তে এএলএর বিভিন্ন চৌকিতে হামলা চালিয়ে তাদের উপস্থিতি দুর্বল করে দিচ্ছে।

সূত্র

১. https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/6429/2017/en/

২. http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2014/11/2014.11.05-IHRC-Legal-Memorandum.pdf

সহায়ক সূত্র :

— *Maung Aung Myoe*, *Building the Tatmadaw: Myanmar Armed Forces Since 1948*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2009.

— Amitav Ghosh, *The Glass Palace*, HarperCollins, 2000.

— Benedict Rogers, *Burma: A Nation at The Crossroads*, Rider, 2012.

— Thant Myint-U, *The River of Lost Footsteps*, Faber & Faber, 2006.

— Niklas Swanström, *Sino–Myanmar Relations: Security and Beyond*, Institute for Security and Development Policy, Sweden, 2012.

— *Gaurav Kumar Jha* and *Amrita Banerjee*, *India–Myanmar Relations: Coming off the Circle*, Sage, 2014.

— *Michael Fredholm*, *Burma: Ethnicity and Insurgency*, Praeger, USA, 1993

— Martin Smith, *Burma: Insurgency and the politics of ethnic conflict*, Zed Books, 1999.

— Transnational Institute, *Beyond Panglong: Myanmar's National Peace and Reform Dilemma*, Myanmar Policy Briefing, 21 September, 2017, The Netherlands.

সাক্ষাৎকার

বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ : দীপেশ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার

ইফতেখার মাহমুদ

[দীপেশ চক্রবর্তী, যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও নিম্নবর্গের ইতিহাসের অন্যতম পুরোধা। বাংলার জন-ইতিহাস, আত্মপরিচয়, ধর্ম ও রাজনীতি তাঁর আগ্রহ ও লেখার বিষয়। সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়েও লেখালেখি শুরু করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করে তিনি কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বিখ্যাত *প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ* গ্রন্থে তিনি ইতিহাস এবং উপনিবেশোত্তর তত্ত্বের মধ্যে বিভাজন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এই বই বাংলার শ্রমিকশ্রেণির ইতিহাস বিষয়ে তাঁর পূর্বের করা *রিথিংকিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি* গ্রন্থের পরিমার্জনা ও ধারাবাহিকতা দুটোই। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন *প্রথম আলোর* জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি ইফতেখার মাহমুদ।]

ইফতেখার : বাংলাদেশে এবার নিয়ে কততম বার আসা? বাংলাদেশের বদলটাকে কীভাবে দেখেন?

দীপেশ : এ নিয়ে পঞ্চমবারের মতো এলাম। বাংলাদেশ আমাকে সব সময় টানে। কারণ, বাংলাদেশ আমার মা-বাবার দেশ। ফলে এই দেশের সবকিছুই আমাকে আকর্ষণ করে। নিজের নস্টালজিয়া, পারিবারিক সম্পর্ক—এসব ব্যক্তিগত কারণেও বাংলাদেশ আমার আগ্রহের বিষয়। বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস ও আত্মপরিচয় সন্ধানটাকে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে পাঠ করার চেষ্টা করি।

যেমন ধরেন, মুসলিম জাতীয়তাবাদের শুরুটা কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনেরও বেশ আগের। ২০ শতকের গোড়া থেকে এটা শুরু হয়েছে। বাঙালি মুসলমানের আধুনিকতার চেহারা কী হবে, হিন্দু আধুনিকতা থেকে এর কতটুকু নেওয়ার আছে,

নারীদের স্বাধীনতার ধরন কেমন হবে, পূর্ব বাংলার ভাষা-পোশাক কী হবে—এসব ক্ষেত্রে সবকিছু কিন্তু বর্জনের ইতিহাস নয়। এর মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার বিষয় আছে। আমার আগ্রহের বিষয়, কীভাবে বাঙালি মুসলমানের একটা গোষ্ঠীগত পরিচয় তৈরি হলো। একটি সার্বভৌমত্বের স্বাদ, পরিচয় তারা পেল, যা উপমহাদেশের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে খুবই স্বতন্ত্র একটি ঘটনা। সেই অর্থে বাংলাদেশ কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য একটি পরীক্ষা।

ইফতেখার : সেটা কেমন?

দীপেশ : ভারতবর্ষের অন্য রকম একটা ব্যাপার আছে। এখানে সংস্কৃতিগত, ভাষাগত, ধর্ম ও পরিবেশগত পরিচয় আছে। এটা ইউরোপের মতো নয়। এটা দেখতে ভালো লাগে—উপমহাদেশের একটি খণ্ডে একদল বাঙালি যেখানে সংখ্যালঘু, জাতিগত বেশ কিছু ব্যাপার আছে। কিন্তু তারপরও আমি বলব, অন্তত বাঙালি মুসলমান তার পরিচয়ের সন্ধানটা পেয়েছে। তবে তা যে বাস্তবায়িত হয়েছে, তা হয়তো কেউ বলবে না। তবে পরিচয়ের যে সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটা বলা যাবে।

এই যে বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, সেখানে তিনি বারবার বলেছেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল, পাকিস্তান না হলে বাঙালি মুসলমানের স্বার্থরক্ষা হবে না। অন্যদিকে তিনি বলেছেন, পাকিস্তান মানে হিন্দু বিরোধিতা নয়। এখন তাঁর এসব বক্তব্য নিয়ে আমার একটা আলাদা বক্তব্য থাকতে পারে। তবে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে একটা সার্বভৌমত্বের ব্যাপার আছে। তিনি এমন একটা রাষ্ট্র চাচ্ছেন, যেখানে অন্য কারও, বাইরের কারও প্রভুত্ব থাকবে না। বাঙালি মুসলমানের রাষ্ট্র হলেও সেখানে হিন্দু সংখ্যালঘুর জায়গা থাকবে। তাঁর এই কল্পনার বাস্তবায়ন হয়েছে, তা অবশ্য বলা যাবে না। কিন্তু তাঁর সেই কল্পনাটা ছিল।

আজও একটা তর্ক আছে, ইসলাম কাকে বলে, প্রকৃত ইসলাম কী, বাঙালি মানে কী—এসব প্রশ্ন গ্রথিত আছে ১০০ বছরের ইতিহাসে। এগুলো পরস্পর-সম্পর্কিত কিন্তু আলাদা।

ইফতেখার : এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরেকটা পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ হিসেবে হাজির হলো কি না। বাঙালি মুসলমান কি একটা দ্বন্দ্ব সমাস?

দীপেশ : বাঙালি মুসলমান আধুনিক হতে গিয়ে দেখতে পেল, সেখানে আগেই কেউ বসে আছে। মীর মশাররফ হোসেন বাংলা গদ্য লিখতে গিয়ে দেখলেন, বঙ্কিম আগেই তা লিখে রেখে গেছেন। ফলে তিনি নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র ভাষা খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

ইফতেখার : এটা কি তাঁকে ইনফিরিয়র করে ফেলেছিল?

দীপেশ : এটাকে আমি ইনফিরিয়র বলব না। এটার মধ্য দিয়ে একটা স্বাতন্ত্র্য অর্জনের চেষ্টা তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দারুণ বলেছেন। তিনি যখন

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যেতেন, তখন তিনি এটাকে বলতেন যে 'আমার মনে হতো বড়লোক আত্মীয়ের বাসায় বসে আছি'। মানে তিনি একই সঙ্গে আত্মীয়ও বোধ করতেন। এরা আমার আত্মীয়, কিন্তু তারা আমাকে অবজ্ঞা করছে। এই ঘটনাটার মধ্য দিয়ে আমরা এমন কিছু মানুষের মধ্যে এমন একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হতে দেখি, যা হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

আমার কাছে যার চূড়ান্ত উদাহরণ কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৬৪ পর্যন্ত নজরুলের মধ্যে বাঙালি হওয়ার এমন একটা চেষ্টা দেখা গেল, যা অন্য কারও মধ্যে আমি পাই নাই। নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় একই সঙ্গে পৌরাণিক মিথলজি ও কোরআনের আয়াতের ব্যবহার করেছেন। যে চেষ্টা আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। তিনি একই সঙ্গে শ্যামাসংগীত ও ইসলামি সংগীত লিখে গেছেন।

দেশভাগের পর অন্নদাশঙ্কর রায় একটা ছড়া লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'সবকিছু ভাগ করা যায়, কিন্তু ভাগ হয় না তো নজরুল।' কিন্তু আমরা নজরুলকে ঠিকই ভাগ করে নিয়েছি। পূর্ব পাকিস্তান রেডিওতে নজরুলের ইসলামি সংগীত ও পশ্চিমবঙ্গে শ্যামাসংগীত বাজাতে আমরা দেখেছি। ফলে একমাত্র নজরুলকে আমরা এঁদের সবার মধ্যে ভিন্ন ধরনের একটি চরিত্র হিসেবে দেখতে পেয়েছি।

ইফতেখার : ধর্ম নিজে কি এই বিভাজন তৈরির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে, নাকি এর পেছনে রাজনীতির কোনো ভূমিকা আছে?

দীপেশ : বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা পার্থক্য আমরা দেখতে পেয়েছি। যেমন ধরুন, বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যতটা সহজে নাস্তিকতার চর্চা হয়েছে, বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ততটা হয়নি। এই যে *শিখা* পত্রিকার লেখাগুলো যদি আপনি দেখেন, সেখানে যুক্তিবাদের সঙ্গে ইসলামকে মেলানোর চেষ্টা হয়েছে। এটা হিন্দুধর্ম কিছুটা আলগা হওয়ার কারণেই হয়তো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জেঠামশাই একটি নাস্তিক চরিত্র। বাঙালি মুসলমানদের লেখায় এ ধরনের কোনো চরিত্র আমার চোখে পড়েনি।

ইফতেখার : রাজনীতিতে নজরুলের মতো কোনো চরিত্র কি দেখতে পান—ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেরেবাংলা বা বঙ্গবন্ধু—ওনাদের কারোর মধ্যে?

দীপেশ : ধরুন, সোহরাওয়ার্দীর কথা। মুসলমানরা সব সময় ভাবত, তিনি খুব ভালো লোক। আর আমরা সব সময় জেনে এসেছি, তিনি খুব খারাপ লোক। তার মানে, তাঁর চরিত্রটা অনেক বেশি সম্প্রদায়গতভাবে ভাগ হওয়া। এখন বুঝতে পারি, তাঁকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। সোহরাওয়ার্দী বা আবুল মনসুর আহমদকে বঙ্গবন্ধু যে অসম্ভব শ্রদ্ধা নিয়ে দেখেছেন, তাঁদের ত্যাগী হিসেবে মনে করতেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাঙালি হিন্দুদের আবার তাঁদের নিয়ে ভিন্ন রকম চিন্তা দেখতে পাই।

ইফতেখার : আবুল হাসিমকে কীভাবে দেখেন?

দীপেশ : হ্যাঁ, আমি আবুল হাসিম নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে পড়াশোনা শুরু করেছি। তাঁকে আমার বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে বলছেন, আবুল হাসিম তাঁদের রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন। ক্লাস নেওয়ার সময় তিনি একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন, তাঁর নাম মাওলানা সোবহানী। তিনি গোরকপুরের লোক। এটা পড়তে গিয়ে আমি সোবহানী সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম। ইন্টারনেটে তাঁর সম্পর্কে খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখলাম, সোবহানী সিলেটে একটা বক্তব্য দিয়েছিলেন, তার একটা অংশ আম্বেদকারের একটি বইয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৯ সালে দেওয়া বক্তব্য, তবে এটা বাংলায় নয়। অন্য কোনো ভাষায়। সেটা থেকে বাংলা করে রিপোর্ট করেছিল *আনন্দবাজার*, তার ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়েছে *হিন্দুস্তান টাইমস*-এ। ফলে সেখানে অনেক পরিবর্তন হতে পারে। তবে বক্তৃতার যে অংশটি ইংরেজিতে আমরা পাই, তাতে সোবহানী বলছেন, 'আমাদের সংগ্রাম হিন্দুদের বিরুদ্ধে।' এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সোবহানী বলেছেন, 'কারণ ইংরেজরা সংখ্যায় কম, কিন্তু তাদের বিদ্যাবুদ্ধি বেশি। ফলে তারা ভারতবর্ষকে এত দিন শাসন করেছে। হিন্দুদেরও বিদ্যাবুদ্ধি বেশি। ফলে তাদের হাতে যদি আমরা ক্ষমতা দিই, তারাও আমাদের শাসন করবে।'

আবুল হাসিম চলাফেরা করতেন কমিউনিস্টদের সঙ্গে। কিন্তু তিনি রাজনীতির শিক্ষার ক্লাসে নিয়ে আসতেন সোবহানীর মতো লোককে। তবে বঙ্গবন্ধু কিন্তু রাজনীতির ক্লাস বেশ ফাঁকি দিতেন। তিনি বলতেন, 'তোরা ক্লাস কর, আমি আগে পাকিস্তান নিয়ে আসি।' সোবহানী রাব্বানী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। সেখানে পাকিস্তান হবে এমন একটা রাষ্ট্র, যেখানে মুসলমানেরা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের চর্চা হবে। আর বঙ্গবন্ধু যে পাকিস্তান চাচ্ছেন, সেখানে সব দাবিদাওয়া বৈষয়িক। বাঙালি চাকরি পাবে, সুযোগ-সুবিধা পাবে। সেখানে হিন্দুদের স্বার্থও থাকবে। বঙ্গবন্ধুর একটা বিষয় আমার ইন্টারেস্টিং লাগে। একই সময়ে মাওলানা সোবহানী বলেছেন, 'আমাদের সংগ্রাম বাঙালি হিন্দুদের বিরুদ্ধে।' আবার বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'পাকিস্তানে হিন্দুদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকবে।'

আজকে বাংলাদেশে আলোচনা-তর্ক, প্রকৃত মুসলমান কী? এর মূল নিহিত আছে কয়েক দশক ধরে যেসব তর্ক আছে তার ধারাবাহিকতায়। এগুলো যদি আমরা না দেখি, তাহলে মনে হবে এগুলো নতুন কোনো বিষয়। ফলে বর্তমান দিয়েই এর সমাধান করা যাবে। আবুল মনসুর তমদ্দুন মজলিশ আন্দোলন শুরু করলেন। তিনি বললেন, বাঙালি মুসলমানের একটি আলাদা কালচার আছে। নজরুলও তাতে জড়িয়ে গেলেন। তিনি বাংলায় উর্দুর ব্যবহার শুরু করলেন। তিনি রক্তকে 'খুন' শব্দ হিসেবে ব্যবহার করলেন। রবীন্দ্রনাথ এটা বলতে পারলেন না। তিনি বললেন, এটা অস্বাভাবিক। রক্তকে খুন বলা যাবে না। নজরুল কিন্তু ঠিকই তার ব্যবহার করলেন।

সজনীকান্ত দাস ঠাট্টা করে *রবিবারের চিঠি*তে বলেছেন, একজন নতুন ভাষাবিদ আসছেন, তাঁর নাম গাজী আব্বাস বিটকেল। তিনি নতুন একটা ভাষা নিয়ে এসেছেন, তা হচ্ছে উর্দুস্কৃতি। এই যে হাসি-ঠাট্টা, তামাশা-শ্লেষ—এগুলোর মধ্য দিয়ে নতুন একটি বিষয়, বাঙালি মুসলমানের সামনে নতুন কিছু প্রশ্ন তুলল। কিন্তু বাঙালি হিন্দু সেই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তিত হলো না, কেননা সে তো মনে করল আমি তো ওই সব প্রশ্নের উত্তরও দিয়ে বসেছি।

উনিশ শতকের শেষে বঙ্কিম যখন লিখলেন, 'কে লিখিবে বাঙ্গালীর ইতিহাস। তুমি লিখিবে, আমি লিখিবো।' বাঙালির ইতিহাসের সব প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়ে দিয়েছেন বলে মনে করতেন। আজকে যদি আমি মনে রাখি, বাংলাভাষী মানুষ, যার মধ্যে ভাষাভিত্তিক আত্মীয়তা আছে। কিন্তু বাঙালি মুসলমান খুব ন্যায্যভাবেই তুলল যে তোমরা আমাদের ভুলে গেছ। এভাবে বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তার প্রশ্ন সামনে এল। বাঙালি মুসলমানের তোলা প্রশ্নটা যে ন্যায্য ছিল, তা পরে প্রমাণিত হয়েছে।

ইফতেখার : কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের কাছে অন্য ভাষা, জাতি ও ধর্মের মানুষদের একই পরিণতি হলো কি না, যা বাঙালি হিন্দুদের কাছে বাঙালি মুসলমানের হয়েছিল। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের কৃষক প্রজা পার্টি, ভাষা আন্দোলন, পয়লা বৈশাখ বা একাত্তর—এগুলোর মধ্য দিয়ে তো বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ চেহারাও পাই, যা একই সঙ্গে নিজেকে সেক্যুলার হিসেবে হাজির করছে।

দীপেশ : বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ কিন্তু অনেকটা বাংলাদেশের ওপরে। কারণ, এখানে একটা রাষ্ট্র আছে। ভাষার জন্য এই জাতি প্রাণ দিয়েছে। এটা আমরা মানি। একটা জিনিস আমাকে আকর্ষণ করে, বাংলা ভাষায় শুধু আঞ্চলিক ভাষায় গল্প-কবিতা লিখা হয় তা নয়, এখানে নানা আঞ্চলিক ভাষায় নাটক-সিনেমাও তৈরি হয়। যেমন আমি তো মোশাররফ করিম, চঞ্চল চৌধুরী ও জাহিদ হাসানের ভক্ত। মোশাররফ করিমের একটি নাটক আছে *শাহজাহানের একদিন*। সেখানে তিনি একই সঙ্গে অনেক আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছেন।

আপনাদের অভিনেতাদের নানান ভাষা শিখতে হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের টিভি যদি দেখেন, সেখানে বাংলা ভাষার একটি রূপই আমরা দেখতে পাই। সেখানে যে অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা আছে, তা মনেই হয় না। একমাত্র 'মীরাক্কেল' নামে যে একটি অনুষ্ঠান আছে, সেখানে মাঝেমধ্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুরসহ নানা অঞ্চলের কথা শোনা যায়। বাংলাদেশ আমাকে যে কারণে আকর্ষণ করে, কলকাতার বিরোধিতার কারণেই হয়তো। বাংলা ভাষার মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে, তাকে এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কলকাতার মধ্যে একটা প্রকল্প ছিল, বাংলা ভাষাকে একটি ব্যাকরণে বাঁধার।

এটা বোঝা যায় সুনীতিকুমারের মধ্যে। তিনি বাংলা ভাষাকে একই বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। বাঙালির মননে ছিল যে বাংলা ভাষাকে এমন একটি সূত্রে

বাঁধব, যাতে শুনে মনে হবে এর যে বৈচিত্র্যগুলো আছে, এগুলো যেন মূল ভাষাটার একটি স্খলিত চেহারা।

ইফতেখার : ড. শহীদুল্লাহ আঞ্চলিক ভাষার ইতিহাস লিখেছেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি কবিতা আঞ্চলিক ভাষায় লেখা, 'পরানের গহীন ভিতর' ও 'সোনালী কাবিন'।

দীপেশ : হ্যাঁ, এই দুটি তো অসাধারণ কবিতা। গতকালই আমি 'পরানের গহীন ভিতর' পড়ছিলাম। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার ভিন্ন চেহারা এগুলো স্বাতন্ত্র্য নিয়ে রয়ে গেছে। যেমন নোয়াখালীর ভাষা, বরিশালের ভাষা—এগুলো অসাধারণ। আমি সাম্প্রতিক সময়ে নোয়াখালীর ভাষা বোঝার চেষ্টা করছি।

ইফতেখার : কিন্তু বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষাগুলোর অবস্থা কি বাংলার মতো একই মর্যাদা পাচ্ছে? এটা কি বাংলা ভাষা বা জাতীয়তার কোনো সীমাবদ্ধতার ব্যাপার?

দীপেশ : দেখুন, জাতীয়তাবাদের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। সেটা যেকোনো জাতীয়তাবাদেই আছে। জাতীয়তাবাদের একটি প্রবণতা হচ্ছে জাতির ভগ্নাংশগুলোকে জোড়া দিয়ে অভিন্ন চেহারায় নিয়ে আসা। এর মাধ্যমে কেউ কেউ প্রান্তিকীকরণের শিকার হয়। এটা জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের ব্যর্থতার ইতিহাস। যিনি জাতীয়তাবাদী তিনিও তা অস্বীকার করবেন না। তাঁরা বলবেন, এটা সাময়িক ব্যাপার। এটা সত্যি, বাংলাদেশে চাকমা, সাঁওতালি ভাষা ও জাতির প্রতি যে অন্যায়-অবিচার হয়েছে, এটা কেউ অস্বীকার করবে না। ভারতীয় উপমহাদেশের একটি মৌলিক দিক হচ্ছে, কেউ সংখ্যালঘু হতে চায় না। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'মুসলমানদের রাষ্ট্র হলে হিন্দুদের সমস্যা হবে না।' ভারতীয় উপমহাদেশের সংখ্যালঘুর অধিকার ভালোমতো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ইফতেখার : ভারতে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে ও মিয়ানমারে আজও কি দেশভাগের মতো মনে হচ্ছে, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না?

দীপেশ : এটা শুধু যে এখানে হচ্ছে, তা নয়। ইউরোপেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি। হাঙ্গেরিতে অভিবাসীদের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছে, জার্মানিতে অভিবাসীদের জায়গা দেওয়ায় এক মেয়রকে কী ধরনের হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে, ইংল্যান্ডে ব্রেক্সিট হলো, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের জয়—এসবের পেছনে আসলে সেই আত্মপরিচয়ের বিষয়টি আছে। বিশুদ্ধ ইউরোপীয় প্রকল্পের পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে। জার্মানিতে আমরা শুনছি, অভিবাসীদের শিক্ষিত করে চাকরি দেবে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে একটি আন্ডার ক্লাস তৈরি হবে।

ইফতেখার : ভারতে মোদির উত্থান নিয়ে কিছু বলুন।

দীপেশ : ভারতে তরুণদের সংখ্যা বাড়ছে। ৫০ শতাংশ মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। এখানে চাকরিবিহীন প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। বিশালসংখ্যক এই তরুণ নিয়ে আমরা কী

করব? এদের হজ, মিলাদ করার প্রবণতা বাড়ছে। পুরোনো কলকাতায় যেসব মন্দির আছে, তা ব্যবসায়ীদের হাতে তৈরি। অনেকের পয়সা আসছে, তারা নিজেদের আত্মপরিচয় খুঁজবে।

ইফতেখার : অনেকে বলেন, বাংলাদেশে বড় ধরনের মৌলবাদী রাজনীতির উত্থান হবে না, সেটা সীমিত পরিসরে থাকবে। এখানকার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষের মধ্যে এমন কিছু উপাদান আছে কি, যা তাদের ব্যাপকভাবে চরমপন্থা থেকে দূরে রাখবে?

দীপেশ : এটা আমার আশা। আমরা এটা ভাবতে চাই বা ভালোবাসি। কিন্তু ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, অনেক সময় আমাদের অবাক করে দেওয়া। কিন্তু ঢাকার গুলশানে হোলি আর্টিজানের যে ঘটনাটি ঘটল, নিশ্চিত তা আমাদের অবাক করেছে। বাঙালি হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হতো না, তা নয়। কিন্তু তাদের একসঙ্গে থাকার ইতিহাস আছে। দেশভাগের আগে ও গুজরাটের ঘটনাটাকে এবং বাংলাদেশের বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক সংঘাত সম্পর্কে বলা যাবে নয়। এসব ঘটনায় এক পক্ষ আরেক পক্ষের ওপর সহিংস আক্রমণ চালিয়েছে।

ইফতেখার : কিছুটা ভিন্ন বিষয় নিয়ে জানতে চাই। সাম্প্রতিক কাজে জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিষয়গুলো নিয়ে আপনি আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছেন, বলেছেন। কিন্তু আপনার বয়ানের সঙ্গে জাতিসংঘের জলবায়ু বয়ানের খুব বেশি পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। মানে, জাতিসংঘ ও প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু নিয়ে বিশ্বের অনেক ধারণা ও বয়ানকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের একটি বয়ান হাজির করছে। সেখানে জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক ভিন্নমত ও ছোট ছোট ধারণাগুলোকে আড়াল করছে। তো আপনি তো ইতিহাস দেখার ক্ষেত্রে এই ছোট বয়ান বা আড়াল হওয়া বিষয়গুলো নিয়েই কাজ করেছেন। জলবায়ু নিয়ে তেমনটা দেখা গেল না।

দীপেশ : হ্যাঁ, এটা ঠিক, জলবায়ু নিয়ে যে প্যারিস চুক্তি হয়েছে, তাতে অনেক কিছু নেই। যেমন অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। এখন পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে যত অর্থায়ন হয়েছে, তা পৃথিবীর মোট মোবাইল ফোন যত টাকার বিক্রি হয়, তার চেয়েও কম। হ্যাঁ, চুক্তিটির আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ন্যূনতম স্বচ্ছতা এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ইফতেখার : জলবায়ু বিষয়টি পৃথিবীর অনেক পরিবেশগত সমস্যাকে আড়াল করে দিচ্ছে। যেমন গতকাল আপনি রামপালের কারণে সুন্দরবনের ক্ষতির বিষয় নিয়ে বলেছেন। এখন এসব সমস্যা সমাধানের কথা না বলে সবকিছু জলবায়ু নন্দঘোষের ওপর চাপানো হচ্ছে।

দীপেশ : এটা হলে খুব ভালো হতো যে পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাই একমাত্র সমস্যা। তাহলে মানুষের পক্ষে কাজ করা সহজ হতো। আমাদের অভিবাসন সমস্যা, পানির সমস্যা, সন্ত্রাসবাদ ও উন্নয়নের বৈষম্য রয়েছে। এর ওপর

কর্মসংস্থানের সমস্যা। আমাদের রাজনীতিটা এমন, এখানে তিন-চার বছর পরপর নির্বাচন হয়। এসব সমস্যা নিয়ে আমাদের থাকতে হয়। কিন্তু আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম, মানুষের যেসব সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার সমাধানের পথ আমরা মানুষই আমাদের জীবদ্দশায় সমাধানের চেষ্টা করছি। ফলে জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমস্যাগুলোকে একত্রে এনে সমাধানের উপায় খুঁজছি।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে নামকরা বিজ্ঞানী জেমস হ্যানসেন *স্টর্ম মাই গ্র্যান্ডচিলড্রেন* গ্রন্থে তিন শব্দের একটি কথা বলেছেন—'কয়লা বন্ধ করো'। কিন্তু এই কথা যদি আমি ভারতে গিয়ে বলি, তাহলে কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন? ধরেন, বাংলাদেশে যেখানে ৪০ শতাংশ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে কয়লার মতো সস্তা জ্বালানির বিপক্ষে কথা বলা কঠিন। কিন্তু কয়লাকে আমরা এ কারণেই সস্তা বলি, এর যে অন্য ক্ষতি বা ব্যয়গুলো আছে, তা আমরা ধরি না। যেমন কয়লার কারণে যে স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত ক্ষতিগুলো হচ্ছে, তা হিসাবে আনা হয় না। কয়লা থেকে যে কুফলগুলো হয়, তা সরকারের অন্য বিভাগগুলো বিপুল অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করে। সেগুলো কয়লার ব্যয়ের মধ্যে আসে না।

ইফতেখার : হুম, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতে কয়লার কারণে যে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হয়, তা কয়েক শ বিলিয়ন ডলার। মারাক্কাশ জলবায়ু সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে তিনি এই তথ্যের উল্লেখ করেছেন।

দীপেশ : ঠিক তা-ই। অর্থনীতি দিয়ে কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করার মূল সমস্যাই তো এটা। অন্য বিষয়গুলো আমলে আনা হয় না।

ইফতেখার : অনেকের কাছে জলবায়ু পরিবর্তন একটা ভালো ঘোড়া, যার ওপরে সব ধরনের পরিবেশগত সমস্যাকে উঠিয়ে দেওয়া যায়।

দীপেশ : জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ভারতের অবস্থানও বাংলাদেশের অবস্থানের চেয়ে ভিন্ন। ভারত বলত, জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বলে আমাদের উন্নয়নকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ শুরু থেকেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক সমস্যাকে আমলে নিয়ে কথা বলছে। সেই অর্থে বাংলাদেশ শুরু থেকেই এই বিষয়ে বৈশ্বিক। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এখন তো পয়েন্ট অব নো রিটার্নে চলে গেছে। এত দিন আমরা বলতাম জলবায়ু পরিবর্তন হবে। কিন্তু এখন বলছে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে।

আবার দেখেন, কয়েক বছর আগে মাদ্রাজে বন্যা হয়েছে। এটা যতটা না জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, তার চেয়ে বেশি দুর্নীতির কারণে। অবৈধ স্থাপনা হয়েছে, জলাভূমি ভরাট হয়েছে। এসব কারণে বন্যার ক্ষতি বেড়েছে। ফলে শুধু জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বললেই হবে না। আপনার সঙ্গে এ ক্ষেত্রে আমি একমত।

ইফতেখার : আপনাকে ধন্যবাদ।

দীপেশ : আপনাকেও ধন্যবাদ।

বই আলোচনা

বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থনীতি

খলিলউল্লাহ্

ক্লাইমেট ক্যাপিটালিজম : গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড দ্য ট্রান্সফরমেশন অব দ্য গ্লোবাল ইকোনমি, পিটার নুয়েল ও ম্যাথু প্যাটারসন
কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০।

১.

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে বহু গবেষণা, ভবিষ্যদ্বাণী ও বিতর্ক হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সব বিজ্ঞানীই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ হুমকির বিষয়ে একমত। কিন্তু জীবাশ্ম-জ্বালানিনির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্য টিকিয়ে রাখতে কিছু প্রভাবশালী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সন্দেহ পোষণনীতি অনুসরণ করছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা চিন্তা করে বিদ্যমান নব্য উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধান খোঁজারও চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও সার্বিক বিচারে আদিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যমান ব্যবস্থায় এই সংকটের সমাধান পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু সংকটের মাত্রা কিছুটা কমানোর লক্ষ্যে নতুন ধরনের এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর উদ্দেশ্য হলো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে মুনাফা করার সুযোগ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমানো। নতুন এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যেই এই বই আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সার্বিক বিচারে কোনো সবুজ বিপ্লব এখনো দিগন্তরেখায় আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অনিয়ন্ত্রিত জীবাশ্ম-জ্বালানির ওপর মানুষের নির্ভরশীলতার ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং সব বিবেচনায় এর প্রভাব নেতিবাচক। এ কথা বিজ্ঞানীরা জানেন, রাজনীতিবিদেরা জানেন এবং অর্থনীতির

বড় বড় খেলোয়াড়েরাও জানেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পিটার নুয়েল ও ম্যাথু প্যাটারসেনের *ক্লাইমেট ক্যাপিটালিজম* বইটি সবুজ পুঁজিবাদ বা পরিবেশবান্ধব পুঁজিবাদের সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখেছে।

অনেক এনজিও টেকসই উন্নয়ন ও সমতার নীতি অনুসরণ করে সমাজকে সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের কথা ভাবে। এটা নিঃসন্দেহে ভালো চিন্তা। কিন্তু শিগগিরই এমন কিছু ঘটা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদ ও বাজার অর্থনীতি 'পশ্চিমা বিশ্বকে' ধনী বানিয়েছে। শিল্পায়নের যুগ থেকে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি প্রায় নিয়ত বেড়েছে। এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে পণ্য ও সেবায় মানুষের প্রবেশাধিকার বেশি। এর সবকিছুই ঘটেছে জীবাশ্ম-জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে। ফলে আমরা এখন এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছি, যেখানে এসবের ফলাফল আমাদের মোকাবিলা না করে উপায় নেই।

নুয়েল ও প্যাটারসন তাঁদের এই বইয়ে বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক চুক্তিগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। এগুলো তাঁরা দেখছেন নব্য উদারনীতিবাদের মানসিকতা থেকে জন্ম নেওয়া বাজারভিত্তিক সমাধান হিসেবে। ফলে তাঁদের প্রশ্ন হলো এসব পদ্ধতি বিশ্ব অর্থনীতির সফল কার্বনমুক্তি ঘটাবে কি না এবং আরও টেকসই বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে তুলতে পুঁজিবাদের পুনর্বিন্যাস করা যায় কি না।

এই বইয়ে তাঁরা দেখিয়েছেন কীভাবে প্রথমে শিল্পকারখানা, বিশেষ করে জীবাশ্ম-জ্বালানিনির্ভর কোম্পানিগুলো জলবায়ু পরিবর্তন বিজ্ঞানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছে এবং কার্বনমুক্ত হওয়ার খরচকে অতিরঞ্জিত করেছে। এসব কোম্পানি ধীরে ধীরে জলবায়ু পরিবর্তনকে মানতে শুরু করেছে। আর এর কারণ মূলত ক্রেতা ও আইনপ্রণেতাদের চাপ। কিন্তু এর মধ্যেই তাঁরা নিজেদের ব্যবসায়িক মুনাফা খোঁজার চেষ্টা করেছে। এর ক্রেতামুখী ও সহজাত কিছু কারণ রয়েছে: করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর), নিয়ন্ত্রণের ভয়, জলবায়ু সচেতন ক্রেতাদের কাছে নতুন পণ্যের প্রচার, জ্বালানিদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ুঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অথবা খরচ বাঁচানো। এর অনেক কিছুই আবার সুনামের কথা চিন্তা করে করা হয়েছে। যেমন শেল ইউরোপ জলবায়ু পরিবর্তন মেনে নিলেও একই সময়ে শেল যুক্তরাষ্ট্র জলবায়ু পরিবর্তনের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করে চলেছে।

স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ীরা সারবত্তায় আগ্রহী। যার অর্থ হলো মুনাফা অর্জন। সে জন্যই জলবায়ু পরিবর্তনে প্রথম সাড়া দেয় অর্থায়ন খাত। এর কারণ হলো দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ হিসেবে ক্রমবর্ধমান বিমা খরচ ও কার্বন নির্গমন। এখানে জ্বালানি ভোগ গুরুত্ব পেতে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত হওয়া কিয়োটো চুক্তি কার্বন নির্গমন হ্রাস টার্গেট প্রচলন করে এবং একটি বৈশ্বিক কার্বন বাজার তৈরি করে। এটা করা হয় পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন পদ্ধতি বা ক্লিন ডেভেলপমেন্ট

মেকানিজম (সিডিএম) তৈরি করার মাধ্যমে। উন্নয়নশীল দেশের সার্টিফায়েড ইমিশন রিডাকশন বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নত দেশের কার্বন হ্রাস টার্গেট অর্জন করা হবে। কিয়োটো চুক্তির আওতায় এই সিডিএম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে কার্বন হ্রাসকরণে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা সার্টিফায়েড ইমিশন রিডাকশন ইউনিট বা কার্বন ক্রেডিট সৃষ্টি করে। তারপরে এগুলো ইমিশন ট্রেডিং স্কিম বা কার্বন নির্গমন বাণিজ্য স্কিমের আওতায় বেচাকেনা করা যায়।

তবে ডিকার্বোনাইজেশন বা কার্বনমুক্তকরণ ঘটাতে হলে সুবিচার ও আঞ্চলিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন জ্বালানি চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রথম পূর্ণমাত্রায় ইমিশন ট্রেডিং স্কিম চালু করে। অনেক সমস্যা থাকার পরও এই স্কিমের ফলে ৫০-১০০ মিলিয়ন টন কার্বন কমানো গিয়েছিল।

রাষ্ট্রের বাইরেও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্ত কার্বন মার্কেট সৃষ্টি করা শুরু করেছে। এগুলো মূলত স্ট্যান্ডার্ড ও সার্টিফিকেশন স্কিমের মাধ্যমে স্বনিয়ন্ত্রিত। এর ফলে কোম্পানিগুলো তাদের পাবলিক রিলেশনস ও করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি প্রচেষ্টায় কার্বন নির্গমন কমাতে পারে। কিন্তু প্রায়শই এগুলোর গুণাগুণ মান কড়াকড়িভাবে বজায় রাখা হয় না।

নুয়েল ও প্যাটারসন সতর্কতার সঙ্গে এসব কার্বন মার্কেটের সীমা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের সমালোচনার জায়গা হলো ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজমের মাধ্যমে চীন ও ব্রাজিলের মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো সুবিধা নিচ্ছে। এসব দেশে সেই ধরনের অবকাঠামো ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা প্রশ্ন রাখেন, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অংশ হিসেবে মেকানিজম তৈরি না করেও এ ধরনের কার্বন নির্গমন কমানোর প্রকল্পগুলোয় অর্থায়ন করা যেত কি না। তাঁরা 'কার্বন কলোনাইজেশন' বা কার্বন উপনিবেশায়ন প্রবণতার সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, কার্বন উপনিবেশায়নের ফলে বাইরের বিশেষ জ্ঞান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে যেসব সংরক্ষণ প্রকল্প নেওয়া হয়, তা সংরক্ষণ এলাকার স্থানীয় মানুষের জীবিকার ক্ষতি করে। এ ছাড়া যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা হলো, স্বতঃস্ফূর্ত এ ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রকল্প ভোক্তাদের মধ্যে পছন্দনীয় আচরণগত পরিবর্তন ঠেকাবে কি না।

এর ফলে যে বিষয়টি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় তা হলো, কার্বন পুঁজিবাদের শাসনব্যবস্থা আরও বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও বেসরকারি অ্যাক্টরদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। তারা দাম, পরিমাণ ও তথ্য বণ্টনের মাধ্যমে এই শাসনব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে পারে। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে শুধু অপর্যাপ্তই নয়, অসামঞ্জস্যপূর্ণও বটে। এসব নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার মাধ্যমে মনুষ্যসৃষ্ট জলবায়ু

পরিবর্তনের অবিচার ঠেকানো উচিত। কারণ যেসব মানুষের জীবনযাপন জলবায়ু পরিবর্তনে কোনো অবদানই রাখে না, তারা দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। কিন্তু যাদের বিলাসিতার কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি, তাদের দুর্ভোগ সে তুলনায় কম। ফলে নুয়েল ও প্যাটারসন সরকার কর্তৃক কার্বন হ্রাস টার্গেট আরোপের দাবি জানান। এর ফলে দুর্লভ পণ্য যেমন সৃষ্টি হবে, তেমনি কার্বন নির্গমনের হিসাবরক্ষণের জন্য শক্তিশালী নিয়ম তৈরি করা যাবে বলে তাঁরা মনে করেন।

বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ও পরিবেশগত ঝুঁকিতে থাকা দেশের জন্য নতুন এই অর্থনীতি খুবই গুরুত্ব বহন করে। কার্বনমুক্ত বিভিন্ন খাত গড়ে তুলে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজমের আওতায় বাংলাদেশও অর্থনৈতিকভাবে যেমন লাভবান হতে পারে, তেমনি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায়ও ভূমিকা রাখতে পারে। সাধারণত প্রস্তাবিত ক্লিন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পগুলো একটি মনোনীত জাতীয় কর্তৃপক্ষ বা ডেজিগনেটেড ন্যাশনাল অথরিটি (ডিএনএ) মূল্যায়ন করে থাকে। যদি কোনো প্রকল্পের সত্যিকার অর্থে কার্বন কমানোর সম্ভাবনা থাকে, তাহলেই শুধু তা ক্লিন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট হিসেবে বিবেচনাধীন হয়। বাংলাদেশের জ্বালানি, পুরোনো রাষ্ট্রীয় শিল্প, বনায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ইত্যাদি খাতে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্যাস সংযোগ, উন্নত চুলা, সৌর প্রতিফলন যোগ্য কাচ ব্যবহৃত ভবন, কেরোসিনের বাতির বদলে সৌর লণ্ঠন, প্রথাগত ইটের পরিবর্তে ফাঁপা ইট ইত্যাদি ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম প্রকল্পের আওতায় আনা যেতে পারে।[১] এসব বিবেচনায় নতুন এই অর্থনীতির ভালোমন্দ বিষয়ে বাংলাদেশে আরও বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা প্রয়োজন।

২.

এই বইয়ে নীতিকথার চেয়ে বাস্তবতায় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। লেখকদের মূল যুক্তি হলো 'বাস্তবে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের মানে হলো হয় পুঁজিবাদকে বাতিল করে দেওয়া অথবা একে এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে দেওয়ার পথ খুঁজে বের করা, যেখানে ধীরে ধীরে কয়লা, তেল ও গ্যাসের বিকল্প গ্রহণ করা হবে (৯)। তবে তাঁরা মনে করেন, "স্বল্প মেয়াদে পুঁজিবাদকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব" (৯)। ফলে, যে ধরণের পদক্ষেপ বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করবে, তা বেশি আকর্ষণীয়। এখানে কার্বন নির্গমনের অনুমতি বা কার্বন-ভাতা বেচাকেনার মাধ্যমে টাকা কামানো সম্ভব। তা হবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই। কিন্তু মূল প্রশ্ন হলো পুঁজিবাদীরা এমন কোনো পথ খুঁজে পাবে কি না, যেখানে কার্বনমুক্তি অর্জন করা যায় (১০)।' সে জন্য লেখকদের মূল গবেষণা ছিল কার্বন মার্কেটের

সম্ভাব্যতা খোঁজা। এর পাশাপাশি কার্বনমুক্তকরণের জন্য শক্তিশালী অ্যাক্টরদের যুক্ত করার কৌশলগত চিন্তা। পুরো বইয়ে তাঁরা বাজারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা ব্যক্ত করছেন (দেখুন পৃ. ১৩০) এবং কায়েমি স্বার্থগুলোকে আশ্বস্ত করার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সজাগ থেকেছেন (দেখুন পৃ. ৫৫-৫৬)।

তাঁদের যুক্তি হলো এসব প্রতিবন্ধকতা চাইলে প্রণোদনা এবং করপোরেট সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে কাটিয়ে ওঠা যায়। কিয়োটো চুক্তির প্রস্তুতির সময়ে অর্থায়নকারীরা কার্বন নির্গমন বাণিজ্য ও ক্ষতিপূরণ বাজারে নিজেদের ব্যবসার সুযোগ খুঁজতে শুরু করে। যখনই কিয়োটো চুক্তি বাস্তবায়ন শুরু হলো, বারক্লেইস ও ডিউস ব্যাংকের মতো বিশাল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্বন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করল (৭৪)। তারা নিজেদের নব্য উদারনীতিবাদী যুক্তি কাজে লাগিয়ে বলা শুরু করল যে পৃথিবীর সমস্যার সমাধান হলো বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের টাকা সংহত করা। এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো এই প্রক্রিয়াটাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা। সে জন্য 'নব্য উদারনীতিবাদী বিশ্বে প্রতিপত্তিওয়ালা বড় আর্থিক বিনিয়োগকারীদের আচরণে পরিবর্তন আনতে প্রণোদনা তৈরি করতে হবে (৭৬)।'

এ ক্ষেত্রে কার্বন নির্গমন বাণিজ্য স্কিমের সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। কার্বন নির্গমন হ্রাসে যেসব অর্থায়নকারীর কায়েমি স্বার্থ আছে, তাদের মধ্যে নির্বাচকমণ্ডলী তৈরি করতে হবে (৭৫)। বইয়ের একটি বড় অংশজুড়ে এসব স্কিম তৈরি করা, এদের সাফল্য এবং সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করা হয়েছে। তাদের মতে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইমিশনস ট্রেডিং স্কিম (ইটিএস) নির্বাচকমণ্ডলী তৈরি করার মাধ্যমে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করেছে। এই নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থ হলো 'কার্বন বাণিজ্য রক্ষা করা, এমনকি এই ব্যবস্থাকে জোরদার করা' এবং একটি প্রবৃদ্ধি চক্র তৈরি করা যা জীবাশ্ম-জ্বালানি বাড়াবে না (১০৪)।

একইভাবে, ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) বাজারভিত্তিক কার্বনমুক্তকরণের 'একটি আভাস' দেয় (৮৭)। নুয়েল ও প্যাটারসনের মতে, সিডিএমের সাফল্য হলো, সার্টিফায়েড ইমিশন রিডাকশন (সিইআর) পণ্যে এই পদ্ধতি ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করতে পেরেছে। অনেক দেশের সরকারের মধ্যে এর আকর্ষণ রয়েছে। এই ব্যবস্থার নকশা যারা তৈরি করেছিল, তাদের ধারণার চেয়ে বেশি দ্রুত তা বৃদ্ধি পেয়েছে (৯২-৯৩)। তবে লেখকেরা কার্বন নির্গমনের পাল্টা তথ্যসংক্রান্ত বয়ানের সমস্যাগুলো স্বীকার করেন। এর ওপরই তা নির্ভরশীল। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিপূরণকে অতিরঞ্জিত করতে উদ্বুদ্ধ হন। লেখকেরা বাজার ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বিরাজমান উত্তেজনাও স্বীকার করেন। যেসব রাষ্ট্র নিজেদের পরিবেশগত ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখতে চায়, তারা সিডিএমকে

'অপ্রীতিকর' বলে আখ্যায়িত করেছে (১৩৪)। অনেকগুলো উত্তেজনার মধ্যে এটি একটা যা লেখকদের অবস্থান থেকে অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

সবশেষে, এই দুই লেখক জলবায়ু পুঁজিবাদের চারটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ চিত্র তুলে ধরেন।

১. একটি ক্লাইমেট ইউটোপিয়া বা জলবায়ু কল্পলোক : এখানে স্বপ্রণোদিত হয়ে জোরদার করা একটি ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে প্রথম দিকে উদ্যোগ নেওয়া যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক বা চীন (সিডিএম প্রকল্পের ক্ষেত্রে) সুবিধা পাচ্ছে এবং অন্যরাও একই রকম সুবিধার জন্য তাদের অনুসরণ করবে। এর ফলে শক্তিশালী টার্গেট যেমন স্থাপন করা যাবে, তেমনি পরিচ্ছন্ন বিনিয়োগের প্রচেষ্টাও তৈরি হবে।

২. স্থির অবস্থা : কার্বন মার্কেট মূলত একটি স্পেকুলেশন বা জল্পনার অস্ত্র হয়ে থাকবে। এর ফলে সৃষ্ট হওয়া বৈশ্বিক সংঘাতের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সামগ্রিক পদক্ষেপ বাধাগ্রস্ত হবে।

৩. একটি ক্লাইমেট ডিস্টোপিয়া বা খারাপ অবস্থা : এখানে ব্যাপকভাবে জিও-ইঞ্জিনিয়ারিং হবে। জীবাশ্ম-জ্বালানি এবং জিনেটিক্যালি মোডিফাই করা বনের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত বিশ্বের জন্য সেবা প্রদানকারীর ভূমিকায় আটকে যাবে। কিন্তু সুবিধার ভাগ পাবে না (কার্বন উপনিবেশায়ন)। আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের মাধ্যমে ব্যক্তিগত কার্বন-ভাতা দেখভাল করবে রাষ্ট্র ও এনজিওগুলো।

৪. জলবায়ু কেইনেসীয়বাদ : এই পরিস্থিতিতে যখনই ঘাটতি দেখা দেবে, তখন সক্রিয় সরকারগুলো কার্বন মার্কেটে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। আত্মসংগঠনের মাধ্যমে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ আরোপ দেখা যাবে এবং রাষ্ট্র উচ্চমানের দিকে ধাবিত হবে। একটি 'গ্রিন নিউ ডিল' গঠিত হবে, যেখানে পরিবেশগত সেবা প্রদানের ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টন হবে।

সামগ্রিকভাবে, নুয়েল ও প্যাটারসন কার্বন পুঁজিবাদের একটি সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়া নব্য উদারনীতিবাদী নীতির ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার বিদ্যমান বাজারভিত্তিক পদ্ধতির শক্তি ও দুর্বলতাগুলো তুলে ধরেছেন। 'গ্রিন নিউ ডিলের' তাঁরা বড় সমর্থক। এটা ইউরোপীয় ধাঁচের ধ্রুপদি সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির সমতুল্য, যেখানে রাষ্ট্র বিভিন্ন স্বাধীন অ্যাক্টরদের জন্য কাঠামো তৈরি করে দেবে, যেন তারা বাজারের চাহিদায় সাড়া দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রধানত একটি সামাজিক ইস্যু। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে আমাদের একটি সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। যেহেতু নিয়ন্ত্রিতভাবে মুক্ত বাজার ছাড়া আমাদের সমাজকে সংগঠিত করার

ভালো কোনো পদ্ধতি আমরা চালু করতে পারছি না, তাই এই প্রেক্ষাপটে আমাদের উচিত এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা, যা সফলভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করবে। নুয়েল ও প্যাটারসনের বইটি এই বিতর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

ভিন্নদৃষ্টি

বইয়ের লেখকদের অ্যাজেন্ডা ছিল খোলাখুলিভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত টার্গেটের মাধ্যমে ঘাটতি সৃষ্টি করা, কার্বনের দাম বাড়ানো এবং জীবাশ্ম-জ্বালানির ওপর কোম্পানিগুলোর নির্ভরতা কমানোর জন্য প্রণোদনা তৈরি করা। এ ছাড়া 'জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে সাহায্য করতে বাজারকে পরিচালিত করতে হবে (১৬০)।' এটাকে বলা যায় একধরনের 'জলবায়ু কেইনেসীয়বাদ' (১৭২-১৭৮)। যদিও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে 'এই সব পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা কম', কিন্তু এই ভয়ানক চিত্রটি পাল্টানোর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, যা করা হয়েছে তা অপর্যাপ্ত।

অ্যাড্রিয়ান পার (২০১২) তাঁর *র‍্যাথ অব ক্যাপিটাল : নিওলিবারেলিজম অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ পলিটিকস* গ্রন্থে নব্য উদারনীতিবাদী পুঁজিবাদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন যে সংকট সৃষ্টি করেছে, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এটাকে বলছেন টেকসই উন্নয়ন রাজনীতির করপোরেট 'হাইজেকিং'। তিনি সংকট সমাধানের পদ্ধতি হিসেবে কার্বন বাণিজ্যকে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কার্ল মার্ক্স, মাইকেল হার্দত, আন্তোনিও নেগ্রি, গিলস দেলিউজ, ফেলিক্স গুয়াত্তারি, স্লাভো জিজেক ও মিশেল ফুকোর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছেন। পশুর অধিকার, জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ও প্রজনন বিষয়ে নারীবাদী সমালোচনাও পারের বিশ্লেষণে জায়গা পেয়েছে। তাঁর মতে, রাজনৈতিকভাবে জলবায়ু পুঁজিবাদ জলবায়ুর সমস্যাকে কমাবে। কিন্তু এর ফলে ভোক্তা সংস্কৃতি শক্তিশালী হবে।[২] তবে এ ক্ষেত্রে বিকল্প যুক্তি দিয়েছেন ড্যানিয়েল মিলার (২০১২)। *কনজাম্পশন অ্যান্ড ইটস কনসিকিউয়েন্সেস* গ্রন্থে তিনি বলছেন যে অর্থনীতিবিদ বা রাজনৈতিক তাত্ত্বিক কারোরই ভোক্তা সংস্কৃতির নৈতিক পরিতৃপ্তিকে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।[৩]

আলোচিত বইয়ে আবির্ভূত জলবায়ু পুঁজিবাদের চরিত্র সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের মাত্র দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে (১৮০, ১৮৬)। এর বদলে লেখকেরা জোর দিচ্ছেন 'শহুরে ব্যবসায়ীদের ওপর (মূলত লন্ডনের) যারা দৈনন্দিন ব্যবসার বড় অংশ সম্পাদন করে থাকে'। এ ছাড়া 'ক্ষতিপূরণ প্রকল্পের জন্য ডেভেলপার, "কার্বন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে" নিয়োজিত কোম্পানিদের সাহায্যকারী ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট, কোম্পানিগুলোর কার্বন নির্গমন

মূল্যায়নকারী নিরীক্ষক এবং অন্যদের' ওপর তাঁরা জোর দিচ্ছেন (১০৪)। একইভাবে ঐতিহাসিক তুলনার ক্ষেত্রে তাঁরা ব্রেটন উডস ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নব্য কেইনেসীয় নীতির ব্যাপরে যুক্তি তুলে ধরতে ব্রেটন উডস ব্যবস্থা অবশ্যই একটি মূল উপাদান। এখানে তাঁরা জোর দিয়েছেন প্রগতিশীল বিষয়গুলোর (উচ্চ মজুরি) সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যবসায়ীদের দূরদর্শিতার ওপর। কিন্তু বৈশ্বিক পুঁজিবাদের অনুরূপ নতুন রূপরেখায় করপোরেট অ্যাক্টরদের বাইরে অন্যদের ভূমিকাকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে নুয়েল তাঁর ২০১২ সালের *গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট: ক্যাপিটালিজম, ইকোলজি অ্যান্ড পাওয়ার* গ্রন্থে বিশ্লেষণের কেন্দ্রে বাজার, রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজকে রেখেছেন।[৪]

নুয়েল ও প্যাটারসন আলোচিত বইয়ে দুটি ভবিষ্যৎ সমস্যাকে তাঁরা এড়িয়ে গেছেন বা বলা যায় খুব গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেননি। এর একটি হচ্ছে জলবায়ু অভিবাসী ও শরণার্থী-সংকট। এ বিষয়ে সংহতি এবং জনবল সংগঠিত করতে কৌশল গ্রহণের জন্য আরও মনোযোগ দরকার। আর্থিক খাতের বাইরে এ ব্যাপারে ভাবনা খুবই জরুরি। একইভাবে তাঁরা বলছেন যে বাজারভিত্তিক কার্বনমুক্তির ব্যবস্থা তৈরিতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থাই মূল বিষয়। যেমন তাঁরা উল্লেখ করেছেন, 'কতটুকু এবং কত দ্রুত করপোরেশনগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আগ্রহী হবে তা নির্ধারণে অর্থনীতির সার্বিক অবস্থাও একটি নিয়ামক (৫৮)'। কিন্তু এটা এখনো বিকশিত হয়নি।

ক্লাইমেট ক্যাপিটালিজম বইটি বাজারের শক্তি ও সীমাবদ্ধতার বেশ চমৎকার একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্লেষণ। তবে কার্বন মার্কেটের বিশ্লেষণ এবং যে প্রেক্ষাপটে এই মার্কেট টিকে আছে, তা থেকে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক কৌশল থেকে এই বইয়ের উপসংহারে টানা হয়নি। এর বদলে উপসংহার টানা হয়েছে তাঁদের মূল অনুমান থেকে। সেখানে তাঁরা বলতে চাইছেন জলবায়ু-সংকটের এই সময়কালে কার্যকর পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন যেহেতু সম্ভব নয়, তাই সম্ভাব্য সমাধান অবশ্যই বাজারব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজতে হবে। যা সম্ভব তা রয়ে গেছে দ্ব্যর্থবোধক। এর বদলে তাঁরা বলছেন, যা তাঁরা প্রয়োজনীয় হিসেবে মনে করেছেন। তাঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে 'এমন একধরনের পুঁজিবাদ সম্ভব, যেখানে কার্বনমুক্তি অর্জন করা যাবে এবং তা বৈশ্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটি রূপান্তরের চলনসই পদ্ধতি হবে। কার্বন মার্কেটের একটি সুশাসিত ব্যবস্থাও অর্জন করা আমাদের কাছে সম্ভব মনে হচ্ছে' (১৮৩)। কিন্তু মিলার তাঁর বইয়ে ক্রিস নামক একটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সেখানে ক্রিস ইউরোপে কার্বন নির্গমন কমাতে কার্বন বাণিজ্যের ব্যর্থতার সমালোচনা করেছেন। এই কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে মিলার মূলত কার্বন

মার্কেটে শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা বলেছেন। অবশ্য জলবায়ু নীতির মার্কেটাইজেশনের যে রাজনৈতিক অর্থনীতি সমালোচনা কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে মিলার দিয়েছেন, তার বিস্তৃত কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই।

তবে নুয়েল ও প্যাটারসনের বইয়ে এ রকম একটি বাস্তবতা অর্জনের রাজনৈতিক পদ্ধতি কী হবে, তা ভালো করে খতিয়ে দেখা হয়নি। এমনকি তাঁদের নিজেদের ভাষায় যেটাকে তাঁরা বলছেন বাধ্যকারী রাষ্ট্র ও বহুপক্ষীয় হস্তক্ষেপ, সেগুলোরও রাজনৈতিক পদ্ধতি খতিয়ে দেখা হয়নি। এই বইয়ের মূল কথা হলো কার্বন ক্ষতিপূরণের জন্য একটি কার্যকরী বাজার তৈরি করা। এটা যুক্তিসংগত দাবি। কিন্তু নব্য উদারনীতিবাদী যুগে এর ফলে ফাইন্যান্স ক্যাপিটালের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই ক্ষমতাকে কীভাবে ভারসাম্যপূর্ণ করা যায়, তা একটি আশু বিতর্কের বিষয় হিসেবেই রয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র

১. Mirza Shawkat Ali and Mahfujur Rahman, 'Potentials of clean development mechanism', *The Daily Star*, 17 March, 2012, Op-Ed page.

২. Parr, A. 2012. *The Wrath of Capital: Neoliberalism and Climate Change Politics*. New York: Columbia University Press.

৩. Miller, D. 2012. *Consumption and Its Consequences*. Cambridge: Polity Press.

৪. Newell, P. 2012. *Globalization and the Environment: Capitalism, Ecology and Power*. London: Polity Press.

লেখক পরিচিতি

রেহমান সোবহান

অর্থনীতিবিদ। অধ্যাপক রেহমান সোবহান কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৭৭ সালে অবসরে যান। ড. মুহাম্মদ ইউনূস, ড. ফখরুদ্দীন আহমদ, এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, হোসাইন তৌফিক ইমাম ও আইয়ুবুর রহমানের মতো প্রতিথযশা অর্থনীতিবিদেরা তাঁর ছাত্র। তিনি বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) চেয়ারম্যান, মহাসচিব ও গবেষণা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাবাসিক ফেলো হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া অধ্যাপক সোবহান কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাবাসিক পণ্ডিত ও হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি সিপিডির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হলো: *Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan* (1968); *Rural Poverty and Agrarian Reform in the Philippines* (1983); *Public Allocative Strategies, Rural Development and Poverty Alleviation: A Global Perspective* (1992); *Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development* (1993); *Challenging the Injustice of Poverty: Agendas for Inclusive Development in South Asia* (2010); *Untranquil Recollections: The Years of Fulfilment* (2015) etc.

ড্যানিয়েল এস লেন, দাম হি কিম, গি এস লি, ব্রায়ান ই উইকস এবং নজিন কোয়াক

ব্রায়ান ই উইকস ও নজিন কোয়াক ছাড়া লেখকেরা সবাই মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশনস স্টাডিজ বিভাগের পিএইচডি গবেষক। ব্রায়ান ই উইকস ও নজিন কোয়াক মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগে যথাক্রমে সহকারী অধ্যাপক ও অধ্যাপক।

জ্যাকোব আমেদি

যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের স্নাতকত্তোর শিক্ষার্থী। তাঁর বিশেষায়িত বিষয় হলো নেটওয়ার্ক ও সফটওয়্যার ডিজাইন।

পাভেল পার্থ

লেখক ও গবেষক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা *মধুপুরের প্রাণবৈচিত্র্য*, *অরণ্যের লড়াই*, *খাদ্য-লঙ্ঘন ও লড়াই*, *উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা*, *কৃষকের বীজ অধিকার* ইত্যাদি। ছোটকাগজ, জার্নাল, নানা স্থানীয় প্রকাশনাসহ পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। বারসিক নামক লোকজ্ঞানবিষয়ক একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

আলতাফ পারভেজ

লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শেষ করে সাংবাদিকতার পাশাপাশি গবেষণামূলক কাজ করেছেন মূলত পলিটিক্যাল হিস্ট্রি ও দলিত বিষয়ে। সাংবাদিকতায় তিনি আশির দশকে আনসার বিদ্রোহ ও কারা বিদ্রোহের ওপর অনুসন্ধানী কাজে 'কাউন্টার রিপোর্টিং' ধারণার প্রবর্তন করেন। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ *মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনর্পাঠ* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রয়েছে *শ্রীলঙ্কার তামিল জাতীয়তাবাদ: দক্ষিণ এশিয়ার জাতিরাষ্ট্রের সংকট*।

ইফতেখার মাহমুদ

সাংবাদিক। পড়াশোনা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে। দৈনিক *প্রথম আলোর* জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করছেন। এর আগে দৈনিক *সমকাল*-এ প্রতিবেদক হিসেবে ছিলেন। ব্র্যাকের রিসার্চ অ্যান্ড ইভ্যালুশন ডিভিশনে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি শিক্ষক হিসেবে পরিবেশ সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়িয়ে থাকেন। তাঁর আগ্রহের বিষয় পরিবেশবিষয়ক সাংবাদিকতা ও গবেষণা।

খলিলউল্লাহ্

লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজে (বিসিএএস) জ্যেষ্ঠ গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে *প্রতিচিন্তার* সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আগ্রহের বিষয় রাজনৈতিক অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ভূরাজনীতি, সামাজিক উন্নয়নসহ

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারসহ নগদ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১